প্রতীক

ঘুমন্ত জাহাঙ্গীর

বহুকাল আগে থেকেই বিশ্বাস করা হতো– হৃদয়ই হচ্ছে মানুষের সব আবেগের উৎস। দয়িতাকে হৃদয় দানের অর্থ আপনার সবকিছু নিঃস্বার্থভাবে তাকে সমর্পণ করা। প্রাচীনকালের মানুষ জানতো না, মানব শরীরে রক্ত পাম্প করাই হচ্ছে হৃৎপি-ের কাজ। তারা জানতো, হৃৎপি-ই মানুষের সব অনুভূতির কেন্দ্র।

মিথ অনুসারে নারী-পুরুষের প্রেম ও আকর্ষণ-অনুভূতির জন্য দায়ী দেবতা কিউপিড। ল্যাটিন ভাষায় কিউপিড অর্থ কামনা। কিউপিড হচ্ছে পক্ষ যুক্ত, নাদুস-নুদুস চেহারার এক নগ্ন বালক। তার ঠোঁটে লেগে আছে বজ্জাতি হাসি। কিউপিড বহন করে ধনুক, তূণ ও শর। তরুণ-তরুণীর হৃদয়কে সে প্রেমশরে বিদ্ধ করে।

আবহমান কাল থেকেই প্রিয় পাত্রকে (সাধারণত নারী) তুলনা করা হয় গোলাপের সঙ্গে। গোলাপের ইংরেজি শব্দ জঙঝঊ-এর অক্ষরগুলো একটু ওলটপালট করলে আমরা পাই ঊজঙঝ শব্দটি। এই ঊজঙঝ হচ্ছে প্রেমের দেবতা। বিশ্বব্যাপী প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রথাগত পছন্দ গোলাপ। লাল গোলাপ হচ্ছে গাঢ় আবেগের প্রতীক। নানা রঙের গোলাপ আলাদা আলাদা অনুভূতির প্রকাশক।

ল্যাভেন্ডার– মোহিনী শক্তি ও অনন্যতা।
কমলা– মুগ্ধতা।
গোলাপি (গাঢ়)– কৃতজ্ঞতা, বন্ধুতা এবং শ্রদ্ধাবোধ।
লাল গোলাপ– ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং সাহস।
পিচ- বিনয়, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও দরদ।
গোলাপি (হালকা)– প্রশংসা, আনন্দ ও সুখময়তা।
গাঢ় লাল– সৌন্দর্য এবং প্রবল অনুরাগ।
শাদা– নিষ্পাপতা, পবিত্রতা, গোপনীয়তা, নিঃশব্দতা।
হলুদ– আনন্দ, বন্ধুতা, ঈর্ষা, আশা এবং মুক্তি।
কালো– বিদায়।

লাভ নটস (LOVE KNOTS) ফিতা দিয়ে চিত্রিত করা হয়। অন্তহীন চিরস্থায়ী প্রেম প্রকাশের প্রচলিত প্রতীক এটি।

দীর্ঘকাল থেকেই ভ্যালেনটাইনস ডের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যুগল হাত। নারীসুলভ কমনীয়তা আনতে নারীর হাত ব্যবহৃত হয়। আর সৌন্দর্য বাড়াতে ঝালরযুক্ত কাফ এবং মধ্যমাতে পাথরযুক্ত আংটি ব্যবহার করা হয়।

একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে পাখিরা তাদের সঙ্গী খুজে নেয়। এ কারণে পায়রা এবং লাভ বার্ডকে ভালোবাসা দিবসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি থেকে

আবেদন

লিজা জাবি, সাভার, ঢাকা

ভালোবাসা কি বুঝিনি কখনো। তবে যখন বুঝতে শিখেছি, তোমাকেই ভালোবেসেছি। ভালোবাসার তাৎপর্য অনেক। তবে ভালোবাসার নামে যে খেলা তুমি দেখালে, তা তো প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না। কেন তুমি আমাকে বুঝতে চাও না বলো? আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি, উত্তর দিতে পারবে তো? কি নেই আমার মাঝে? কিসের অভাব আছে আমার জীবনে। আমি কি তোমাকে পরিপূর্ণ করতে পারবো না। আমি কি অদক্ষ, অজ্ঞ না মূর্খ? বলো? আমি কি পারবো না তোমাকে আদরে আদরে মাতাল করে দিতে? পারবো না তোমাকে আমার ঠোটের উষ্ণতায় জড়িয়ে রাখতে? নাকি পারবো না তোমার শয্যাসঙ্গী হতে? বলো। আমার নারীত্বের প্রতিটি উপকরণ শুধু তোমার জন্য। তুমি ইচ্ছা করলেই আমাকে নিয়ে ভেসে যেতে পারো ভালোবাসার বিশাল জলরাশিতে। তোমার লোমশ বুকে আমি ঠাই পেতে চাই। তোমার শূন্যতা আমাকে পাগল করে দেয়। আমি তোমাকে পেতে চাই, প্রতিটি বসন্তে, প্রতিটি রাতে, প্রতিটি মুহূর্তে। আমার এ আবেদনে সাড়া দাও প্লিজ।

বাবার হার্ট

আবিদ করিম মুন্না

অধ্যাপনা পেশা থেকে বাবা রিটায়ার করেছেন ২০০৩ সালে। এখন তার বয়স ৬২। সারাটা জীবন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন এ মানুষটি যে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তা স্বপ্নেও ভাবেননি। আমার দাদা-দাদি দুজনেরই ছিল ডায়াবেটিক। সে ভয়ে বাবাকে দেখতাম কাকডাকা ভোরে নামাজ আদায় শেষে হাটতে বের হতে। কোনো কিছুই কোনো দিন তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

এই তো দুই বছর আগে বৃষ্টিমুখর এক দুপুরে মা বললেন বাবার সঙ্গে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে। ইকোকার্ডিওগ্রাম করাতে হবে। রিপোর্টের প্রথম লাইনটি শুধু মনে আছে। হার্ট এনলার্জমেন্ট। শুধু এটুকু বুঝলাম, হৃৎপি- প্রসারিত হয়েছে। সায়েন্সের ছাত্র থাকার কারণে বুঝতে বাকি রইলো না, ব্যাপারটা মোটেও হাসি দিয়ে উড়ানোর নয়। যদিও বাবা পরিচিতজনদের হেসেই বলতেন, আমার হৃদয় এখন অনেকটা বড় হয়েছে। এটা তো ভালো খবর!

দিন যেতে থাকে। একটা সময় চাকরি নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। এক দিন চাচার ফোনে জানতে পারি, রংপুরে আমাদের এক ডাক্তার আত্মীয় বাবাকে পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকায় গিয়ে থরো চেকআপের। আমি

খবরটি শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। পরে খোজ নিয়ে আরো জানতে পারি, বাবা নাকি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।

টোটাল ব্যাপারটি নিয়ে আমি অফিসের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে কালবিলম্ব না করে ঢাকার গুলশানে অবস্থিত ইউনাইটেড হসপিটালে চেকআপ করানোর পরামর্শ দেন। বাবাকে ঢাকায় আসার তাগাদা দিতে থাকি। কিন্তু কোনোক্রমেই তাকে রাজি করাতে পারছিলাম না। বারবার শুধু বলছিলেন, ওষুধ খেয়ে এখন নাকি বেশ সুস্থ বোধ করছেন। শেষ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে রংপুর থেকে তাকে ঢাকায় ধরে নিয়ে আসি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, তার শরীরের কোনো একটি জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো রোগ ভয়ঙ্করভাবে দানা বেধেছে। তা-ই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছিল।

ঢাকায় ইউনাইটেড হসপিটালের কার্ডিওলজি কনসালটান্ট ডা. ফাতেমা বেগম মুনমুন প্রাথমিক চেকআপ শেষে এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দিলেন। বাবা বললেন, কি দরকার এসবের। রিটায়ার করেছি অনেক দিন। আর বাচবোই বা কতো। তারচেয়ে কিছু ওষুধ খেয়ে যদি সুস্থ থাকা যায়।

ডাক্তার বললেন, আমার ধারণা আপনার হার্টে ব্লক থাকতে পারে। আজকাল ব্লক থাকলে রিং পরিয়ে দিলে হেসে-খেলেই পার করা যায় অনেক বছর। তাছাড়া ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলতে কি আর চান না...।

শেষ পর্যন্ত হার্টে ব্লক ধরা পড়লো। পরামর্শ দেয়া হলো এনজিওপ্লাস্টির। দুই লাখ টাকার মতো প্রয়োজন। বাবা অপারেশন করাতে রাজি, তারপরও রংপুরে গিয়ে টাকা এনে করাবেন। আমি বললাম, এখান থেকেই টাকার যোগাড় হবে। আপনি মানসিকভাবে অপারেশনের প্রস্তুতি নিন। বাবাকে রাজি করানো যাচ্ছিল না। কারণ বাবা কখনো কারো কাছ থেকে টাকা-পয়সা ঋণ করেননি বলে ওই অবস্থাতেই যেতে চেয়েছিলেন রংপুর। শেষ পর্যন্ত ঢাকাতে বসে টাকা যোগাড়ের পর হসপিটালে ভর্তি করানো হলো।

অপারেশনের সময় ঘনিয়ে এলো। দেশ-বিদেশ থেকে আমাদের আত্মীয়স্বজন, বাবার সহকর্মী অনেকেই সর্বশেষ সংবাদ শোনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমাদের জানানো হয়েছিল, বাবার অপারেশন সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে। কিন্তু বিকাল ৫টায় পৌছে শুনি তিনি এখন ক্যাথ ল্যাবে। টেনশনে পড়ে গেলাম। বাবার সঙ্গে অপারেশনের আগে শেষ দেখাটা হলো না। একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। এটা হসপিটালের একটা চালাকি ছিল কি না জানি না।

ক্যাথ ল্যাবের বাইরে পায়চারী করছি। ভেতরে চলছে অপারেশন। একের পর এক ফোন আসছে। মাঝে মধ্যে খবর পাচ্ছি অপারেশন ভালোই চলছে। শুধু ড্রেসিংটা বাকি। শেষ পর্যন্ত ডা. মুনমুন দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। হাসিমুখ দেখে বুঝতে কষ্ট হলো না অপারেশন সাকসেসফুল।

তিন দিন পর বাবাকে রিলিজ করা হলো। পরামর্শ অনুযায়ী তিন মাস পর আবার চেকআপের জন্য ঢাকায় নিয়ে এলাম। চেকআপে জানা গেল বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ। এই তো সেদিন মাকে নিয়ে পবিত্র হজ পালন করে এলেন। আলাপচারিতায় প্রায়ই বলে থাকেন, আমার হার্ট তো এখন নতুন। সবার ভালোবাসাতেই তিনি নতুন করে আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন।

মাঝে মধ্যে যখন বাবার কথা খুব বেশি মনে হয় তখন ডাক্তারের সেদিনের সে কথাটি বারবার মনে পড়ে– বাবার হার্ট চির নতুন; কিন্তু কোমল নয়। ওই যে ডাক্তার বলেছিলেন– নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলতে কি আর চান না…।

আমারও প্রশ্ন তাই?

বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে

আকাশের ঠিকানায়

তোফায়েল আহাম্মদ তানজীর

প্রিয় দেশনেত্রী ও জননেত্রী

ভালোবাসা দিবসে আপনাদের জন্য ভালোবাসা। জানি না আপনারা এ লেখা পড়তে পারবেন কি না? কিন্তু আকাশের ঠিকানায় লিখতে তো কোনো দোষ নেই, হয়তো ‘ধৎৎড়ি ধহফ ঃযব ংড়হম’ কবিতার মতো যার উদ্দেশে যা পাঠানো হয় তা ঠিকই তার কাছে চলে যাবে, সে ভরসায় লিখছি।

এবারের ভালোবাসা দিবসই ব্যতিক্রম। দেশে জরুরি অবস্থা, ৪০ টাকা কেজি চাল, ১০৫ টাকা কেজি তেল, আপনারা মাইনাস হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে, আবার কেউ কেউ নতুন করে জাতির অভিভাবক হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমরা আর মামুরা ছাড়া সারা দেশে ভালো কেউ নেই। আর সব্বাই পচা। এই অবস্থা কি!

প্রিয় দুই নেত্রী

মানুষের ভালোবাসা পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র যদি আবিষ্কার হতো আপনারাই বলুন, সেই যন্ত্রে আপনাদের প্রতি এ দেশবাসীর ভালোবাসা কি পরিমাপ করে শেষ করা যাবে? কতো মানুষ হাসতে হাসতে আপনাদের কথায় জীবন দিয়ে দেবে! কাড়াকাড়ি লেগে যাবে কে কার আগে জীবন দেবে। এক জীবনে এতো

ভালোবাসার চেয়ে বেশি কি প্রয়োজন!

আপনারা কেন একে অন্যের চেহারা দেখতে চান না? অথচ একজনকে জেলে নেয়ার পর আরেকজন ঠিকই কথা বলে উঠলেন, জেলে নেয়ার প্রতিবাদ করলেন। আবার জেল থেকে আরেকজন চিঠি লেখেন,

'বাড়ির কাছে আরশীনগর সেথা এক পরশী বসত করে,

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।'

অথচ তার চেয়ে কতো কাছে এসেও আপনারা কেউ কারো দিকে তাকিয়েও দেখেননি।

হায়রে অভাগা জাতি! যাদের জাতি এতো ভালোবাসা দিল, তারাও এ জাতিকে ভালোবাসলেন অথচ নিজেদের জেদটাকে বিসর্জন দিতে পারলেন না!

প্রিয় দুই নেত্রী, আপনারা সারা বাংলার পথে-প্রান্তরে গ্রামে-গ্রামান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন মানুষের সঙ্গে, মিশেছেন তাদের মনের কথা প্রাণের দাবি যতোটুকু বুঝেছেন তাকি আমাদের উপদেষ্টা সাহেবরা বুঝবেন?

আমি কোনো লেখক নই, ঠিক গুছিয়ে লিখতে জানি না! তবে দুটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই−

এক. মায়ের মৃত্যুর পরও দেশনেত্রীর সঙ্গে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হলো, সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে না দিয়ে যে খেলাটি খেলা হলো তা কি কারো ভালো লাগার কথা?

দুই. যখন উপ-কারা মহাপরিদর্শক সাহেব বললেন, জননেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে শুধু রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা, তখন (টিভিতে দেখেছি) কে একজন অসহায়ভাবে বলে উঠলো কেউ রক্তের থাকলে তো দেখা করবে! আহারে! দেশের জন্য আপনারা হারিয়েছেন আপনাদের সবচেয়ে আপনজনকে, আপনারা তো বাংলা মায়েরই সন্তান। যাদের দুঃখ লাগলে কাজ হবে তাদের এসবে দুঃখ লাগে না অথচ আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের এতো মায়া লাগে কেন?

২০০৮ সালের ভালোবাসা সংখ্যার মাধ্যমে যারা দেশ চালান তাদের প্রতি আমার নিবেদন, ১৪ ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে দুই নেত্রীকে দেশবাসীর সঙ্গে মুক্তভাবে চলার সুযোগ দিন তাহলে মানুষ

খুশি হয়ে আপনাদের জন্য দোয়া করবে। দুই নেত্রীর নিজেদের ভুলগুলো তারা নিজেরা শুধরে নেবেন। সত্যিকার লোকদের দল থেকে মাইনাস করবেন। দেশের মানুষ আবার উৎপাদনে ঝাপিয়ে পড়বে নবউদ্যমে।

মাঠে ফলবে সোনার ধানের বাম্পার ফলন।

এগুলো সারা দেশের মানুষের মনের কথা। দয়া করে কান পেতে শুনুন!

কাফরুল, ঢাকা থেকে

যাহা বলিব সত্য বলিব

বশিরুজ্জামান বশির

আমার বন্ধুর বয়স ৩৩ বছর। আর তার স্বামীর বয়স ৬৫ বছর। দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়ে সে বর্তমানে অক্ষম। তাই আমার বন্ধুটির লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার। আমার বন্ধু বাইরের আলো দেখতে পারে না। সে গৃহবন্দি। তাকে গৃহবন্দি করে রেখে প্রতিদিন নির্যাতন করা হয় এবং কড়া নজর আছে তার প্রতি যেন সে ঘরের বাইরে গিয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতে না পারে।

আমার বন্ধু কিছুটা অর্থ লোভী। যে কারণে অনেক নির্যাতন ভোগ করার পরও অর্থের লোভে একজন অমানুষের ঘর করছে। আমি তার জীবন কাহিনী শুনে খুবই কষ্ট পেয়েছি ও মর্মাহত হয়েছি। কিন্তু বন্ধু তা অনুভব করতে পারেনি। তার বন্ধু হিসেবে সারা জীবন তার পাশে থাকতে চেয়েছিলাম। অথচ বন্ধু তা চায়নি। বন্ধু আমার সঙ্গে গোপনভাবে দৈহিক সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিল, যার কোনো প্রমাণ থাকবে না, কেউ জানবে না ইত্যাদি।

বিষয়টি আমার কাছে কেমন জানি বেমানান মনে হয়েছে। আমি একজন বিবেকবান মানুষ হয়ে এ কাজ করা ঠিক হবে না ভেবে বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ এক পর্যায়ে বন্ধ করে দিই। বন্ধুও আর আমাকে মনে করে না। তার বাসার কাজের মেয়ের মাধ্যমে আমাদের অনেক চিঠি, ছবি ও সিম কার্ড আদান-প্রদান হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে বৈধভাবে পেতে চাই। যদি তুমি এ প্রস্তাবে রাজি থাকো আমার কোনো আপত্তি নেই।

বন্ধু রাজি হলো না। তার একমাত্র মূল কারণ ছিল টাকা। বন্ধু যদি আমার কাছে চলে আসে তার আর বিলাসী জীবন-যাপন করা হবে না। আমি একজন অভাবী মানুষ। মেয়েরা বেশির ভাগ অর্থ লোভী। আমার টাকা-পয়সা

না থাকায় কোনো মেয়ে আমার বন্ধু হতে চায় না! তবুও একজন ভালো বন্ধুর কামনা করি সব সময় । তবে আমার সাবেক বন্ধুর মতো নয় । চাই একদম ঝামেলামুক্ত নির্ভেজাল সুন্দর মনের মেয়ে বন্ধু । বন্ধু এবং বন্ধু ...

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

মানে

ভালোবাসা মানে
পার্কের আলো-অন্ধকারে
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খাওয়া
ভালোবাসা মানে
ফাস্টফুড আর চায়নিজে বসে
মানিব্যাগ খালি করা ।

সাগর
কুচাতইলী, কুমিল্লা

আবু সালেমের গল্প

জাহাঙ্গীর

আবদুল মজিদ বিন আবদুল্লাহ, যাকে সবাই আবু সালেম বা সালেমের বাবা নামেই চেনে । বয়স ৫৫ কিংবা ৬০ হবে । মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকা এ বৃদ্ধ মাছরি বা ইজিপশিয়ান । কাজ করে একটা মাতাম বা হোটেলে । এ চমৎকার মানুষটা প্রায় রাত আমার দোকানে এসে আমার সঙ্গে আড্ডা দিতো আর মজার সব জোকস বলতো । যখন তাকে তার পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, সে নীরব থাকতো । সে তার পরিবার নিয়ে বলতে উৎসাহ বোধ করতো না বরং এ ব্যাপারে তাকে বিরক্ত দেখাতো । সে অন্যকে উপদেশ দিতে পছন্দ করতো বিশেষ করে আমাকে । প্রেম করে বিয়ে না করার জন্য প্রায় সময় আমাকে বলতো আর কথাটা বারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতো । এ উপদেশগুলো দেয়ার সময়ও আমি জানতাম না এ লোকটা এক কষ্টকর অতীত বয়ে বেড়াচ্ছে ।

তখন ২৫ বা ২৬ ছিল আমার বয়স । একটা বাকালা বা মুদির দোকান ছিল আমার । ঘরে ছিল শুধু মা, অবশ্য তিনটা বোনও ছিল আমার, যাদের বিয়ে হয়েছে অনেক আগে । আর বাবা যখন মারা যাচ্ছিল আমার

বয়স তখন ১১ ।

আমার কিছু বন্ধু ছিল যারা সত্যিই অসাধারণ । সুলতান তাদের মধ্যে একজন । প্রায় সময় সে আমাকে দাওয়াত করতো তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য । আর আমি সব সময় তা ভুলে যেতাম । দুই বছর আগে শেষবার গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে যখন ওর বিয়ে উপলক্ষে সব বন্ধুকে দাওয়াত করেছিল ও । একদিন আমি দোকান বন্ধ করতে যাবো এমন সময় ও উপস্থিত । আমাকে নিতে এসেছে ও । অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে যেতে হলো ওর সঙ্গে ।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সুলতানের বউকে চিনবো না আমি । একবারই দেখেছিলাম তাকে দুই বছর আগে, তাও বিয়ের সাজে । নিজের অনুমান ভুল প্রমাণ করে ঠিকই তাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম আমি । তবে যেটা পারিনি সেটা হলো তার পাশে বসা মেয়েটাকে চিনতে ।

আমি জানতাম সুলতানের কোনো বোন নেই । আমি এটাও জানতাম, সুলতানের বউয়েরও কোনো বোন নেই । তবে যেটা জানতাম না, সেটা হলো সুলতানের স্ত্রীর একটা খালাতো বোন আছে । এ মেয়েটাই হলো সুলতানের খালাতো শালি, যার নাম নাফিসা ।

শুরু থেকেই আমি আগ্রহী ছিলাম নাফিসার প্রতি । সেও আগ্রহী ছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে । আর সুলতানেরাও চাচ্ছিল সে রকম কিছু । আমাদের সুযোগ করে দিয়ে ওরা অন্য রুমে চলে গেল । আর আমি চলে গেলাম স্বর্গের কাছাকাছি, যেখানে এর আগে কখনো যাওয়া হয়নি আমার ।

তার অসাধারণ দুটি চোখ, কথা বলার ঢং আর অদ্ভুত সুন্দর কণ্ঠ আমার হৃদয় টাচ করেছে প্রথম দিনেই । খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার মিলিত হচ্ছি, বললাম আমি । সে আমার একটা হাত তার দুই হাতের মাঝখানে রেখে বললো, আমরা আমাদের স্বপ্নকে অনেক দূর নিয়ে যাবো, যেখানে শুধু সুখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে । তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছো?

হ্যা বলে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম সেদিন ।

পরের গল্পটা অন্য রকম । ব্যবসার প্রতি মনোযোগ হারাচ্ছিলাম আমি । নিজের শরীরের প্রতিও খেয়াল রাখতাম না । শুধু তার কথাই ভাবতাম আর তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটতাম তার বাড়ির দিকে । যা হওয়ার তাই হচ্ছিল, আস্তে আস্তে ব্যবসা খারাপের দিকে যাচ্ছিল আর তার সঙ্গে যোগাযোগটাও বেড়ে গেল আমার । এভাবে এক বছর কাটার পর আমি বুঝলাম সে-ই আমার জন্য সবদিক দিয়ে মানানসই । সে-ই সেরা বাছাই হতে পারে আমার জন্য । আমার জীবনটা এগিয়ে নেয়ার জন্য তাকেই আমার প্রয়োজন ।

এর কিছু দিন পর আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মায়ের সামান্য আপত্তি সত্ত্বেও আমরা বিয়ে করলাম শাবানের ১৮ তারিখে। মায়ের ইচ্ছা ছিল তার ভাইয়ের মেয়ে জহুরাকে বিয়ে করি আমি। সত্যি বলতে কি জহুরা ছিল খুব ভালো একটা মেয়ে এবং মানুষকে আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট গুণ ছিল তার। নাফিসার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হতো তবে জহুরাকেই বিয়ে করতাম আমি।

প্রথম বছরটা চমৎকার কাটিয়েছি আমরা। আমরা বুঝতে পারিনি দিনগুলো কিভাবে গেল। আমরা তখন বুঝতে পারলাম আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হলো যখন বন্ধুরা আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে গিফট পাঠালো।

একটা ধাক্কা খেলাম এর চার-পাচ মাস পর, যখন মা মারা গেল। সে ছিল আমার ছায়া, যে আমাকে সাহায্য করতো নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুখী জীবন গড়তে। মমতাময়ী মহিলাটি শুধু আমার মা-ই ছিল না, সে ছিল আমার কোচ, আমার লাইফ কোচ।

মায়ের মৃত্যুর পর আমি আমার স্ত্রীর কাছে আরো বেশি ভালোবাসা ও সহানুভূতি আশা করেছিলাম এবং আমি তা পেতে সফলও হলাম। সে আমার প্রতি আরো বেশি যত্নশীল হলো এবং নিজের সব কিছু আমাকে উজাড় করে দিল যেন আমি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারি।

আমি ভাবতে পারিনি ওই সুখটা খুব শিগগিরই আমার কাছে অতীত হয়ে যাবে।

যেদিন আমাদের দ্বিতীয় বিয়ে বার্ষিকী উদযাপন করলাম ঠিক তার দুদিন পর আমার বড় বোনের ছেলে সামি আমাদের ঘরে উঠলো। নাফিসার প্রায় সমবয়সী আমার এ বোনের ছেলেটা দেখতে সুন্দর ছিল আর সব দিকে ছিল সেরা। ওই ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলেটি আমাদের ঘরে থেকেই লেখাপড়া করবে বলে এসেছে।

কয়েক মাস পর বুঝতে পারলাম নাফিসার পরিবর্তন। সে আগের মতো আমাকে ভালোবাসছে না, আমার প্রতি আগের মতো যত্নশীল নয় সে। আর বিছানায় সব উজাড় করে দিতো না আগের মতো। তার রুক্ষ আচরণ আমাকে কষ্ট দিতো। আমার প্রতি তার এ মনোভাব তার প্রতি আমার সন্দেহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি প্রার্থনা করতাম আমার সন্দেহটা মিথ্যা হোক। কিন্তু সে রকমই ঘটলো যে রকম আমি সন্দেহ করেছিলাম।

যেদিন সামির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে নাফিসাকে আমাদের বেডরুমে আবিষ্কার করলাম সেদিন শূন্যে লেদা পোকার মতো কিছু দেখছিলাম আর ঝি ঝি শব্দে আমার কান দুটি প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি আমার

বুকের ওপর একটা পাহাড় অনুভব করলাম আর ব্যাপারটা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সে কথাই ভাবছিলাম।

আমি জানতাম নাফিসাকে আমি আঘাত করতে পারবো না, কেননা আমি তাকে ভালোবাসি আর সামির গায়ে হাত তুলতে পারবো না কেননা সে আমার ভাগিনা যাকে আমি আদর-স্নেহে কোলে নিয়ে বড় করেছি।

আমি তাদের কিছু বলতাম না। আমার ভয় ছিল আমি কিছু বললে ওরা পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো আমার জীবন থেকে চলে যাওয়া। আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমার স্ত্রীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতাম আমি। তাকে ছাড়া চলবো সে রকম কখনো ভাবিনি।

দিনে দিনে সামি নাফিসার আরো কাছে আসতে থাকলো। আর আমি চলে যাচ্ছিলাম দূরে। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম নাফিসার সঙ্গে থাকার যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলছি। ঠিক এ সময় আমার পাশে এসে দাড়ালো জহুরা। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আমার প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে সে আমাকে সাহস জুগিয়েছে, আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে বেচে থাকার জন্য। খারাপ সময়ে কিভাবে লড়তে হয় সেটাও শিখেছি আমি জহুরার কাছ থেকে।

এতো কিছুর পরও আমি নাফিসাকে ঘৃণা করিনি। আমি বিশ্বাস করতাম, সে আমার কাছে ফিরে আসবে তার সব ভুল বুঝে। আমরা আবার স্বপ্ন দেখবো সেখানে যাওয়ার, যেখানে সুখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

না! আমাদের আর একসঙ্গে যাওয়া হয়নি। তার আগে সামির হাত ধরে সে চলে গেল সুখের সন্ধানে।

আমি তার কাছে তেমন কিছুই চাইনি। আমি চেয়েছিলাম কিছু সুখ, সামান্য ভালোবাসা আর কয়েকটা সন্তান। সে আমাকে সন্তান দেয়নি, সুখ দেয়নি, ভালোবাসাও দেয়নি। সে কষ্ট দিয়েছে আমাকে। আমাকে কাদিয়েছে আর আমার মনটা ভেঙে দিয়েছে। তারপরও আমি তাকে ভালোবাসি এবং বেচে থাকা পর্যন্ত ভালোবেসে যাবো। আমি কখনো তাকে ভুলতে পারবো না আর ভুলতে চাইও না।

আবু সালেম যখন গল্পটা শেষ করে আমার দিকে তাকালো আমি তখন তার চোখে পানি ঝরতে দেখলাম। এতো বিমর্ষ এর আগে কখনো দেখিনি তাকে। এতো কিছুর পরও যে প্রশ্নটা তাকে না করে পারলাম না সেটা হলো, জহুরার কি হলো আর তোমার যদি কোনো সন্তান না থাকে তবে কেন সবাই তোমাকে আবু সালেম বা সালেমের বাবা বলে ডাকে?

সেটা আরেক গল্প, আরেক দুঃখের কাহিনী, সেটা অন্য একদিন বলবো। যেতে যেতে বললো সে।

আমি তার চলে যাওয়া দেখছিলাম আর অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম গল্পটা কি রকম হতে পারে।

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

জয়ী কে

সজল

এইমাত্র ঘড়িতে ১২টা বাজলো। জয় নাম্বার বানিয়ে ফোন করা শুরু করলো। প্রথম যে নাম্বার ডায়াল করলো তাতে 'সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না'। এর পরেরটা রিং হচ্ছে, তবে রিসিভ করলো গরুর মতো কণ্ঠের এক পুরুষ। আর তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে জয় লাইন কেটে দিল। এর পরের নাম্বারটা 'ব্যবহৃত হচ্ছে না'। চতুর্থবার যে নাম্বারটা ডায়াল করলো তা রিসিভ করলো এক কোকিলকণ্ঠী ললনা।

মেয়ে, হ্যালো।
জয়, আপনি কেমন আছেন?
কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেয়েটি ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল, হ্যা ভালো। তুমি কেমন আছো?
জয় একটু ঘাবড়ে গেল। মেয়েটা তাকে তুমি বলছে। সে সাহস করে বললো, হ্যা ভালো। কি করছো?
তোমার সঙ্গে কথা বলছি।
হ্যা, কিন্তু এতোক্ষণ কি করছিলে?
তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। আচ্ছা তুমি কালকে ফোন করোনি কেন?

এবার জয় আরো চমকে গেল। কি ব্যাপার মেয়েটি সম্ভবত তার প্রেমিক মনে করে আমার সঙ্গে কথা বলছে। অমনি জয় নিজেকে মেয়েটির প্রেমিক হিসেবে তার সঙ্গে প্রেমের আলাপ আরম্ভ করে দিল।

কালকে মোবাইলে টাকা ছিল না।
এই তোমার কি মন খারাপ?
হ্যা।
কেন?
তোমার আদর পাই না তাই।
এভাবে ওই রাতে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রায় ৪০ মিনিট কথা হয় এবং এক পর্যায়ে মোবাইলে একে অন্যকে চুমু খায়।

পরদিন সকালে মেয়েটির নাম্বার থেকে তার কাছে ফোন এলো ।
হ্যালো ।
আচ্ছা আপনি কে বলুন তো?
আপনি কার সঙ্গে কাল রাতে কথা বলেছেন?
আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার এখন ভীষণ লজ্জা করছে । আপনাকে চিনি না, জানি না; কিন্তু কাল রাতে আপনার সঙ্গে কি সব কথা বললাম ।
কেন, সমস্যা কোথায়?
আসলে আমি আমার বোনের দেবর মনে করে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম । আপনি কিছু মনে করবেন না ।
না, না সমস্যা নেই ।
আপনাকে একটা অনুরোধ করবো রাখবেন?
কি?
আপনি এ নাম্বারটা আর কাউকে দেবেন না । আর নাম্বারটি আমাদের ফ্যামিলি নাম্বার, তাই আপনিও যদি আর ফোন না করেন তাহলে ভালো হয় ।
আচ্ছা ঠিক আছে । তবে মাঝে মধ্যে আপনাকে মনে পড়লে রাতে ফোন করতে পারি ।
অন্য কেউ রিসিভ করলে লাইনটা কেটে দেবেন ।
আচ্ছা ।

এরপর থেকে এ মেয়েটির সঙ্গে জয়ের প্রায় রাতেই কথা হতো । মেয়েটির নাম রাখি । বাড়ি টাঙ্গাইল । এক পর্যায়ে মেয়েটি জয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে । জয়ের কথা বলার স্মার্টনেস, মজার মজার গল্প মেয়েটিকে আকৃষ্ট করে । এছাড়া মোবাইলে জয়ের কণ্ঠটাও ভালো শোনায় । সে জয়কে তাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনতে স্বপ্ন দেখায় । কিন্তু জয় মেয়েটির প্রতি কোনো দুর্বলতা নয়, স্রেফ মজা নেয়ার জন্য কথা বলতো । কারণ সে মেয়েটির সঙ্গে বেশির ভাগ সময় শুধু যৌনালাপ করতো এবং প্রায় তারা মোবাইলে সেক্স করতো । সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । সেক্সের এক পর্যায়ে একে অন্যের উত্তেজনায় ভরপুর নিঃশ্বাস ও চিৎকার শুনতে পেতো । এভাবে চলতে থাকলো?

এক পর্যায়ে মেয়েটি প্রতিদিন জয়কে ফোন করতো । তার সঙ্গে দেখা করার জন্য, জয়ের ছবি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা শুরু করলো । কিন্তু জয় মেয়েটিকে ছবি পাঠাবে, তার সঙ্গে সশরীরে দেখা করবে এসব মিথ্যা প্রত্যাশা দিয়ে রাখির সঙ্গে নিয়মিত তার অদ্ভুত, বিচিত্র রুচি মোবাইল সেক্স চালিয়ে যেতে লাগলো ।

এরই মধ্যে মেয়েটি প্রায় জয়কে ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলভাবে বলতো । মাঝে মধ্যে কান্নাও করতো এবং বলতো, সারাক্ষণ সে জয়কে নিয়ে ভাবে । তার সঙ্গে দেখা হলে সে কি করবে? তারা কি পালিয়ে যাবে নাকি কি করবে? আর জয় কি তাকে সত্যিই ভালোবাসে? এসব অনিশ্চিত ভাবনায় তার খাওয়া-দাওয়ার রুচি কমে গেছে, সারাক্ষণ অস্থির লাগে । কিছুই ভালো লাগে না তার ।

কিন্তু জয় যার স্বভাব, কোনো কিছু জয় করার পর সে জিনিসের প্রতি তার কোনো আগ্রহ থাকে না । ঠিক

তেমনি রাখি নামক মেয়েটির সব আবেগ, ভালোবাসা যখন তাকে নিয়ে তখন সে মেয়েটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মেয়েটির আকুতি, কান্না তার মনে কোনো ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারে না। আর তাই সে হঠাৎ করে তার মোবাইল নাম্বারটা পরিবর্তন করে ফেলে। যাতে মেয়েটি তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে না পারে। জয় এ ক্ষেত্রে নিজেকে জয়ী ভাবে।

কিন্তু কে জয়ী? যে কাউকে ভালোবাসে নাকি যে কারো ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা করে, ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে।

রাখির আর কোনো খবর জয়ের কাছে নেই। রাখি কি ভালো আছে? সুস্থ আছে? সে কি সত্যিকারের কোনো সঙ্গী খুজে পেয়েছে?

চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

মি

আবদুল আউয়াল (মিল্টন)

অনন্য বন্ধুত্বের সম্ভার 'মি' আমি তোমার জন্য সঞ্চিত রেখেছি। তোমার ইচ্ছাটাই আমার প্রত্যাশা। তোমাকে জীবনে পাই বা না পাই, অন্তত কিছুক্ষণ কাছ থেকে দেখার বড্ড তেষ্টা হয়। সে তেষ্টা মেটাতে না পারলেও তুমি রৌদ্র উত্তাপ দিও না যেন। এই বাসনা সবাইকে জানিয়েই তোমার কাছে রাখলাম।

নোয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে

শহরের শেষ বাড়ি

সোমেশ্বর অলি

তবু, কোনো কারণ নেই, মিছেমিছিই, আমার খালি মনে হয়, এমন অনেকদিন গেছে– আমি ভেবে কূলকিনারা করতে পারিনি।

শুধু মনে হতে থাকে, মনে হ-তে-ই থাকে, সূর্যোদয়ের তীব্রতার সঙ্গে, জ্যাম দীর্ঘ হওয়ার সঙ্গে, মুখে গ্রাস তোলার কালে, এমনকি হোচট খাওয়ার সময়, যেন মনে হওয়াটা কোনো পাপ নয়, বিরাট পুণ্যি, মনে হলেই লাভ, জীবনের সার্থকতা।

মনে না হলেই যেন সব কিছু অলৌকিক হয়ে যাবে। আমার কোনো উপায় থাকবে না। মনে না হলে যেন অন্ধ গলি ধরে ঘরে ফেরা অসম্ভব হবে। দ্রুত বেড়ে যাবে চুলের খুশকি। মরে যাবে নখের সৌন্দর্য। বুঝি অর্থহীন হয়ে পড়বে এ স্ট্রাগল। স্বার্থপরের মতো দ্রুত নাগরিক হতে চাওয়া মনের কূটচাল ব্যর্থ হবে শুধু মনে না হলে।

তাই মনে হওয়া ভালো, আমার খালি মনে হয়– সে থাকে এ শহরে, এ শহরের একেবারে শেষ বাড়িটিতে।

সত্যি? বুঝিবা ওখানেই তার থাকার কথা, ওখানে ছাড়া তাকে আর কোথায় মানাবে পৃথিবীর? ওখানেই সে সুন্দর আছে। ভাবি, শহরের শেষ প্রান্তে যেখানে গ্রামের সূচনা, শহর আর গ্রামের ব্যবধান রেখা বলতে একটা পুরনো মাঠ, শিশির-দগ্ধতা নিয়ে ঘাসেরা বেচে রয়েছে। ঐতিহাসিক মসজিদ-মন্দির আর প্রত্নশিল্প সমৃদ্ধ সে অঞ্চল, ভূগোলের সবচেয়ে উজ্জ্বল সেই মাটি, সেখানে সে বাড়ি করে আছে বহুদিন।

সে কি একা থাকে? তা কি হয়? পৃথিবী কতো নির্মম হয়েছে... মানুষের মৃত্যুর পেছনে এখনো মানুষই বেশি দায়ী, বাঘ-টাঘ আসলে এতো ভয়ঙ্কর নয়। তার ধারণা, ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তবু পশুবৃত্তি বেড়েছে কোনো সূত্রে। আরো মনে হয়, সে এমন এক নৃত্যের মুদ্রা জানে, আমি তার খোজ পাইনি কোনো বইয়ে, আমি দীনহীন, সে দাড়িয়ে আছে, কোনোদিন আমার পা পড়েনি এমন এক নিষ্ফলা আঙিনায়, তবে কে জেনেছে তার নিভৃতবাসের গল্প, তার দুধ ফরসা হাতের ইশারা। তাকে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী মানি, তার সব রাশিফল বৃথা হোক, সে আস্তাকুড়ে যাবে, যেমন আমি গেছি।

অবশ্য আমার এখনো যাওয়া হয়নি পুরোপুরি, যাত্রার শেষ পথে আছি। সে আমার ঠিক এক মুহূর্ত আগে পৌছে যাবে গোল্লায়। আমি তাকে আশিষ করছি, অবশ্য এরই মধ্যে আমি চাইবো সেই দুধ ফর্শা হাতের ইশারা, নিভৃতবাসের গল্প যদি সে ভুলে যায়, চিরতরে, আর কখনো যদি তার মনে না পড়ে শহরের শেষ বাড়ির প্রসঙ্গ, তবে আমি তার রক্ষক হবো। স্রষ্টা তাকে বাচিয়ে রাখুন।

তবু কোনোদিন, ওই বাড়িতে আমার যাওয়া হবে কি না, আমার তা-ও মনে হয় না, কেন মনে হয় না কে জানে, আমি তবে রহস্য ভালোবাসি! যেন ও বাড়িতে গেলে সব চমকের অবসান ঘটবে, তার মুখোমুখি হলে বুঝি থেমে যাবে চেনা নদীটির চলাচল, ফুসফুসে হাওয়া থাকবে না, এমন মনে হয়। দেখা হলেই সব প্রত্নশিল্প বিলীন হবে পম্পেই নগরীর মতো, তারপর অনেক অনেক যুগ পর সে আবিষ্কৃত হবে একদল শিল্পীর গবেষণায়। সে তখন মূর্তি। উলঙ্গ সৌন্দর্য তাকে দেবী করেছে।

আমি চাই না সে দেবী হোক। বরং সে যেভাবে আছে তেমনি থাক, আমার অদেখা থেকে যাক।

সাক্ষাতে পাওয়ার চেয়ে তাকে উকিতে দেখে যাবো, যদি কোনোদিন ওই পথে হেটে যাই । কারণ আমি জানি, মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করার কথা যে, সৌন্দর্যকে নেড়েচেড়ে দেখতে গেলেই বিপত্তি, সামান্য উকিতে তাকে দেখে নেয়া ভালো... ।

অস্ত্র

আলীম আল রাজী

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র । কাজিন রূপা আপা বয়সে আমার চেয়ে তিন বছরের বড় হলেও সেবার দ্বিতীয়বারের মতো এসএসসি দিচ্ছেন । বলাবাহুল্য, ছাত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন রামগাধা প্লাস । আগেরবার জেলা সদর কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে অঙ্কে পেয়েছেন অফফর্ম ব্যাটসম্যানের মতো পেয়ার ।

তাই এবার মফস্বলের কোনো এক কেন্দ্রে গিয়েছেন নকল করে পাসের আশায় । উঠেছেন অতি দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি । সেই বাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে চার কিলোমিটার দূরে কোনো এক চরে ।

নকলে সহায়তার জন্য অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন আমাকেও সেখানে যেতে হলো । ফাল্গুনের দুপুরে কাঠফাটা রোদে ঘেমে যখন আমি সেই বাড়িতে পৌছি তখনই লীনার সঙ্গে প্রথম দেখা ।

বিকালটা ওর সঙ্গেই ঘুরলাম । হাটু জল নদী দেখলাম । তখন কি আমার মনে অন্য রকম কোনো ভাবনা এসেছিল? সে কথা এখন আর মনে পড়ে না ।

একই ঘরে পাশাপাশি দুটি খাট । রাতে একটিতে শুয়েছি আমি আর অন্যটিতে রূপা আপার সঙ্গে ক্লাস টেন পড়ুয়া লীনা । এগারোটায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না । হঠাৎ গায়ের ওপর ভারি কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে জেগে উঠলাম । আমার বুকের ওপর তখন তাল তাল মাংস । গালে, ঠোটে পাগলের মতো কেউ চুমু খাচ্ছে । আমার তো অন্তরাত্মা শুকিয়ে মরুভূমি । রূপা আপা টের পেলে বলবেন, আজ তোর একদিন আর আমার যে কয়দিন লাগে । সবকিছু বুঝেও ফিশফিশিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

কে?
কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, লীনা ।

আমার আপাদমস্তক তখন শিহরিত। ভয় এবং আনন্দের সেই মিশ্র অনুভূতি বর্ণনার ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয়নি। নিঃশব্দে স্থান বিনিময় করলাম। অর্থাৎ সে নিচে আমি ওপরে।

অপার রহস্যময় আনন্দের উৎস আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্লেটো কিংবা ফ্রয়েড তখন কোনোটিই পড়া হয়নি। তবু জানি না কেন ক্লাইম্যাক্সের দিকে যেতে পারছিলাম না। হয়তো আপা জাগলে এন্টিক্লাইম্যাক্সের ভয় ছিল তাই।

আমার দুই হাত তখন আসমুদ্রহিমাচল বিচরণ করছিল। মুখে, জিভে, গালে, হাতের তালুতে সর্বাঙ্গেই লীনার করুন শঙ্খের মতো স্তন। তার শরীরের মাদকতায় আমি বাধনহারা।

দুই উরুর সন্ধিস্থলে হাত পড়তেই লীনা বললো– হাত দেন ক্যান, আপনার অস্ত্র নাই?

একেবারে অরিজিনাল চউরা ডায়ালগ।

আমি আর কি জবাব দেবো। অস্ত্র তো তখন তার হাতে। তাছাড়া তার এ অদ্ভুত শব্দচয়ন শুনে হাসিতে আমার বুক ফাটার দশা।

উন্মেষের সময় থেকেই নারীর শরীরের প্রতি কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর না পাওয়ার হাহাকার বুকে লুকানো ছিল। অথচ সেদিন লীনাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারলাম না। এটা কি তথাকথিত সততার কারণে, নাকি কাপুরুষতার? আমি জানি না।

হতাশ লীনা (আমিও কি হতাশ হইনি?) একটু পরে শান্ত স্বরে বললো– আপনাক অন্য দোস্তক মেন কন?

সরল বাংলায় তার কথার তর্জমা দাড়ায়, আপনার অন্য বন্ধুদের এসব বলবেন না।

লীনার অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি। তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ ছিলাম। বন্ধুদের খুব মজা করে অনেকবারই সে রাতের ঘটনা বলেছি। বিদায় বেলায় লীনার চোখে পানি দেখেছি বলে আমার মনে এক ধরনের চাপা অহঙ্কারও ছিল। আজ মনে হয়, লীনার সেদিনের চোখের জলও মূল্যহীন ছিল না। সেই চোখের জলের মূল্য শুধু ভালোবাসা দিয়েই শোধ করা যায়।

কালাবহ, জামালপুর থেকে

কথার কথা

লাভলী

কথার অনেক কথা শুনেছি, আমার প্রতিবেশী হেনা আপার কাছে। সুন্দরী কথার সুন্দরের গল্প শুনে মাঝে-মধ্যে কেবল গল্পই মনে হতো। কারণ কখনোই কথাকে দেখেনি। আপার বাসায় দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারের অপরূপ সুন্দরী মডেল কন্যাটিই নাকি কথা। এতো গল্প যার, এতো রূপ যার, এতো সুন্দরী যে, সে কেন কেবলই গল্পে আর দেয়ালে টানানো, কেন আসে না। কেন তাকে দেখি না। হেনা আপার কাছে জানতে চাইলে বললেন অসুবিধা আছে। যখন তখন যেখানে সেখানে সে যেতে পারে না। কিন্তু কেন সেটা আর হেনা আপা বলে না।

অনেকদিন পর একদিন হেনা আপা আমাকে ডেকে বললেন, বাসায় আসো, কথা আছে। তখন সন্ধ্যার পর।

গিয়ে দেখলাম হেনা আপা রান্নাঘরে চা করছে। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক কথা বলছেন হেনা আপার সঙ্গে। হেনা আপা আমাকে ঘরে যেতে ইশারা করলেন।

সেখানে একটি মেয়ে বসে ছিল। খুব সুন্দরী। সালাম বিনিময় করে পাশে বসলাম। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল। আপা ঘরে এসে বললেন, চিনেছো এ কিন্তু কথা। যাকে দেখতে চেয়েছিলে।

একবার দেয়ালে, আরেকবার কথার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হ্যা তাইতো ছবির মেয়েটিই তো আমার সামনে। ছবির চেয়েও বেশি সুন্দর বাস্তবে। যাকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, তাকে দেখে খুব অন্য রকম ভালো লাগায় মনটা ভরে উঠলো। তবে মনে হলো কথা খুব চুপচাপ প্রকৃতির।

আপা আমাকে বললেন, এখানে বেশিক্ষণ থাকা কথার জন্য ঠিক নয়। আমরা এক জায়গায় যাবো। সেখানে গিয়ে গল্প করবো। তোমার সময় থাকলে যেতে পারো। আর গেলে দ্রুত তৈরি হয়ে এসো। কোনো কথা না বলে, বাসায় গিয়ে বলে এলাম।

সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছেন। বেশ দামি ঝকঝকে গাড়ি। গাড়ি গিয়ে থামলো একটি আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংয়ের সামনে। কারেন্ট নেই। অন্ধকার রাত্রি। কিছুটা ভয় পেয়ে হেনা আপার হাত চেপে ধরলাম। আপা বললেন, ভয়ের কিছু নেই। এটা রতন ভাইয়ের নতুন বাড়ি। তখনো আমি জানি না রতন ভাইটা কে?

সবাই বাড়ির ভেতর গেলাম। কেয়ারটেকার বাতি নিয়ে এসে দোতলায় একটা অসমাপ্ত রুমে চেয়ার এনে বসতে দিল। বয়স্ক ভদ্রলোককেই হেনা আপা রতন ভাই বলে ডাকলো। বুঝলাম উনিই রতন ভাই। কিন্তু

রতন ভাই হয়তো হেনা আপার কোনো আত্মীয় হবে কিন্তু কথার কে?

রতন ভাই বাড়ির কাজ নিয়ে হেনা আপার সঙ্গে কথা বলছেন। কোথায় কি হবে, দরজা, জানালা কেমন হবে, কিভাবে সাজানো হবে, বাতি, সোফা ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা বললেন তারা তিনজন। কিছু খাবার এলো।

এতোক্ষণে আমি বুঝতে সক্ষম হলাম ৪০/৪৫ বছরের এই রতন ভাই কথার স্বামী। অবাক হলাম। ভাবনায় পড়লাম। কেমন যেন ধাক্কা খেলাম।

বাড়ি ঘুরে অন্ধকারে যা সম্ভব দেখলাম। খুব সুন্দর ছয়তলা বাড়ির দোতলায় বিশেষভাবে তৈরি হচ্ছে কথার জন্য। আমরা চলে এলাম। আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন রতন ভাই।

বাসায় না এসে হেনা আপার বাসায় গেলাম। তাকে ঘটনার রহস্য জিজ্ঞাসা করলাম। হেনা আপাকে খুব ধরলাম জানার জন্য। শুধু বললেন, রাত দশটা বাজে। বাসায় যাও এখন।

চলে এলাম।

এরপর অনেক অনুরোধের পর একদিন আপা বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে বলবো, তবে কাউকে শেয়ার করতে পারবে না।

আপা বললেন, আমি আর কথা একই স্কুলে পড়তাম একটি জেলা শহরে। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, তখন কথা মাত্র ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আমরা দুজনই স্কুলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কথা ছোটবেলা থেকেই নাচে-গানে খুব পারদর্শী ছিল। প্রতি অনুষ্ঠানেই আমরা অংশ নিতাম। ওকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করতাম। আমি ডিগ্রি পাস করার পর আমার বিয়ে হয়ে গেল। কথা ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হলো। আমার সঙ্গে কথার সম্পর্ক বোনের মতোই রয়ে গেল। কথা ছিল খুব সুন্দরী। তাই তার পেছনে ছেলেরা বেশি ঘুরঘুর করতো কিন্তু কথা ছিল শান্ত ধরনের। এসবে সে পাত্তা দিতো না জানতাম।

আমি এ সময় স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় চলে আসি। ঢাকায় আসার পরও কিছুদিন কথার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল।

একদিন হঠাৎ শুনলাম কথা কোনো এক ছেলের হাত ধরে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এরপর তিন বছর আমি আর কথার কোনো খবর জানিনি, জানতেও পারিনি। আমি এক ছেলে, এক মেয়ের মা হলাম। এক দুর্ঘটনায় স্বামী হারিয়ে বিধবা হলাম। দুটি ঘর ভাড়া, স্বামীর কিছু পেনশন আর নিজের ছোট চাকরির টাকায় কোনো রকম চলে যাচ্ছিল আমার অসহায় জীবন। আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই রতন ভাই খুব ভদ্র, ভালো মানুষ।

বিপদে-আপদে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। রতন ভাই বিবাহিত। দুই মেয়ে, এক ছেলে আছে তার।

পাচ-ছয় মাস আগে একদিন রাত সাড়ে দশটার দিকে রতন ভাই এসে গেইট নক করলো। আমার ছেলে দরজা খুলে দিলে রতন ভাই কথাকে গেইটের বাইরে রেখে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে অন্ধকারে। আমার হাত ধরলো রতন ভাই– ভাবী মেয়েটির খুব বিপদ। আপনি মেয়েটিকে আপাতত আশ্রয় দিন, পরে আলোচনা করে ব্যবস্থা করবো।

মাথায় ঘোমটা পরা কথাকে ঘরে নিয়ে এলাম দ্রুত। রতন ভাই চলে গেল। ঘরে এসে দুজন দুজনকে দেখে অবাক, হতবাক, আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কথা কেদে লুটিয়ে পড়লো আমার বুকে। দুজনে কাদলাম। কথাকে বললাম– পরে সব শুনবো। বোনের কাছে চলে এসেছো, আর কোনো ভয় নেই।

পরে শুনলাম মিলন নামে ছেলেটিকে কথা ভালোবেসে বিয়ে করলে, কথার মা-বাবা তা মেনে নেয় না। কথাকে আটকে রাখে। কথা টাকা-পয়সা, স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে মিলনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে তারা সাবলেট থাকে। কথার টাকায় চলতে থাকে সংসার। মিলন আসলে মিথ্যাবাদী, বেকার, ভ-, প্রতারক। এক বন্ধুর সঙ্গে ড্রাগের ব্যবসায় জড়িত। আর নিজেই ফেন্সিডিলের নেশায় বুদ হয়ে থাকে। এসব নিয়ে চলে কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি এবং মারামারি। মিলন কথাকে বাধ্য করে ফেন্সিডিল সাপ্লাই করতে। কথা বোরখার আড়ালে সংসার রক্ষা করার জন্য তাও মেনে নেয়। তাতেও মিলন ক্ষান্ত হয়নি। বড় বড় হোটেলে মদের আসরে নাচ-গান করে মদ তুলে দিতে বাধ্য করে কথাকে।

সুন্দরী কথার প্রতি পশুর মতো জানোয়াররূপী মানুষগুলো হাত বাড়ায়। মিলন এবার তাই করাতে চায় কথাকে দিয়ে। এমনি গভীর রাত। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। মিলন কথাকে মারধর করে বাধ্য করে হোটেলে রাত কাটানোর জন্য। রাত বারোটায় মিলন কথাকে জোর করে তুলে দেয় এক বন্ধুর গাড়িতে হোটেলের উদ্দেশে। এক পর্যায়ে গাড়িটি তেল নেয়ার জন্য একটি পাম্পে দাড়ায়। কথা পালানোর মোক্ষম সময় ভেবে গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়াতে থাকে রাতের অন্ধকারে। কিছু দূর দৌড়ে কথা থামে একটি বাড়ির সামনে। না পেছনে তাকে ফলো করছে না। একটু আশ্রয়ের আশায় কথা ওই বাড়ির গেইটে বসে ভিজতে থাকে।

একটি গাড়ি আসছে দেখে কথা সাহস করে গাড়ির সামনে এসে দাড়ায়। সে গাড়িটি ছিল রতন ভাইয়ের। ড্রাইভার নেমে মেয়েটিকে কারণ জানতে চাইলে কথার বিপদের কথা বলে ড্রাইভারকে ধর্মের ভাই বলে সাহায্য চায়। সব কথা শুনে রতন ভাই মেয়েটিকে সে রাতে ড্রাইভারের বাসায় পাঠিয়ে দেয়। পরদিন সন্ধ্যার পর কথাকে নিয়ে আসে আমার কাছে। এরপর কথা আমার কাছেই থাকে। রতন ভাইয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু পত্রিকা, ক্যালেন্ডারে মডেল হয় কথা। এক পর্যায়ে মিলনের সঙ্গে কথার ডিভোর্সের ব্যবস্থা করি।

পরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই কথার বিয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। যদিও কথা চাইছিল না। বহু চেষ্টা করেও কথাকে তার মা-বাবার কাছে পাঠাতে পারলাম না। এ মুখ সে আর মা-বাবাকে দেখাতে চায় না। কথাকে বোঝালাম তোমাকে হয়তো মা-বাবা অথবা স্বামীর আশ্রয়ে থাকতে হবে। আমি বিধবা। আমার নিজের জীবনই অভিভাবকহীন। তোমাকে আমি কিভাবে আগলে রাখবো? আমি আর রতন ভাই মিলে কথাকে বিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কথাকে দেখে সবাই পছন্দ করলেও বাড়ি-ঘর জানতে চায়। কথার দুর্ঘটনা না বলে বিয়ে দেয়াও ঠিক হবে না। এদিকে কথাও কাউকে আর বিশ্বাস করছিল না। উপায় না পেয়ে রতন ভাইকেই চেপে ধরলাম কথাকে বিয়ে করে কথার দায়িত্ব নেয়ার জন্য। যদিও তার স্ত্রী-সন্তান বর্তমান। তবে নির্ভর করার মতো একজন ভালো মানুষ। কথাও এতোদিনে রতন ভাইকে খুব বিশ্বাস করে ফেলেছে।

অবশেষে আমিই কাজী অফিসে নিয়ে তাদের বিয়ে দিয়ে দিই। রতন ভাই কথাকে ফ্ল্যাট কিনে সেখানে রাখছে। ড্রাইভার, বুয়া, গাড়ি সবই কথাকে দিয়েছে রতন ভাই। যে বাড়িতে সেদিন গেলাম। এ বাড়িটা পুরোটাই কথার নামে করে দিচ্ছেন রতন ভাই। কথা স্বামীকে পুরো না পেলেও পেয়েছে নির্ভরতা। নিরাপত্তা। বেচে থাকার নিশ্চয়তা।

রোম, ইটালি থেকে

অবয়ব

সবুজ ওয়াহিদ

গত তিন দিন বাসায় আমি একা। আর এ তিন দিন ধরেই জ্বরে ভুগছি। নিজে নিজে ডাক্তারি করে প্যারাসিটামল খাই। জ্বর কমে, আবার বাড়ে। কয়েক দিন একটানা কেদে গত সন্ধ্যায় আকাশ একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। শরীরটা ভালো লাগায় বের হয়েছিলাম খাবার কেনার উদ্দেশ্যে। রাস্তায় নেমে মানুষ-জন খুব একটা চোখে পড়লো না। অবশ্য পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ অঞ্চলটা বেশ ফাকা হয়ে গেছে। হাটতে হাটতে সামনের মাঠটার পাশে দাড়ালাম। পাশের মেইন রোড দিয়ে হঠাৎ দু-একটা ভ্যান, রিকশা বা যন্ত্রদানব ছুটে যায়। কিন্তু মানুষের একটুও থামার সময় নেই, একটু অলসতা করার উপায় নেই। জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়তি। টিকে থাকতে চাইলে থামলে চলবে না। এসব ভাবতে ভাবতে শরীরে বৃষ্টির ফোটা পড়তেই চমকে উঠলাম।

আকাশ মহাশয় আবার দীর্ঘমেয়াদি কান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দ্রুত পায়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম। জ্বরের শরীরে বৃষ্টির পানি পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। বাসার কাছে এসে মোড় নিতেই রাস্তার সোডিয়াম বাতিটা নিভে গেল, লোড শেডিং। একে দুর্বল শরীর, তাও অন্ধকার, তার ওপর আবার কিসে যেন হোচট খেয়ে পড়লাম রাস্তার ওপরে। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। ওঠার চেষ্টা করতে পাশ থেকে সাহায্য পেলাম। তাকিয়ে দেখি একটা গাঢ় অবয়ব। সে আমাকে ধরে বাসার সামনে এনে বললো, ‘চাবিটা দাও’।

কণ্ঠটা পরিচিত মনে হলো। চাবি দিলাম। নিচের কলাপসিবল খুলে সে আমাকে ওপরে আমাদের বাসায় নিয়ে এলো। আমার জ্বরটা আবার বাড়ছিল। কোনো রকমে হাত-মুখ পরিষ্কার করে, কাপড় বদলে আমার ঘরে এলাম।

চার্জার নিয়ে সে এতক্ষণ আমার পেছনেই ছিল। আমি বসতে চার্জারটা আমার সামনে রেখে বললো, আমি আসি।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া হলো না। তাছাড়া আপনাকে ধন্যবাদও দেয়া হলো না।

সে বললো, ধন্যবাদের দরকার নেই। তবে তোমাদের শুকনো ধন্যবাদ ছাড়া আর আছেই বা কী!

কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস। কণ্ঠটা পরিচিত মনে হওয়ায় আবারো প্রশ্ন করলাম, কে আপনি?

জানতে চাও? বলে মুখের নেকাব সরায় সে। কিছু সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলি আমি। কারেন্ট এসেছে। আলো সয়ে আসতে চোখ খুলে বিস্ময়ে থ হয়ে যাই। অস্ফুটে বলি, জরি! তুমি?

আমি আর জরি এক সঙ্গে পড়ি, মানে পড়তাম। পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে। ওর বাবা মিলে চাকরি করতেন। মিল বন্ধ হওয়ার পর থেকে ওদের কোনো খবর জানি না। উড়ো উড়োভাবে শুনেছি জরি নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। আমার কানের কাছে এ কথাটা বেশি বলার কারণ, জরির সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আমার বন্ধুদের ধারণা– সম্পর্কটা ভালোবাসার। কাপা কাপা গলায় আবার বললাম, তুমি!

হ্যা, আমি। ও পাশের ফয়েজ সাহেব এক রাতের জন্য আসতে বলেছিলেন।

যা শুনেছি তাহলে সত্যি?

কি শুনেছ জানি না। তবে যদি শুনে থাক নষ্ট হয়েছি, তাহলে সত্যি।

কেন?

তুমি বোঝ না কেন? বাবার চাকরি ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল। সেটা হারিয়ে বাবা এখন অসুস্থ। মা তো আগে থেকেই। বোনটা প্রতিবন্ধী। এবার বুঝেছ কবি সাহেব কেন। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে জরি।

তুমি একটা চাকরি খুজে নিতে পারতে।

হু, চাকরি। চাকরি করতে গিয়েই তো এ অবস্থা। যা হোক, তোমার খুব জ্বর। তুমি শুয়ে থাক। রাতে

খাবার কি ব্যবস্থা?

তুমি রাতে এখানে থাকবে?

তাড়িয়ে দিলেও যেতে পারবো না। বাইরে প্রচ- বৃষ্টি হচ্ছে। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে নাকি?

না।

তাহলে খাবার ব্যবস্থা বল।

কয়েকদিন বাসায় কেউ নেই। একদিন ফ্রিজের খাবার খেয়েছি। আজ বেরিয়েছিলাম খাবার কিনতে। কিন্তু ভুলে গেছি।

বেশ, তুমি শুয়ে থাক। দেখি আমি কিছু রেধে ফেলতে পারি কি না।

তোমার আজ রাতটা তো মনে হচ্ছে মার যাবে।

যাবে না। ফয়েজ সাহেবের বাড়িতে কি যেন সমস্যা হয়েছে। উনি বাড়ি চলে গেছেন। তবে টাকা দিয়েছেন। ওনার বাসা থেকেই ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখলাম তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়লে।

হ্যা, বেশ কয়েকদিন ধরে শরীরটা খারাপ।

জরি রাধতে চায়। আমার জ্বর বাড়ে। বৃষ্টির পানি পেয়ে বেড়ে ওঠা নতুন চারাগাছের মতোই বাড়ে। চেতনা-অবচেতনার মাঝে অনুভব করি কে যেন কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করে। ভেজা তোয়ালের স্পর্শ পাই শরীরে। গরম তরল কোনো খাবার নেমে যায় গলা বেয়ে। কার একটা ঠা-া কোমল হাত যেন আকড়ে ধরি বারবার। কত সময় চলে গেছে জানি না। একটু ভালো বোধ করি। চোখ মেলে দেখি জরি পাশে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

আমাকে চোখ খুলতে দেখে বলে, ভোর হয়ে এসেছে। আমি এখন যাই। দিনের আলোয় আমি এখান থেকে বেরুলে তোমার বদনাম হবে। তুমি একটু কষ্ট করে নিচের গেটটা আটকে দিয়ে যাও। আর দায়া করে আজ একজন ডাক্তারের কাছে যেও।

আমি বলি, জরি, আমি তোমাকে কিছু টাকা দিই।

না। খুব দৃঢ় স্বরে প্রত্যাখ্যান করে ও। সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলে, কবি সাহেব, তুমি আমাকে নিয়ে একবার একটা কবিতা লিখতে চেয়েছিলে। মনে আছে?

আছে।

আর নিশ্চয়ই লেখার ইচ্ছা নেই?

চেষ্টা করবো লিখতে। আমার উত্তর শুনে কেন জানি হেসে ফেলে জরি। রাস্তায় পা দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলে, ভালো থেক।

তুমিও, যতটা পারা যায়। উত্তরে বলি আমি।

জরি চলে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে ভোরের আধারে। বদনামের ভয়ে ভীত আমি নিজের অসহায়ত্বকে মনে মনে কুকুর বলে গাল দিই।

নওয়াপাড়া, যশোর থেকে

বিশ্বাস

দেবী

সে ছিল আমার পরম বন্ধু। কোনো বিশেষণে তাকে ভূষিত করতে চাই না। কারণ তার তুলনা সে নিজেই। অথচ যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমার স্বপ্নের পুরুষের থাকা চাই, তার অনেকগুলোই তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল।

যেমন আমার স্বপ্নের পুরুষ দেখতে হবে শ্যামলা/কালো, দুর্দান্ত স্মার্ট এবং অবশ্যই লম্বা।

সে লম্বা বটে। কিন্তু টকটকে ফর্শা এবং পোশাক পরিধানে অসম্ভব বেখেয়ালি একজন মানুষ। সে আমাদের ফ্যামিলির অপছন্দের অঞ্চলের একজন এবং আমার ফ্যামিলি বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলের অনুসারী তার বিপরীতে ছিল তার অবস্থান। তারপরও তার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক হওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল, যদি না সে আমার প্রাইভেট টিচার থাকতো। কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তবুও নিজের

অজান্তে প্রেম নামের মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হলাম।

প্রাথমিক পর্যায়ে দুজনেই বেশ ভালো বন্ধু ছিলাম। সে ছিল চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পড়ুয়া। আর আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী। পড়াশোনা ছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক হেন বিষয় ছিল না, যা আমাদের আলোচনায় আসতো না। অধিকাংশ ব্যাপারেই কেন জানি তার মতের বিপরীতে অবস্থান করতাম। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব আর যুক্তির কাছে হেরে যেতে বাধ্য হতাম। স্রষ্টার অপার মহিমায় প্রচণ্ড সুন্দরী হওয়ার কারণে যেখানে সবার বিশেষ প্রস্তাবে অভ্যস্ত ছিলাম, সেখানে আমার প্রতি তার নীরবতা আমাকে আকুল করে তুলতো। নিজের অজান্তে কখনো যদি তার দুর্বলতা প্রকাশ পেতো, সে তৎক্ষণাৎ দুজনের মধ্যে দূরত্ব নিয়ে আসতো এবং ব্যাপারগুলো হালকা করার প্রয়াস চালাতো। বুঝতাম তার সবচেয়ে বড় বাধা সে আমার

টিচার। আমার পরিবারের কাছে বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য একজন।

আমিও এ কারণে ভালো লাগা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। কিন্তু যেদিন আমার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলো সেদিন টিচার হিসেবে সে আমার কাছে বিদায় নিতে এলে আমার চোখের জলে দুজনের মধ্যে সব প্রাচীর ভেসে গেল। ঝরঝর করে আমি শুধু কাদছিলাম এবং তাকে কতোখানি ভালোবাসি বুঝতে পেরে নিজেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

কান্না শেষে লজ্জায় তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। যখন তাকালাম তখন তার অদ্ভুত মায়াভরা দৃষ্টিতে আমার প্রতিও তার প্রচ- টান অনুভব করলাম। কিন্তু পরিবার ও সমাজের কাছে তার অসহায়ত্বের কথা আমাকে ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কখন দেখা হবে?

উত্তর দিল, দুদিন পরও হতে পারে অথবা দুই বছর। বুঝতে পারলাম সে এবার দুজনের ব্যাপারে আরো কঠোর হবে। আমার ভালোবাসাও প্রচ- জেদে রূপ নিল। মনে হলো সে দূরে থাকতে পারলে আমি পারবো না কেন?

এরপর পারিবারিক সুসম্পর্কের কারণে সে মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতো। তাকে এক নজর দেখার জন্য পাগলপ্রায় এ আমি প্রায়ই তার সামনে আসতাম না, শুধু তার প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই এটা প্রমাণ করতে। পরে জানলাম এটা নাকি তাকে প্রচ- নাড়া দিয়েছিল। যথারীতি এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হলাম। এভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত আমি কলেজ ক্যাম্পাসে এক দিন আমার স্বপ্নের পুরুষটিকে দেখে প্রচ- হোচট খেলাম। অশ্রুসিক্ত নয়নে টলতে টলতে তার কাছে গিয়ে আসার কারণ জানতে চাইলাম।

উত্তর দিল, পরম বন্ধুকে দেখতে এসেছে। তারপর স্তব্ধ আমাকে একা ফেলে সে ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছিল। দৃষ্টির শেষ সীমানায় পৌছে সে আচমকা ফিরে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। আমার সে দৃষ্টিতে নাকি এমন কিছু ছিল যাকে এড়ানো তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। যার কারণে সারা পথ সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাড়ি পৌছে ভাড়া পরিশোধ না করেই ওই গাড়িতে আবার কলেজে ফিরে এলো। সে আমাকে আপত্তি না থাকলে নিরিবিলিতে তাকে কিছুক্ষণ সময় দেয়ার প্রস্তাব দেয়।

অনুগতের মতো তার পথ অনুসরণ করে চট্টগ্রাম সি-বিচে পৌছলাম। আমার স্বপ্নের রাজপুত্র সমুদ্রকে সামনে রেখে প্রথম তার ভালোবাসার কথা আমাকে জানালো। তার পিছুটান, বারবার সরে দাড়ানো; কিন্তু ভালোবাসার কাছে তার মধুর পরাজয় কিছুই বাদ রইলো না। প্রতিশ্রুতি দিল, পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়ে সে আমাকে হারাতে চায় না। তার মাস্টার্স কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত যেভাবেই হোক সব বিয়ের প্রস্তাব রুখে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। শুধু মনে হচ্ছিল মধুর কোনো স্বপ্ন দেখছি, একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেলে সব খান খান হয়ে যাবে। পরে গাড়িতে তার হাতের মৃদু চাপে সম্বিত ফিরে পেলাম। এর বারো দিন পর এক ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আবার দুজন এক জায়গায় মিলিত হলাম। এভাবে দুজনে ছয়-সাতবার বাইরে দেখা করলাম। দিনগুলো যেন স্বপ্নের পাখায় ভর করে কেটে যাচ্ছিল। তার চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যেতাম, হাতে হাত রেখে শিহরিত হতাম। বিশাল কাধে মাথা রেখে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখতাম। দুজনেই প্রেমের পবিত্রতা রক্ষার্থে সমান সজাগ ছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। শত সতর্কতা সত্ত্বেও দুই পরিবার আমাদের ভালোবাসা ও বাইরে দেখা করার কথা জেনে ফেললো। তারপরের ঘটনা বাংলা সিনেমার কপিরাইট।

আমার পরিবার তার ও তার পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলো। আমার ওপর রেড সিগনাল আরোপিত হলো। এমনকি আমার কলেজ যাওয়াটা পর্যন্ত বন্ধ হলো। চট্টগ্রামের এক প্রভাবশালী পরিবারের ছেলের সঙ্গে আমার দ্রুত বিয়ে ঠিক হলো। সে তার মা ও আত্মীয়-স্বজন দিয়ে আমার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। কিন্তু আমার পরিবার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তাদের অপমান করে বিদায় করলো।

আমাকে বোঝানো হলো বাস্তবতার মুখোমুখি হলে আমার সব আবেগ কেটে যাবে। তাতেও আমার কোনো পরিবর্তন না হলে তাদের অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আরো বেড়ে যায়। আমার ও তার কাছের অনেক বন্ধু-বান্ধব বাবা-মায়ের সেই পছন্দের পাত্রকে আমাদের ভালোবাসার কথা জানিয়ে সরে দাড়ানোর অনুরোধ করলো। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা সরে না গিয়ে জবাব দিল, তার বিত্ত-বৈভবের মাঝে থাকলে আমি পুরনো প্রেমকে ভুলে যাবো।

উপায়ান্তর না দেখে কড়া পাহারা সত্ত্বেও আল্লাহর অশেষ রহমতে পরিবার ছেড়ে চিরদিনের জন্য প্রিয় মানুষটির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। এরপর দুজনেই দুজনের পরিবারের মিলন ঘটাতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছি। আমার স্বামী মাস্টার্স কমপ্লিট করে নিজ যোগ্যতায় একটি মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কম্পানিতে চাকরি নিল।

এখন? এখন আমার দুই কাটুস-কুটুসকে নিয়ে থৈ থৈ সুখের সংসার। সম্প্রতি আমাদের বিয়ের নবম বছর পূর্ণ হলো। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিয়ের তিন মাস পরেই দুই পরিবারের মধুর মিলন ঘটে। যদি বাংলাদেশের দশজন মহাসুখী দম্পতির জরিপ করা হয়, হলফ করে বলতে পারি তাতে আমাদের নাম পাবেন। এখনো তার চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যাই। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান আমার স্বামীর বুকে মিশে যেতে যেতে মনে হয় এটাই বুঝি স্বর্গ।

সবার কাছে দোয়া কামনা করি। সঙ্গে অনুরোধ রইলো প্রিয় মানুষটিকে বিশ্বাস করুন। কখনো তাকে ঠকাবেন না। সব বিরূপ পরিস্থিতিতে তার পাশে থেকে সহযোগিতা করুন। দেখুন পৃথিবীটা কতো সুন্দর!

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
চট্টগ্রাম থেকে

পুতুল বাবু

আবদুল্লাহ জাহিদ

আশিক মনে মনে একটা রোমান্টিক ছবি সাজিয়ে রেখেছিল, প্রথম রাতে নতুন বউকে কি বলবে। জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরুটা কেমন হবে। সারা দিন আশিকের ওপর দিয়ে এতো ধকল গেছে যে, ক্লান্তিতে ওর দুই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কতোকাল যেন ঘুমায়নি। যুথি বাথরুমে এতো সময় নিচ্ছে কেন?

হালকা আকাশি রঙের পাতলা ফিনফিনে চমৎকার একটা নাইটি পরে যুথি এলো। এ পোশাক যে কোনো যুবকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে যথেষ্ট। আশিক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওকে দেখতে লাগলো। যুথি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়িয়ে চুল ব্রাশ করছে। উল্টোদিক থেকে লাইটের আলো এসে পড়ছে যুথির গায়ে, নাইটির ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে পুরো শরীর। ফর্শা গায়ের রঙ, সুডোল দুই স্তন। আশিকের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। জীবনের প্রথম কোনো নারীকে এতো কাছ থেকে দেখা। সারা জীবন সে যতো কবিতা পড়েছে, গল্পের যতো নায়িকা, যতো ছবি বা স্থাপত্য নারী মূর্তি দেখেছে মুহূর্তে তার সবকিছু যেন পরাজিত হলো। মানুষের শরীর এতো আকর্ষণীয় হতে পারে! আশিক ঠিক কেমন করে এগোবে যখন ভাবছে তখন যুথিই প্রথম মুখ খুললো।

আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই– বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে বললো, আমি কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করে বাচ্চা নেবো না।

যুথির এখন অনার্স ফাইনাল ইয়ার। এরপর এমএ করবে, সব মিলিয়ে কমপক্ষে তিন বছর। আশিক এসব নিয়ে কোনো চিন্তাই করেনি। সুতরাং অবজেকশন দেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমার কোনো আপত্তি নেই। এখন আসো বলেই যুথির হাত ধরে একটানে নিজের কাছে নিয়ে এলো।

হঠাৎ কোনো ভূমিকা ছাড়া আশিকের এ রকম ব্যবহারে যুথি হকচকিয়ে গেল। নিজেকে আশিকের হাত থেকে ছাড়ানোর মৃদু চেষ্টা করলো। আশিক যুথিকে সে সুযোগ দিল না। ওর দুই বাহুর মাঝখানে বন্দি যুথি। আশিক পাগলের মতো যুথিকে আদর করতে লাগলো। ব্যস্ত হয়ে উঠলো আশিকের হাতের আঙুল। যুথির ঠোটে ধীরে ধীরে নেমে এলো আশিকের ঠোট। এক সময় আশিকের গায়ের উত্তাপে যুথি গলতে লাগলো মোমের মতো। ওরা হারিয়ে গেল পৃথিবীর আদিম মানব ও মানবীর মতো।

দেখতে দেখতে বিয়ের প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল। যদিও বিয়ের পরই যুথি শর্ত দিয়েছিল, পড়াশোনা শেষ না করে বাচ্চা নেবে না– আশিক তা মানতে পারলো না। বাচ্চা নেয়ার জন্য যুথিকে চাপ দিতে লাগলো। হাজারটা যুক্তি দেখাতে লাগলো। যুথিও অটল। তার এক কথা, এমএ পাস না করে সে কিছুতেই বাচ্চা নেবে না। আশিক মুক্ত মনের হলেও অন্যান্য পুরুষের মতোই সামন্তবাদী। যুথি শেষ পর্যন্ত আশিকের ইচ্ছার কাছে হার মানলো। অনার্স পরীক্ষা শেষ করার কিছুদিনের মধ্যেই সে প্রেগনান্ট হয়ে পড়লো।

প্রথম প্রেগনান্সির সময় মেয়েদের নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়। যুথির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। যুথির মা ওকে ময়মনসিংহ নিয়ে গেলেন। প্রথম তিন মাস ও কিছুই খেতে পারছিল না। স্বভাবসুলভ চঞ্চলা যুথি কেমন যেন ধীরস্থির হয়ে গেল। চপলতাহীন যুথিকে আশিকের অন্য মানুষ মনে হয়। কাজটা ঠিক হয়নি, যা হয়েছে হয়েছে এসব বলে যুথির কাছে নিজেকে সহজ করতে চায় আশিক।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাচ্চা হওয়ার তারিখ। যুথির দেহে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়। সব ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ যুথির খুব জ্বর হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজ হসপিটালে নেয়া হলো। অন-ডিউটি ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, বাচ্চাকে বাচাতে হলে এখনই সিজারিয়ান করতে হবে। রাত প্রায় দুইটার দিকে অপারেশন করে একটা মেয়ে হলো; কিন্তু বাচ্চাটাকে বাচানো গেল না।

দুদিন পর যুথিকে বাসায় নিয়ে আসা হলো। এ এক অন্য যুথি। বাচ্চাটা মারা যাওয়ায় ও প্রচ- শক পেয়েছে। ওর স্বভাব একেবারে বদলে গেল। প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না। ওর চুপচাপ হয়ে যাওয়াটা সবাইকে উদ্বিগ্ন করলো। কোনো বাসায় ছোট বাচ্চা আছে জানলে সে ওখানে যায় না। কারো কোলে ছোট বাচ্চা সহ্য করতে পারে না। এমনকি টিভি নাটকে বাচ্চার কোনো দৃশ্য থাকলে অন্য ঘরে চলে যায়।

আশিক খুব ধীরে ঘীরে যুথিকে আবার আগের মতো সজীব করতে যতো রকম চেষ্টা সব করলো। নিজের দোষ স্বীকার করে হাজারবার যুথির কাছে মাফ চাইলো। ধীরে ধীরে সময় পার হলো। সময় সব ক্ষত শুকিয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় সব যন্ত্রণা। প্রায় এক বছর পর যুথি কিছুটা স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলো। অনেক চেষ্টার পর আশিক যুথিকে কক্সবাজার বেড়ানোর জন্য রাজি করাতে পারলো।

ওরা উঠলো সমুদ্রের সবচেয়ে কাছের একটি হোটেলে। রুম থেকে সমুদ্র দেখা যায়। ওরা যখন কক্সবাজার গেল তখন সিজন ছিল না, তাই ভিড় ছিল খুব কম। দুজনে সাগর জলে গা ভেজালো, স্পিড বোটে করে চকরিয়া গেল, পাহাড়ের চূড়ায় শিবমন্দিরে উঠলো। জিপ ভাড়া করে গেল টেকনাফ। ধীরে ধীরে যুথির মধ্যে পরিবর্তন আসছে। যুথি সমুদ্র তীরে হাটতে হাটতে লাল কাকড়া ধরতে ছুটতে লাগলো। ছোট মেয়েদের কাছ থেকে ঝিনুকের মালা কিনতে লাগলো। এক দিন দুপুরে ওরা পাহাড় বেয়ে হাটতে হাটতে একটা প্রাইমারি স্কুলের সামনে গাছের ছায়ায় বসলো। ঠিক সে সময় স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজলো। বাচ্চারা দলে দলে দৌড়ে বের হতে লাগলো। কোনো কোনো বাচ্চা ওদের ধাক্কা দিয়ে গায়ের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগলো। একটা অদ্ভুত সুন্দর ছোট মেয়ে একেবারে যুথির গায়ে এসে পড়লো। যুথি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলো। আশিক অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখলো। অনেক দিন এমন দৃশ্য আশিক দেখেনি। যুথি একটা বাচ্চাকে আদর করছে। অনেক দিন পর যুথি সত্যিই স্বাভাবিক আচরণ করলো।

অনেক হাটাহাটিতে দুজনই খুব ক্লান্ত। হোটেলে এসেই দুজনে বিছানায় এলিয়ে পড়লো। আশিক সাহস করে যুথিকে আদর করতে ওর গালে হাত রাখলো। যুথি আপত্তি করলো না। আশিক একটু এগিয়ে যুথির বুকের কাছে সরে এলো। যুথির গরম নিঃশ্বাস ওর বুকের লোমগুলো কাপিয়ে দিল। এই সিগনালের মানে আশিক জানে। আশিক আর ভুল করবে না। ও চট করে ব্যাগ থেকে 'সেনসেশন'-এর প্যাকেটটা নিতে দাড়ালো। যুথি পেছন দিক থেকে ওর পাঞ্জাবিটা টেনে ধরলো।

না এসো... লাগবে না... এমনি এসো।

যুথি আশিকের কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশ করে বললো, সেবার আমি চাইনি তাই এ রকম হলো...।

এখন আমি চাই... ছোট পুতুলের মতো একটা বাবু।

আশিক নিমিষেই যুথিকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরলো। ওর বুকের উত্তাপে যুথি আবারো মোমের মতো গলে যেতে লাগলো।

নিউ ইয়র্ক থেকে
ashathi@aol.com

চার ও অন্যান্য

রেদোয়ান

ভালোবাসা দিবসে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সবচেয়ে প্রিয় চারজনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তারা হলেন– আমার মা, বিজয়, ফারুক ও দীপু। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছোটবোন, বাবা ও

যায়যায়দিন পরিবারের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

চট্টগ্রাম

সারপ্রাইজ

আরিফ হাসান

চাদের আলোতে ভেসে যাচ্ছিল দশদিক। ভেসে যাচ্ছিল মিউনিসিপালিটি ভবন, রাস্তাঘাট-ফুটপাথ, পুরনো কানাগলি-তস্যগলি, সাইকি-আরিয়ানাদের বাসা। হয়তো ভেসে যাচ্ছিল জোবায়দাদের রাজিয়া হস্টেল ও তার ৪০৭ অথবা ৪২০ (ফোর টোয়েন্টি) নাম্বার রুম। আর তাদের টাঙাইল অথবা মানিকগঞ্জের বাসা।

এতো ভেসে যাওয়ার মধ্যে স্থির থাকি কি করে! সঙ্গে ভেসে যাচ্ছিলাম আমিও এবং আমার গ্রাম

সোনারুয়া। হয়তো ভেসে যাচ্ছিল ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, যার নাম সে আমাকে বলবে বলেও বলতে পারেনি কিংবা হয়তো বলতে চায়নি এবং দীনা ফারাবি ও তানিয়া নেফারতিতিসহ অনেকের দেহ ও মন।

এমন চাদনি রাতে আকাশের প্রায় কাছাকাছি চলে যাওয়া যায়। সঙ্গে যদি মৃদুমন্দ হাওয়ার তোড় একটু বেশি হয়, তাহলে তো কথাই নেই, মনে হয়– রকেট হয়ে আকাশ ভেদ করে কল্পনার বাইরে চলে যাই!

চতুর্দিকে ভেসে যাওয়া প্রতিযোগিতার এ ভিড়ে আমার কি হলো এ ব্যাপারে সে একটা খবরও নিল না। তাই যারপরনাই ব্যথিত হয়ে এ মুহূর্ত থেকে তার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার মনস্থির করার সময় ও ফোন করে। তখন আমি বিস্রস্ত পর্যায়ে। সে বলতে থাকে, আমি চরমতম হয়ে গেছি ইত্যাদি...।

ওর এতোটা মারমুখী কথার অর্থ হঠাৎ বুঝে উঠতে পারি না।

...এক দিন ফোন না করলেই এ অবস্থা! পরের কথাগুলোতে তার উত্তেজনা মিইয়ে আসে এবং সে শ্লেষযুক্ত ও সংলগ্ন হয়।

...আজ শরতের এ ভরা পূর্ণিমায় তোমার ফোনটা এতো করে চাচ্ছিলাম...!

ওর মুখে আজ এসব কথা শুনে মনে হয়– এতোদিনে ওর মধ্যে ব্যক্তিত্বের কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়েছে। কারণ যে এক সময় আমাকে বলতো– এই যে তুমি প্রতিদিন আমাকে ফোন করো, এমনকি দিনে কয়েকবার, প্রায় প্রতিদিনই দেখা করতে চাও, স্পর্শ চাও– এতে তোমার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয়। তোমার উচিত– আমার মনটা তুমুল চাইবে, ব্যাপক আকুলি-বিকুলি করবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে, দেখা করতে...। কিন্তু তবুও তুমি ফোন করবে না, দেখা করবে না, করবে না ...তারপর হঠাৎ এক দিন। তখন তোমাকে আমি অনঙ্গ দেহের স্পর্শ দেবো, ব্যাপক জড়িয়ে ধরবো– অনুভূতিতে, শরীরে।

তখন তাকে বলতাম, এ তো তোমার সৌভাগ্য যে, কেউ একজন সারাক্ষণ তোমার চিন্তায় বিভোর থাকে ভালোবাসাহীনতার এই দিনে।

বোধ করি এ কথা বলাতে, বলা যায় কিছুটা কাতর হয়েই সে আমাকে বলে, আমি অঙ্গে-অনঙ্গে তোমার পাশেই থাকি সারাক্ষণ, তারপরও কেন তোমার ভেতরে রাজ্যির এই হলোনেস? এই শূন্য-শূন্য শূন্যতা? এই কাতরতা? পেলাম না-পেলাম না ধাচের বেদনা? কতো চাই তোমার ...?

কথাগুলো বলতে বলতে এক পর্যায়ে হয়তো সে বিপন্ন বোধ করে। আমি তখন করতলে পাখির পালক অথবা শরতের কাশফুল অনুভব করি।

আকৈশোর এবং পরবর্তীকালেও আমি হয়তো এ-ই চাইতাম– কেউ একজন সারাক্ষণ আমাকে জ্বালাতন করবে। যার যন্ত্রণায় আমার সব রুটিন-কাজ ব্যাহত হবে। যার কাছ থেকে আমি বিযুক্ত হতে পারবো না সামান্য সময়ের দূরত্বে। যার ভালোবাসায় আমার অপূর্ণ-অসম্পন্নতা পূর্ণতা পাবে। যার স্পর্শ-সান্নিধ্যে আমার সব হলোনেস দূরীভূত হবে।

লক্ষ্য করেছি, শিমু অর্থাৎ যাকে আমি মাঝে মধ্যে ললিটা বলে ডাকতাম বা আরো কিছু, সে আমার অনুভব-অনুভূতির অ্যানাটমিটা ভালোই বুঝে গেছে। ওর যন্ত্রণায় আজ আমি যেমন টালমাটাল, তেমনি টইটম্বুর ভালোবাসায়ও ঋদ্ধ। আমার অন্তর্লোকের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা আজ সাবলীল ও গভীর।

তার কথা মতো, যেহেতু সে একজন প্রফেসরের মেয়ে তাই আমি ধরেই নিই, সে-ও তার উচ্চশিক্ষিত বাবার সুযোগ্য মেয়ে। আদতেও সে তা-ই। কোনো কোনো ব্যাপারে সে যথেষ্টই শিক্ষিত ও স্মার্ট এবং সহজেই অনেক কিছু বুঝে উঠতে সক্ষম। এমনো কেউ কেউ শুনে থাকবে, যে বয়সে সাধারণত মেয়েরা প্রথম প্রেমে পড়ে, তখন তাকে ভালো না বাসলেও সে নাকি এক ইউনিভার্সিটি টিচারের প্রেমে পড়েছিল এবং সেটা হয়েছিল তার মা-বাবার ইচ্ছাতেই। সুতরাং আমি জেনে গিয়েছিলাম– আর যা-ই হোক, তার রুচিবোধ ও স্ট্যাটাসটা অন্তত নিচু নয়।

আমরা গল্প আড্ডায় কখনোই বাস্তবতা বর্জিত গল্প করিনি। কারণ আমরা প্রজন্ম একবিংশ শতাব্দীর। ...এক দিন তাকে আমার চাক্ষুষ করা একটি গল্প শোনানোর প্রয়াস পাই। একজোড়া শালিক অথবা পাখি কিংবা পাখির মতো একজোড়া প্রাণী ঝগড়া করার নিমিত্তে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, অথবা অন্যকিছু। দূর থেকে দেখে যে কারো কাছে মনে হওয়ার কথা– ওই শালিক জোড়া অথবা পাখির মতো প্রাণীজোড়া মূলত মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অথবা এমনো হতে পারে, আদৌ তারা ঝগড়া-ঝাটি কিংবা মারামারি কোনোটাই করতে যাচ্ছিল না, তারা আদর আর সোহাগ জড়ানো এক ধরনের ক্রিয়ায় মত্ত হতে যাচ্ছিল...।

এ গল্পের বাস্তবতা বুঝে গেলে গল্পটা সে আমাকে আর শেষ করতে দেয় না। যেহেতু শালিক অথবা পাখি কিংবা ওই রকম কোনো প্রাণীতে সমলিঙ্গে জোড়া হয় না এবং যেহেতু আমার গল্পে প্রায়ই জোড়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এ রকম কিছু কারণে ও হয়তো গল্পের অন্ত্যজ বিষয়টি বুঝে ফেলতে সক্ষম হয়।

সে বরং আমাকে নাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়ানোর পাশাপাশি এ পর্যন্ত সঞ্চিত তার প্রজাপতি ওড়ানোর

সামর্থ্যের গল্প শোনাতে চায়। আমি তখন এ ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে প্রজাপতি ওড়ানোর একটা সাদৃশ্য খুজে ফিরি।

এখানে তার ইঙ্গিতপূর্ণ কথা থেকে বোঝা যায়, এতোক্ষণে তার দেহে প্রাণ ও রসের সঞ্চার হয়েছে। অন্তত এই ভেবে আমার স্ফূর্তি না হয়ে পারে না। কথার ধরনে বুঝতে পারি, তার ভেতরকার স্ফূর্তিটা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং এক ফাকে আমাকে সে প্রস্তাব করে বসে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর তার জন্মদিনে সে আমাকে বিশেষ সারপ্রাইজ দিতে চায়।

এ প্রস্তাবের পর থেকে তার কাছ থেকে সারপ্রাইজড হতে আমার ভেতরে কেবলই আইঢাই বা আউস-বাউস করতে থাকে। যাকে এক ধরনের লোভ বা লালসাও বলা যেতে পারে।

আমি সারপ্রাইজড হতে অপেক্ষা করতে থাকি। সে তখন মৃগনাভির প্রতি তার চিরকালীন দুর্বলতা ও আগ্রহের কথা বলতে বলতে আমার নাভিতে চুম্বন প্রলম্বিত করতে থাকে।

তার এ রকম আচরণে আমি রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং এর উত্তর খোজার নিমিত্তে একটি-দুটি করে পাতা কিংবা পরত উল্টিয়ে চলি আর অপেক্ষা করতে থাকি সারপ্রাইজড হতে...।

কাপাসিয়া, গাজীপুর থেকে

আত্মকাহিনী

এম মহীদুল ইসলাম

পৃথিবীতে আদিম মানুষ আদম-হাওয়া থেকে আমার জন্ম। আমার জন্যই দুটো নর-নারীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেদিন। আমি না থাকলে পৃথিবীটা আজ পূর্ণাঙ্গতা পেতো না। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ বোঝা যেতো না ভালোবাসা না থাকলে। আদম-হাওয়া থেকে জন্ম নিয়ে সেই যে আমার পথ চলা, আজো তার শেষ নেই।

আমার নিজস্ব কোনো রূপ, গন্ধ, বর্ণ, আকার কিছুই নেই। অথচ তোমরা কতোভাবেই না আমাকে ভাগ করেছো। যেমন : আধ্যাত্মিক, রোমান্টিক, পরকীয়া, মর্সিয়া, প্রাকৃতিক, গ্রাম্য, শহুরে ইত্যাদি। অবশ্য আমি এতে তোমাদের কিছুই বলিনি। যে নামেই আমাকে ডাকা হোক না কেন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। এভাবে অভিহিত করে তোমরা যদি আত্মতৃপ্তি পাও তাতেই আমার শান্তি।

আমাকে নিয়ে তোমরা গান, কবিতা, নাটক, সিনেমা কতো কী যে বানিয়েছো। সেখানে নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলো। সেজন্য আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু দুঃখ পাই তখন যখন দেখি আমার জন্য কেউ কাদে। আমার কারণে কারো চোখে জল এলে আমার অন্তরে খুব আঘাত লাগে। প্রেম-ভালোবাসায় কেউ ব্যর্থ হলে তোমরা তাকে ছ্যাকা খাওয়া বলো। আবার মিলে গেলে বলো কমেডি, মণিকাঞ্চনযোগ। আমার তখনি দুঃখ হয় যখন বিনা কারণে তোমরা মানুষ মেরে ফেলো। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে রোহিনীকে বন্দুকের গুলিতে মেরে কাজটা ভালো করেননি। সে গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রেম করে দোষের কিছু করেনি। সমাজের বিধবার প্রেম বলে কিছু নেই– এ ধোয়া তুলে তাকে বন্দুকের গুলিতে মেরে ফেলেছিলেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিম। রোহিনীকে মারা মানে আমাকে অবজ্ঞা করা নয় কি?

শরৎচন্দ্র সমাজের বিধবা ও অন্ত্যজ শ্রেণীসহ নিগৃহীত, বঞ্চিত নারীর মধ্যে যে প্রেমের মুকুল ফুটিয়েছিলেন বাস্তবে তার ফুল ফোটেনি। বিধবার একটা প্রেমকেও স্বীকৃতি দিতে পারেননি। সমাজপতিদের ভয়ে তার গল্পে প্রেমের প্রতিটি চরিত্রই চলন্ত পথে হোচট খেয়েছে। তোমরা বলেছো গরিবের আবার প্রেম কিসের? তাই শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী, দেবদাসের পার্বতী, বড় দিদির মাধবী, গৃহদাহের অচলা প্রভৃতি উপন্যাসের নায়িকার অন্তরে কেবল আমি ডুকরে কেঁদেছি। গৃহদাহ উপন্যাসে অচলার দ্বৈত প্রেমের স্বীকৃতি তোমরা দাওনি। সেটাকে তোমরা বলেছো অপবিত্র। অথচ আমি পবিত্র, আমার আগমন স্বর্গ থেকে এটা তো তোমরা জানো। অচলা সুরেশকে ভালোবেসেছিল, এটা অপরাধ ভেবে তার স্বামী মহিম একদিন অচলাকে বলেছিল তার শেষ জায়গা পতিতালয়ে (সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না এমন ইঙ্গিত করেছিল অর্থাৎ তোমরা আমাকে পতিতালয়ে স্থান দিলে)।

রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি উপন্যাসে বিনোদিনীর মধ্যে এক স্বর্গীয় প্রেমের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, এতে আরো খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু বিনোদিনী ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাননি। তিনি ভালোবেসে বিহারিলালকে স্বামী হিসেবে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে এমন আদর্শরূপে উপস্থাপন করলেন যাতে তিনি অতি মানবী হয়ে উঠলেন এবং নিজেকে আর্তি করতে করতে ধর্মীয় আবরণে নিজেকে আবৃত করলেন ফলে বিহারীলালের সঙ্গে প্রেমের দূরত্ব এক সময় গেল বেড়ে, তার কাছে তখন প্রেম অর্থাৎ আমি হয়ে গেলাম গৌন আর ধর্ম হলো মুখ্য। ধর্মের কাছে হলাম পরাজিত। এভাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে হলাম অবহেলিত।

তোমরা নিজ স্বার্থে আমাকে ব্যবহার করো এটা ঠিক নয়। এই যে ধরো তোমরা দেশপ্রেমের কথা বলে থাকো। দেশকে যদি ভালোবাসো তাহলে কেন এতো হানাহানি, কাটাকাটি করো বাবা। হরতাল-মিছিল-মিটিং-অবরোধ দিয়ে দেশকে অচল করে জনজীবনকে করো বিপন্ন। আমাকে মূল্য না দিলে তোমরা ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে– সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হবে।

স্বর্গে আমার জন্ম হলেও মর্ত্যের যায়যায়দিনের সম্পাদক শফিক রেহমানের হাত ধরে এ দেশে আমি প্রথম যেদিন এসেছিলাম, সেদিনই আমার পুনর্জন্ম হলো । ভ্যালেনটাইন অন্ধ কুটির থেকে তার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে একটি ফুল উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন । এটা আসলে ফুল ছিল না, ছিল ভালোবাসার উপহার । সেই উপহারকে ভালোবাসার উদাহরণ হিসেবে অমর করে রাখার জন্য সবার জন্য ভালোবাসা যায়যায়দিনের সম্পাদক এ আহ্বানে আমাকে নতুন করে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন । আমি ছোট-বড়, ধনী-গরিব, বিধবা-সধবা, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-ক্রিশ্চিয়ান সবার মধ্যে লীন হয়ে যেতে পেরেছি নতুনভাবে অন্তত একটি দিন আর সেটি হলো ১৪ ফেব্রুয়ারি । ওই দিনকে ভালোবাসা দিবস খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে, এতে আমার স্বীকৃতি মিলেছে । মিলেছে আত্মমর্যাদা ।

পৃথিবীর মানুষ– তোমাদের কাছে এই একটি দিনের জন্য আমি ঋণী, আমি কৃতজ্ঞ, আমি ধন্য । ধন্যবাদ ভ্যালেনটাইন ও তার প্রিয়তমাকে ।

মানিকনগর, ঢাকা থেকে

মিস্টার ফিফটি

সাইফুল ইসলাম

আমাদের বন্ধু মহলে মিস্টার ফিফটি বয় নামে পরিচিত করিম, যা তার ছদ্মনাম । ওর সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে । বাবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মা এক সময় আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড পর্যায়ের সভানেত্রী ছিলেন । বাড়ি বিক্রি করে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন । অহঙ্কারী সুন্দরী মেয়েকে তার পছন্দেই বিয়ে দিয়েছেন । মা অনেক সময় গর্ব করেই বলেন, মেয়ে একবার যে কাপড় পরে পরবর্তী সময়ে তা আর পরে না । মেয়ের খরচ যোগাড় করতে স্বামীকে হিমশিম খেতে হয় ।

এবার আসা যাক আমাদের আসল মি. ফিফটি বয় করিমের কথায় । বিভিন্ন কলেজ, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে ঠিকই; কিন্তু কোনোটাই ঠিকমতো শেষ করতে পারেনি । তার একটা দুর্বলতা ছিল, সে সহজেই যে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতো । চেহারা আহামরি কিছু না হলেও অন্যান্য দিক থেকে পরিপূর্ণ থাকায় অর্থাৎ অ্যাপার্টমেন্ট, গাড়ি, কাচা টাকা এবং দামি মোবাইল ইত্যাদি কোনো কিছুর অভাব না থাকায় মেয়েরা সহজেই তার কাছে পটে যেতো । মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক করা অনেকটা তার কাছে নেশার মতো । সম্পর্কটা শুধু স্বাভাবিক হলে চলতো, তবে তা প্রায়ই অনেকের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয়ে যায় । অর্থাৎ একে একে প্রায় শখানেক মেয়ের সঙ্গে তার রিলেশন হয়েছে । আর কোনো রকম হালকা বা মাঝারি ধরনের সেক্স হয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের সঙ্গে । যার কারণে আমরা তাকে মি. ফিফটি বলে ডাকি । তবে সে এটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করে ।

কোনো মেয়েকে ভালো লাগলে দু-এক দিন কথা বলেই সরাসরি প্রপোজ করে সে এবং মেয়ে তাতে রাজি হয়ে যায়। যদি কখনো বিয়ের কথা আসে তখন বাবা-মায়ের কথা বলে তা উড়িয়ে দেয়। নিজের ফ্ল্যাট খালি থাকলে সেখানে প্রায়ই তার বান্ধবীদের নিয়ে আসে। আবার কখনো দামি হোটেলে গিয়ে রাতে তার বান্ধবীর সঙ্গে থাকে। কখনোবা গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে দূরে চলে যায়।

আমাদের সমাজে এমন অনেক করিম আছে যারা প্রায়ই বিভিন্নভাবে একই সময়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় ও তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। কোনো সম্পর্ক তৈরি করার আগে আমরা অনেকেই আগে-পিছে বা বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা করি না। যার কারণেই আমাদের মধ্যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে যেমনি বাবা-মাকে সন্তানের প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত, তেমনি প্রত্যেকটা মানুষকে বুঝে-চিনে তার সঙ্গে সম্পর্ক করা উচিত।

পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা থেকে

নতুন আলো

রবিউল হাসান রবি

মায়ের মৃত্যুর খবর শুনেছিল জেলে থাকতেই। ছোট বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে।

রেণুর সঙ্গে সর্বশেষ দেখা চার বছর আগে জেল গেটে। ও বিয়ের খবর জানাতে এসেছিল। সেদিন খুব কেঁদেছিল রেণু। ওর শেষ কথা ছিল– তুমি বোধহয় আমাকে আর পাচ্ছো না। বাবা সরাসরি বলে দিয়েছেন জেল খাটা আসামির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

অথচ এক সময় রফিককে কতো উৎসাহই না দিতো রেণুর বাবা– তোমার মতো ছেলেরা দেশের সম্পদ। এ দেশে আজ তোমাদের খুব প্রয়োজন– এ ধরনের হাজারো কথা। কিন্তু যখন ওকে পুলিশ ধরলো, ওরা আটজন ছিল। পুলিশের ওসি হয়েও রেণুর বাবা ওদের জন্য কিছুই করেনি।

রফিকের বিষয়ে সুপারিশ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। অন্য সাতজন টাকা-পয়সা এদিক-সেদিক করে বছরের মাথায় ছাড়া পেলেও রফিক ছাড়া পায়নি। ওর মায়ের মৃত্যুর খবরেও প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়নি।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই ছিল রফিকের কাল । সারা দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব ওর হাতে ছিল । ১৪৪ ধারা জারির পর অনেকে গা ঢাকা দিলেও রফিক তা করেনি । ওর কথা ছিল– আন্দোলনে নেমেছি বীর বেশে, চোর সেজে পালাতে নয় । শেষ পর্যন্ত অস্ত্র মামলায় পাচ বছরের জেল হয় ওর । অথচ সে কোনোদিন অস্ত্র স্পর্শও করেনি ।

ওর পরিচিতজনরা খুব একটা দেখা করতে আসেনি । ছোট বোনটিও শেষবার এসেছিল দুই বছর আগে । জেলে এসে রফিকের সঙ্গে দেখা করতে স্বামীর বারণ আছে । চিঠিতে সব কিছু জানাতো বুড়ি । ছোট বোনকে রফিক আদর করে বুড়ি বলে ডাকতো ।

পাচ বছরের শাস্তি হলেও রাষ্ট্রীয় করুণায় (!) ছয় মাস আগেই মুক্তি পেল রফিক । জেল গেট থেকে বের হয়ে খোলা আকাশ দেখলো । জেলের মধ্যে থেকেও আকাশ দেখেছিল রফিক, কিন্তু তা ছিল ওর কাছে বন্দি আকাশ । এমন যদি হতো, রেণু ফুলের মালা নিয়ে দাড়িয়ে আছে । কিন্তু তা সম্ভব নয়, শুধু ভাবনায় আওড়ানো । তবে মায়ের জন্য রফিকের মনটা বেশ খারাপ । মারা যাওয়ার এক মাস আগে যখন দেখতে এসেছিল, খুব কেদেছিল । যাওয়ার সময় শুধু বলেছিল– ভালো থাকিস বাবা ।

কিন্তু রফিক ভালো নেই । ওর খোচা খোচা দাড়িগুলো ভালো নেই, ভালো নেই সেই চুলগুলো যে চুলে রেণুর ঠোটের স্পর্শ লেগে আছে । ভালো নেই মিছিলে উদ্যত হাত দুটো, যে হাতে রফিক কবিতা লিখতো ।

জেল থেকে বের হওয়ার পর দুজনার সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছা হলো রফিকের । রেণু আর ছোট বোনের সঙ্গে । ছোট বোনের ঠিকানা জানা আছে, চিঠিতে লেখা । কিন্তু রেণুর কোনো ঠিকানা জানা নেই । তাই জেল থেকে পাওয়া এক হাজার তিনশ পঞ্চাশ টাকা পকেটে নিয়ে গায়ে রেণুর দেয়া গেরুয়া চাদর জড়িয়ে রফিক হাটতে লাগলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ।

একটা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের সামনে ভিড় দেখে থামলো রফিক । স্কুল কেবল ছুটি হয়েছে । অভিভাবকরা ব্যস্ত সন্তানদের তুলে নিতে । তাদের চেয়েও ব্যস্ত রিকশাওয়ালারা । শহরে স্কুল-কলেজ ছুটি হলে রাস্তার ব্যস্ততা বেড়ে যায় । অনেকদিন পর ব্যস্ত শহর দেখছে রফিক ।

ধীরে ধীরে ভিড় কমে গেল । পাশের দোকান থেকে সিগারেট ধরালো রফিক । এ অভ্যাসটা রেণু পছন্দ করতো না । সিগারেট ছাড়ছো কবে– জানতে চাইলেই রফিক বলতো বিয়ের পর । মাঝে মাঝে এসব কথা মনে পড়লে রফিক হেসে ওঠে, বিদ্রূপের সুরে ।

দূর থেকে এক ভদ্রমহিলা রিকশা ডাকছে । শব্দ শুনে সেদিকে তাকাতেই রফিকের বুকটা ছলাৎ করে উঠলো । রফিক আরো কাছে এগিয়ে গেল । পেছন থেকে সতর্কতার সঙ্গে আস্তে করে ডাকলো রেণু । রেণু চমকে

উঠলো । অপ্রস্তুত পরিবেশে ওর বিশ্বাসই হলো না । দুজনার কারো মুখে কোনো কথা নেই ।

টেবিলে মুখোমুখি রফিক আর রেণু । রফিকের খাওয়া খুব তৃপ্তি নিয়ে দেখছে । ইউনিভার্সিটিতে প্রায়ই বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসতো রেণু । মুগ্ধ হয়ে দেখতো রফিকের খাওয়া । রেণুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসলো রফিক । খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলো, স্কুলের সামনে কি করছিলে? বাচ্চা নিতে এসেছিলে বুঝি?

রেণু ঠোট বাকিয়ে হাসলো । আমি ওখানে পড়াই ।

ও আচ্ছা । তোমার স্বামী-সংসার, মা-বাবা কেমন আছেন?

বাবা নেই । দুই বছর আগে মারা গেছেন । বাবা মারা যাওয়ার আগে প্রায়ই তোমার কথা বলতেন । আর স্বামী-সংসার বলেই শব্দ করে হেসে উঠলো রেণু ।

হাসছো যে ।

স্বামী-সংসার নেই ।

মানে! রফিক আৎকে উঠলো ।

রেণু হাসতে হাসতে বললো, নেই মানে বিয়েটা হয়নি । বিয়ের দিন ছেলের মামা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা তুলে বিয়েটা ভেঙে দেন । তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা, মায়ের দায়িত্ব নিয়ে তাদের সঙ্গেই সংসার পেতেছি ।

রফিক রেণুর কথা শুনতে শুনতে ঘোরের মধ্যে থাকলো কিছুক্ষণ । রেণুর ডাকে সম্বিত ফিরে পেল । রেণু তখনো হাসছে । তবে রেণুর ভেজা চোখ দুটো রফিকের নজর এড়ালো না ।

ততোক্ষণে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত । রাস্তায় নিয়ন আলোর ঝলকানি থেমে গেছে লোডশেডিংয়ের গাঢ় চুম্বনে । তবুও অন্ধকার তাড়িয়ে চাদের নগ্ন জোছনা সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে । পূর্ণিমায় ভিজে ভিজে রফিক-রেণু হাটছে পাশাপাশি ।

ঠিক যেমনটি ইউনিভার্সিটির পথ ধরে হাটতো... নতুন আলোর সম্ভাবনায়।

খুলনা থেকে

চাই, চাই

ঊর্মি ইসলাম

আমি একটা কথা মনে করি– ফোন থাকলে ফ্যানের অভাব হয় না। অর্থাৎ ভালোবাসার মানুষের অভাব হয় না। ভরসা কি, যে একজন বলছে ভালোবাসি, সে যে আরো দশজনকে এ কথা বলেনি। ভালোবাসা এতো সস্তা হতে পারে না। সারা জীবন ধরে ভালোবাসার পরিচয় দিতে হয়। বন্ধন তাজা রাখতে প্রতিটি মুহূর্ত ভরসা যোগাতে হয়। তাকে চোখে (পলকে) হারাতে হয়। তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়। ভালোবাসি বলেছি, তাকে পেয়েছি, এ তো সবে শুরু। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হয় যে, আমি শুধু তোমার। আমার তনু, মন, ধন সব তোমার। ভালোবাসা এমনই হতে পারে। ভালোবাসা ধৈর্য, ভালোবাসা মানে ত্যাগ, ভালোবাসা মানে কষ্ট স্বীকার, ভালোবাসা মানে অসীম সুখ, ভালোবাসা মানে কিশোর কুমারের গান। ভালোবাসা ছাড়া আর আছে কি। ভালোবাসা হলো নিঃশ্বাস এ দেহে, নিঃশ্বাস ছাড়া কেউ বাচে কি... যেভাবেই হোক তাই ভালোবাসা পেতে চাই... তার এতোটুকু কণা আছে গো তোমার কাছে কি... এটাও সত্যি– আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল, আজ আশা নেই, ভালোবাসা নেই। অর্থাৎ আশা রাখুন। ভালোবাসা পাবেনই। সবাই ভালোবাসা চায়। আমরা এ জিনিসটা সহজেই অন্য ব্যক্তিকে দিতে পারি।

ভালোবাসা আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। শুধু দেখার চোখ থাকতে হয়। বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, প্রতিবেশী সবার প্রতি ভালোবাসা। সবার ভালোবাসা কামনায়।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি

shanteerdheu@yahoo.com

প্রথম ছোয়া

বিভা

একদিন গৌতম আমাকে জানালো অফিসের একটি কাজে আমি তোমাদের শহরে আসছি। একরাত ওখানে থাকতে হবে।

আমি বললাম, আমাদের ভুবনে তোমাকে স্বাগতম।

গৌতম বললো, অফিসের কাজ শেষে তোমাদের শহরটা একটু ঘুরে দেখবো, দেখাবে না।

আমি বললাম, দেখাবো না মানে আমাদের বাসায়ইতো তোমাকে থাকতে হবে।

গৌতম বললো, না তা হয় না।

আমি বললাম, কেন আমার জামাইবাবুর অতিথি তুমি সে হিসেবে আমাদেরও অতিথি। আর কোনো কথা নয়, ওই দিন সোজা আমাদের বাসায় এসে উঠবে ব্যস।

গৌতম বাধ্য হলো আমার কথা রাখতে, যথারীতি অফিসের কাজ উপলক্ষে পৌছে গেল আমাদের শহরে। বাসস্ট্যান্ড থেকেই নিয়ে গেলাম ওকে আমাদের বাসায়। হাত-মুখ ধোয়ার পর ডাইনিংয়ে আসতে বললাম। খাবারের আয়োজন দেখে ওর চোখ তো কপালে উঠলো। আমি বললাম, মা-বাবা, ভাই কেউই বাসায় নেই। জরুরি একটা কাজে আজই সকালে ওরা সবাই বড়দির বাড়িতে গেছেন। আগামীকাল সকালে চলে আসবে।

গৌতম আমার কথা শেষ না হতেই বললো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

আমি বললাম না, খাবার না চাইতেই খাবার দিয়েছি।

গৌতম বললো, আরো একটা খাবার আমার জন্য অপেক্ষা করছে একটু পরেই।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও আমাকে বললো, এক্ষুনি তোমাকে বুঝতে হবে না। সময় হলেই টের পাবে।

আমি বললাম আচ্ছা বাবা ঠিক আছে ।

গৌতম বললো, আমি তোমার বাবা নই, আমি তোমার গৌতম ।

এভাবে খুনসুটি চলছিল । খাওয়া শেষে গল্পে মশগুল হলাম । বাসায় রয়েছে শুধু আমার এক ভাগ্নে, যাকে আমি আমার ছেলে বলে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেই । আর আছে আমাদের কাজের সাহায্যকারী মিতু । সবাই যার যার ঘরে ঘুমোতে গেল । আমি গৌতমের শোওয়ার ঘর দেখিয়ে দিয়ে মশারি টাঙিয়ে বললাম, লক্ষ্মী ছেলের মতো এবার ঘুমাও, সকালে আবার অফিসের কাজে দৌড়াতে হবে ।

গৌতম বললো, ঘুমাবো বলে তো তোমার কাছে ধরা দেইনি মহারানী । আজ সারা রাত তোমার সঙ্গে খেলবো । খেলা শেষে কে জেতে আর কে হারে দেখবো ।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে খেলতে আমার বয়েই গেছে । তাছাড়া তুমি কেমন খেলোয়াড় তা আমার জানার কোনো আগ্রহই নেই । এই বলে আমি যখন গৌতমের ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলাম তখনই গৌতম পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো । ধরেই একেবারে বিছানায় নিয়ে ফেললো । আমি কোনো কিছু বোঝার আগেই চুমুতে চুমুতে আমার সারা শরীর লাল করে দিল । আমি বললাম আমাকে এ রকম করো না, আমি আর সহ্য করতে পারবো না ।

গৌতম বললো, তোমাকে তো আর সহ্য করতে হবে না । তুমি শুধু বলো এবার আমাকে একা রেখে অন্য ঘরে ঘুমোতে যাবে না আমার বুকের ওপর ঘুমোবে ।

আমি বললাম, ফাও কথা বলো না । তোমার ঘরে থাকলে তুমি আমাকে আস্ত রাখবে? একেবারে শেষ করে ফেলবে ।

গৌতম বললো, তোমাকে শেষ করলে তো আমি নিজেই শেষ হয়ে যাবো । তোমাকে আমি শুধু অনেক আদর আর ভালোবাসা দেবো । যে ভালোবাসা তোমাকে কেউ কোনোদিন দেয়নি ।

আমি বললাম, তোমার যা খুশি তাই করো । এরপর আমি সোজা হয়ে শোওয়ার চেষ্টা করলাম, এখানেও বিপত্তি । কোনো রকমে সোজা হলাম, কিন্তু গৌতম আমাকে আর ঠিক থাকতে দিল না । আমাকে আদরে আদরে নিঃশেষ করে দিয়ে আমার শরীরের সবকিছু খুলে একেবারে নগ্ন করে দিল ।

আমি জানি না কি হলো– শুধু বলতে পারি রাত সাড়ে বারোটা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত গৌতম আমাকে যে সুখ দিল, তা কোনোদিনই পাইনি আর কোনোদিন পাবো বলেও আশা করি না ।

গৌতমই আমার কাছে প্রথম ছোয়া, প্রথম ভালোবাসা, প্রথম ভালোলাগা । জানি না ভবিষ্যতে আমার কি হবে, তবে গৌতমই আমার জীবনের সঙ্গে মিশে থাকবে আমৃত্যু ।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

রিনিদি

আনোয়ার হোসেন পাশা

স্বপ্নের সিড়ি ভাঙতে ভাঙতে আকাশ ছুতে গিয়ে দেখি, না... আমি একটুও উপরে উঠতে পারিনি । পেছনে ঝাউবন, রাই সরিষার ক্ষেত, মাটির মসজিদ, কুড়ি পাড়ার মন্দির, কড়ই গাছ... আমার কৈশোর । আমার কৈশোরে উঠোন ছিল । ছিল খ- মেঘের পালকি ভেসে বেড়ানো দুরন্ত সূর্যোদয় । না এ কথাগুলো আমি কাউকে বলতে পারি না । কেন পারি না? নিজেকে প্রশ্ন করি । উত্তর পাই না । আমার দুই চোখের পাতা খুচরো পয়সার মতো চকচক করে জলে ভিজে ওঠে । এক চিলতে রোদ আর আমার রিনিদি, আমার কৈশোর । রিনিদি, আমাকে চাদের ব্যাকরণ শিখিয়েছিল সেই গোলাপ ফোটা বয়সে । আকাশের তারা দেখিয়ে বলতো, দেখিস অনু আমি এক দিন তোর জীবনে তারা হয়ে জ্বলবো । রিনিদি তারা হতে পেরেছে কি না জানি না । ম-ল বাড়ির কদম গাছটির কথা এখনো ভুলিনি । রিনিদি বলতো, এ গাছতলায় দাড়ানো যাবে না অনু, ভূত আছে, ভূত । রিনিদি আমাকে হারিকেনের মিটিমিটি আলোতে সুর করে কাজলা দিদি পড়াতো–

বাশ বাগানের মাথার উপর চাদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?

রিনিদি আমার চেয়ে দুই বছরের বড় । বর্ষার দিনে তার রঙিন ছাতার তলে আমাকে শামুক কুড়াতে নিতে চাইতো না । এক দিন পাঠশালা থেকে ফেরার পথে রিনিদিকে কড়ই গাছের ডাল দিয়ে মাথায় আঘাত করে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম । মাথা থেকে এতো রক্ত ঝরেছিল, মনে হচ্ছিল সিদুর পরা দুর্গাদেবী । আচ্ছা রিনিদি, সেদিন বাড়ি ফিরে বাবার কাছে নালিশ করলে না কেন । জানিস এতো বিশালতা আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে দেখায়নি । কেউ দেয়নি এক ফোটা শিশির এ পোড়া বুকে ।

আজ ভাঙা ব্রিজের ওপর উদভ্রান্তের মতো দাড়িয়ে থাকি । তোমার কথা ভাবি । পেছনে হু-হু শূন্যতা । কি যেন নেই । কি যেন হারিয়েছি সেই কৈশোরে?

জানিস রিনিদি, তুই মাতাল স্বামীর হাতে পৈশাচিক নির্যাতনে নিহত হওয়ার পর থেকে তোকে আর কেউ মনে রাখেনি। তবে আমি মাঝরাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। আকাশের চোখে জল! তারা ভরা রাতে তারাদের মধ্যে খুজতে থাকি, কোনটা আমার রিনিদি? আমার অবুঝ প্রেম কৈশোরের গহিন গাঙ!

সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা থেকে

অর্থ

ভ্যালেনটাইনস ডে বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে গোলাপ ফুল হলো চিরন্তন সুন্দর এক উপহার। আর ফুলের রানী গোলাপ, তাই প্রিয়জনকে গোলাপ ফুল উপহার দেয়ার আগে জেনে নিন কোন গোলাপের কি অর্থ।

ভালোবাসার ফুল গোলাপ

গোলাপি গোলাপ : ভালো লাগা, সাধুবাদ, ভালোবাসা
লাল গোলাপ : ভালোবাসার, সম্মান
শাদা গোলাপ : নিষ্পাপ, গোপনীয়তা ও শুদ্ধতা
কমলা গোলাপ : আনন্দ, ইচ্ছা, শক্তি
হলুদ গোলাপ : বন্ধুত্বের সন্তুষ্টতা ও স্বাধীনতা
কোরালা গোলাপ : সুন্দর আকর্ষণ
পিচ গোলাপ : সান্ত্বনা ও সমাপ্তি।

মোহাম্মদ আলী
সদরপুর, ফরিপুর

কষ্ট

মাহমুদা খাতুন তামান্না

এখন রাত অনেক। বারোটা পেরিয়ে গেছে। পুরো বাড়িতে মাত্র দুজন মানুষ। অহনা আর রিফাত, রিফাত ড্রইং রুমে। টিভি দেখছে। আর অহনা বেড রুমে নিঃশব্দ কান্নার স্রোতে একাকার করে দিচ্ছে নিজেকে। অথচ রিফাতের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তার স্বাভাবিক আচরণ, চলাফেরা স্পষ্টই বলে দেয় এসবের ধার সে ধারে না। আধঘণ্টা পর রিফাত বেড রুমে আসে। নিয়মিত টুকটাক বিষয়গুলো শেষ করে বিছানায়

শোয়। একটিবারও অহনাকে ডাকে না। পাশে অহনার নিস্প্রভ আচরণ রিফাতকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করছে না।

অহনা চুপ। কোনো কথা নেই। দুজনেই সজাগ। রিফাত বিছানায় আসার পর অহনা কান্নার বেগ কিছুটা থামায়। এভাবে আধঘণ্টা পার হয়। এরই মধ্যে রিফাত ঘুমিয়ে পড়ে। নাক ডাকার বাজে অভ্যাসটা বড় বেশি কানে বাজে। অহনা বিরক্তবোধ করে। পাশ ফিরে শোয়। তখনও অনবরত চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। মিনিট কয়েক পর নিজেকে ঠিক করে সে। শান্ত ও ধীর ভঙ্গিতে বিছানা থেকে নামে। গায়ে শালটা জড়ায়। বেশ ঠা-া লাগছে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। মাস পেরোতে আরো দুদিন। শীতের তীব্রতায় প্রকৃতি জবুথবু। পৌষের উত্তাপহীন দিনগুলো এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো ভাবনার মাঝে ডুবে যায় অহনা। বিছানা থেকে নেমে বার কয়েক রিফাতকে লক্ষ্য করে। নাহ্ ঘুমটা বেশ গাঢ়। নিঃশব্দে স্বামীর সেলফোনে হাত রাখে। দ্রুতই রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

বিশাল ব্যালকনির এক প্রান্তে বেতের সোফার একটাতে বসে সে। রিফাতের সেলফোনটা বন্ধ, আবার লক করা। খুব অবাক হয়। ও তো কখনোই সেলফোন লক রাখে না। সাবধানে ওপেন করে। তারপর একে একে সব কল চেক করে। রিসিভ কল, ডায়াল কল। লাস্ট রিসিভ কলের নামটা দেখে চমকে ওঠে। রিনি, ধানমন্ডি। কে এই রিনি? এ নামে তো রিফাতের কোনো পরিচিত কেউ নেই। এছাড়া ওর অফিসের সব ব্যাপারই তো অহনার জানা। কে কী, কোথায় থাকে। মোটামুটি রিফাতের পরিচিত জগতের সবাইকে অহনা জানে কিন্তু রিনি নামের কারো কথা অহনাকে জানায়নি রিফাত।

আজ ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ। কল লিস্টের সিংহভাগই রিনি নামের মেয়েটির। মোট ছয় বার রিসিভ কলে এ নামটি দেখে ভীষণ মুষড়ে পড়ে অহনা। আবারো কান্না শুরু করে। কাদতেই থাকে। জীবনের সবচেয়ে আপনজন যে মানুষটি সে কিভাবে এতো বড় একটা আঘাত দিতে পারলো তাকে। কিছুতেই মানতে পারছে না সে।

রাতের পুরো বিষয়টি আরো একবার মনে করার চেষ্টা করে। তখন নটাও বাজেনি। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ। অহনা আর রিফাত ড্রইং রুমে টিভি দেখছিল। ঠিক তখনই ফোনটা আসে। ফোন হাতে রিফাত ব্যালকনিতে চলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে কথা চলতে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা হবে। এর মাঝে অহনাও ব্যালকনিতে এসে দাড়ায়। কিন্তু অহনার উপস্থিতি রিফাত টের পায় না। অভ্যাসবশত পুরো ব্যালকনিতে ধীর পায়ে হাটতে থাকে সে। কিন্তু হঠাৎই থমকে যায়। সেলফোনে রিফাতের কথা বলার ধরনে অবাক হয় সে।

ভিন্ন আবেগে, ভিন্ন আঙ্গিকে রিফাতের কথা, কথার প্রতি উত্তর অহনাকে কৌতূহলী করে তোলে। কার সঙ্গে এভাবে কথা হচ্ছে। কান খাড়া করে। অর্থহীন বাক্যালাপের মাঝে হাসির মিষ্টি শব্দে চমকে যায় অহনা।

মেয়ে কণ্ঠ! রিফাত কখনোই তো কারো সঙ্গে এভাবে কথা বলে না। অজানা একটা আশঙ্কা বুক চেপে বসে। আরো মিনিট পাচেক কথা বলার পর রিফাত ঘুরে দাড়াতেই অহনার মুখোমুখি হয়। স্বল্প আলোতে রিফাতের মুখটা বড্ড অচেনা লাগে। কেমন যেন ফ্যাকাশে আর নিস্প্রভ দেখায়। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। জোর করে হাসে। কিন্তু হাসিটা বড় বেখাপ্পা লাগে। রিফাতের ইতস্তত ভাব দেখে অহনাও খানিকটা অবাক হয়। স্বামীর মুখোমুখি দাড়িয়ে প্রশ্ন করে, 'কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে?'

প্রশ্নটা যে রিফাতকে খুবই বিব্রত করেছে সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। অহনার তীব্র দৃষ্টিবাণে নিজেকে অযথা সামলানোর চেষ্টা করে রিফাত। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসে। রিফাতের বোকার মতো আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে। এলোমেলো উত্তর দেয়– 'নাম মানে আমার অফিসের কলিগ। থার্টি ফার্স্ট নাইটে যে প্রোগ্রাম আছে তা নিয়েই কথা হচ্ছিল। সেদিন রাতে নাও ফিরতে পারি।'

কথাগুলো বলার সময় স্বামীর মুখের অস্বাভাবিক পরিবর্তন অহনাকে বিস্মিত করে। কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে আর রিফাতও তা লুকাচ্ছে। অহনার খটকা লাগে। 'কিন্তু তুমি তো কোনো প্রোগ্রামে রাতে বাড়ির বাইরে থাকোনি। তাছাড়া অফিসের কোনো প্রোগ্রাম থাকলে বরাবর তুমি আগে জানিয়েছ। অথচ আজ আমি জিজ্ঞাসা করার পর জানলাম। কেন বলো তো?' কথাগুলো বলতে বলতে ওর মুখটা শক্ত হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ভাবে। রিফাত স্পষ্টত মিথ্যা বলছে সেটা ওকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। ওর বানোয়াট যুক্তি, অফিসের প্রোগ্রাম, তার বিবর্ণ চেহারা সব কিছুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে। অহনা আর ভাবতে পারছে না।

'রিফাত এমন কিছু করো না যা তোমার সংসারের জন্য কেবল অমঙ্গলই বয়ে আনবে। আর এটাও শুনে রাখো ফোনটা তোমার অফিসের কোনো কলিগের নয়, কারণ তোমার অফিসে কোনো মহিলা কাজ করে না, আর এতক্ষণ তুমি একটি মেয়ের সঙ্গেই কথা বলছিলে। কি ঠিক বলিনি আমি?'

মুখোমুখি দাড়ানো রিফাত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে। অহনার কাধে হাত রাখে, 'প্লিজ ভুল বুঝো না। আমি বানোয়াট কোনো কথা বলছি না। সত্যিই থার্টি ফার্স্ট নাইটে অফিসে প্রোগ্রাম ...' রিফাতের কথা শেষ হওয়ার আগেই অহনা ঝড়ের বেগে ব্যালকনি ছেড়ে চলে যায়।

ব্যাস ওই পর্যন্ত। এরপর দুজনের মধ্যে আর কোনো কথা হয়নি।

রিফাতের মিথ্যাচারে ভীষণ আঘাত পায় অহনা। বিছানায় শোয়া পর্যন্ত কাদতেই থাকে। জীবনের সবচেয়ে আপনজন যে মানুষটি, সেই মানুষটি কতোটা অবলীলায় তাকে কষ্টের সাগরে ঠেলে দিয়েছে। মিথ্যার বুলিতে যে নিরেট সত্যকে রিফাত লুকাতে চেয়েছে তাকে কিভাবে মেনে নেবে? এক সপ্তাহের ব্যবধানে কী এমন ঘটলো যা তার সম্পূর্ণ জীবনের সুখকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। এসব হাজারো প্রশ্নের চক্রে ঘুরপাক খায় তার মনের ভুবন। অজানা আশঙ্কায় বুক কাপে। তবে কি রিফাত আমার অজান্তে অন্য কারো সঙ্গে গোপন

সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে? নাহ আর ভাবতে পারছে না অহনা। এও কি সম্ভব? রিফাত কি করে পারবে এত চমৎকার একটা সংসার, অহনা যাকে নিয়ে সে সবসময় গর্ব বোধ করে তাকে কষ্ট দিতে?

ঠা-া হিম হিম ভাব আরো বাড়ে। রাত তো অনেক হলো। নিঃসঙ্গ একাকী মেয়েটি ব্যালকনির আধো আলোতে কষ্টের নীল সমুদ্রে কেবলই ডুবে যাচ্ছে। আর রিফাত একটিবারও অহনার খোজ করেনি। নিজের মতো করে রাাতের সুখনিদ্রায় কতো ভালো আছে।

অহনা আর রিফাত সুখী জীবনের এক চমৎকার ছবি। বছর তিনেক আগে ভালোবাসার স্বর্গরাজ্যে ওদের সুখের বসতি। ঢাকা শহরের যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলো প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার তীব্র হোচটে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার নিরলস প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। প্রতিষ্ঠিত মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির আকর্ষণীয় ও লোভনীয় অফারে রিফাতের চাকরি জীবন শুরু হলে চার বছরের মাথায় নিজস্ব ভুবনে তার প্রতিষ্ঠা আজ ঈর্ষণীয়। ব্যক্তিগত ব্যাংক ব্যালান্সের সমুদয় অর্থ বিলাসিতার পেছেন ব্যয় না করলেও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে তারা দুজনেই অভ্যস্ত। তাছাড়া পারিবারিক স্বচ্ছলতায় পিছুটানের কোনো সুযোগ না থাকায় জীবনটাকে উপভোগের সব ধরনের আয়োজন হাতের মুঠোয়। ধানমন্ডির মতো অভিজাত এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটের গর্বিত মালিক হলেও অহনার জীবনে বিলাসিতার প্রভাব খুব একটা প্রকট নয়। বরং স্বামী রিফাতের আধুনিক মন-মানসিকতা আর উচ্ছ্বল জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা অহনাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। দিন বদলের পালায় ক্রমেই পরিবর্তন হওয়া রিফাত উচ্চাভিলাষী মননে নিজেকে প্রকাশ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ ঢাকার বাইরে তিন দিনের একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে রিফাত যোগ দিয়েছিল। সেখানে অহনারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতায় তা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এ অসুস্থতা তাদের দুজনের সংসারে নতুন মাত্রা এনেছে। আগামীর বাবা-মা হচ্ছে তারা। তিন মাসের সন্তান সম্ভবা অহনা নতুন এক অস্তিত্বের অনুভবে নিজেকে নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাবে। নারীত্বের পূর্ণতায় নিজেকে প্রতিটি মেয়ের আজন্ম লালিত স্বপ্ন মা হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও শুধু সংসারের জন্য নিজের ক্যারিয়ার গঠনের কোনো চিন্তাই করেনি অহনা। সে ভালোবাসে তার সংসার, আর স্বামী রিফাতকে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসার মানুষ হিসেবে রিফাতের জন্য নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে অহনা সুখী হতে চেয়েছে।

আর রিফাত, সেও বন্ধু, স্ত্রী আর প্রিয়জন হিসেবে অহনাকে অসম্ভব রকম ভালোবাসে। তাই তো তিন বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো রকম জটিলতা তাদের ছুতে পারেনি। কিন্তু আজ কয়েকটা দিনের ব্যবধানে তার সুখের সংসারে অনাকাঙ্ক্ষিত এক কষ্ট, যন্ত্রণা সব সুখ, ভালোলাগাকে তছনছ করে দিচ্ছে। কিন্তু কেন এমন হলো?

হঠাৎ করে শরীর খারাপ লাগছে। তাই কোনো কিছু না ভেবে রুমে ফিরে যায় অহনা। চুপচাপ শুয়ে পড়ে।

রিফাত তখনও ঘুমিয়ে। একটিবারের জন্যও ওঠেনি। অহনার জন্য তো অন্তত নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারতো। তাকে সমস্যাটা বোঝাতে পারতো। কিন্তু কিছুই করেনি। আর এতেই ভীষণ আঘাত পেয়েছে মেয়েটি। বুকটা ভেঙে গিয়েছে। কম্বলটা টেনে জড়িয়ে নেয়। অন্ধকারে রিফাতকে আলতো করে স্পর্শ করে। ইচ্ছা করছে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু পারে না। কষ্টটা চাপা দেয়। মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে। এখন একটু ঘুমানো দরকার।

পরদিন সকাল আটটা বাজে। অহনার ঘুম ভাঙে। পাশে রিফাত নেই। বাথরুমে শব্দ পায়। আরো আধঘণ্টা পর বিছানা থেকে নামে। প্রাত্যহিক কাজগুলো সারে। তারপরও ডাইনিং টেবিলে বসে। এর মধ্যে রিফাতও অফিসে চলে যায়। দুজনের মধ্যে আর কোনো কথাও হয় না।

বেলা এগারোটা নাগাদ অহনা পিয়াসকে ফোন করে আসতে বলে। পিয়াস সম্পর্কে রিফাতের কাজিন। যার বিয়েতে রিফাত অ্যাটেন্ড করেছিল। প্রায় আধঘণ্টা পর পিয়াস আসে। অহনা সব কিছু খুলে বলে। অনেকক্ষণ কথা হয়। তারপর সব জানতে পারে।

রিনি পিয়াসের দূর সম্পর্কের শ্যালিকা। ঢাকায় নামকরা একটি প্রতিষ্ঠানে মোটা অঙ্কের বেতনে চাকরি করে। আকর্ষণীয় ও সুন্দরী রিনির আছে উচ্চাভিলাষী জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। আরো আছে উগ্র মানসিকতা, যার কারণে একাধিক বন্ধু-বান্ধব বেষ্টিত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন কাটাতে বেশি পছন্দ করে সে। বিয়ে বাড়ির সূত্র ধরেই রিফাতের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গ আলাপ, ফোন নাম্বার বিনিময়। তারপর থেকেই দুজনের মধ্যে ফোনে কথাবার্তা চলতে থাকে। দেখা-সাক্ষাৎও হয়। আর এসবই হয় অহনার অগোচরে। ব্যাস এটুকু জানার পর প্রচ-ভাবে ভেঙে পড়ে অহনা। কি করবে বুঝতে পারে না। তার মনের আশঙ্কা সবই যে সত্য হবে তা কখনোই কল্পনাতেও আসেনি। অথচ তাই সত্যি হলো।

এরপরের দিনগুলো দ্রুত কাটে। এরই মধ্যে থার্টি ফার্স্ট নাইট পেরিয়েছে। রিফাত সেদিন বাসায় ফেরে প্রায় দশটা নাগাদ। কোথায় ছিল কিছুই জানতে চায়নি অহনা। প্রচ- কষ্টে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। ক্রমান্বয়ে স্বামীর সঙ্গে তার একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। আস্তে আস্তে তা বাড়তেও থাকে। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ কারোর সঙ্গে কথাও বলে না। রিফাতের আচরণ, পরিবর্তন সবই অহনাকে দারুণ বিস্মিত করে। মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়েটি কেমন ভেঙে একাকার হয়ে গিয়েছে।

কয়েক দিনের অনিয়ম আর অনিয়ন্ত্রিত অভ্যাসে স্বাস্থ্য চেহারার চরম অবনতি হয়। অথচ এ সময়ে এমনটি হওয়ার কথা নয়। বাড়তি যত্ন, মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকা খুবই প্রয়োজন। রিফাতের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। অহনা তার স্বামীকে প্রচ- ভালোবাসে। তার সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে রিফাত সব সময় খুব মজা পায়। প্রায় ঠাট্টা করে বলতো, ‘আমি যদি না থাকি তুমি কি খুব কষ্ট পাবে?’ উত্তরে অহনার দু চোখ বেয়ে অনবরত চোখের জল রিফাতকে ভীষণ বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিত।

‘তুমি যদি না থাকো তবে আমিও থাকবো না ।’

পুরনো দিনের সেইসব কথা মনে হলে খুব খারাপ লাগে ।

দিনগুলো পেরিয়ে যায় । ভীষণ খারাপ সময় । রিফাতের জীবন-যাপনের ধরনও পাল্টে যায় । রাত করে বাড়ি ফেরা, বাইরে থেকে খেয়ে আসা– সবই নিয়ম হয়ে যাচ্ছে । বাসায় ফিরে একাকী সময় কাটানো, প্রচুর সিগারেট খাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয় । অহনাও দূরে দূরে থাকে । কোনো কিছু শেয়ার করে না ।

রাত জাগা, না ঘুমিয়ে থাকা অহনার বাজে অভ্যাসে পরিণত হয় । এমন এক সময়ে সব কিছুই অসহ্য লাগে । নির্ঘুম চোখে রাতের প্রহর কেটে যায় । একাকী সময়গুলোয় পৃথিবীর নিয়ম, সংসারের জটিলতা সবকিছু নিয়ে ভাবে । শীতের রাতের এমনি এক প্রহরে মেয়েটি আবারো ব্যালকনিতে এসে বসে । জানুয়ারি মাস চলছে । তাই শীতটাও বেশ তীব্র । ভীষণ শীত লাগছে । অহনা জড়সড় হয়ে বসে । তবুও রুমে ফিরে যায় না । ঘুম তো নেই-ই । দু চোখ বেয়ে কেবল পানিই ঝরে । রিফাত ঘুমিয়ে পড়েছে । কত নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে । অথচ অহনা কি ভীষণ কষ্টে আছে সেদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই ।

‘অহনা’ রিফাতের কণ্ঠে ডাকটা শুনে চমকে তাকায় । পেছনে এসে কখন যে দাড়িয়ে আছে তা সে খেয়ালই করেনি । ‘প্লিজ ওঠো, রুমে চলো’ রিফাতের গলায় আকুতি ঝরে পড়ে । কিন্তু অহনা তখনও নির্বিকার । কোনো কথা বলে না । তখনও কাদছে সে । ‘তোমার শরীর ভালো না, লক্ষ্মীসোনা ওঠো, তোমাকে সব বলবো, প্লিজ ।’

রিফাতের অনুরোধে সে উঠে দাড়ায় । আর তখনি রিফাত তাকে দু হাতে জড়িয়ে নেয় । স্বামীর স্পর্শ পেয়ে আবেগে, কষ্টে ঝরঝর করে কেদে ফেলে মেয়েটি । প্রচ-ভাবে কাদতে থাকে । রিফাতও নিজেকে সামলাতে পারে না । মিনিট কয়েক পর অহনাকে ধরে রুমে নিয়ে আসে । দরজা বন্ধ করে । ঘরের আলো নেভায় । তারপর বিছনায় ওকে জড়িয়ে ধরে । প্রচ- আদর করে । অহনা একটুও বাধা দেয় না । বরং দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের কারণে আদরের মাত্রাটা কেবল বাড়তেই থাকে ।

ধীরে ধীরে রিফাত সব স্বীকার করে । নিজের দোষ, ভুল অবলীলায় স্বীকার করে অহনার কাছে ক্ষমা চায় । বলে– ‘ওসব ভুলে যাও । প্লিজ কিছু না, কিছুই ঘটেনি, সবই ভুল ।’

রিফাতের ভালোবাসার আহ্বানে আশ্বস্ত হয়ে অহনা শান্ত হয় । পেছনের কথাগুলো আর মনে করতে চায় না । একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয়, ফোনালাপ– সবই রিফাত স্বীকার করেছে । আর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজের সুখ, নিজের ঘর তার কাছে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বেশি মূল্যবান । তার চেয়েও মূল্যবান অহনার ভালোবাসা ।

স্ত্রী হিসেবে অহনার ত্যাগ, ভূমিকা যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি। তাই তো সে অহনাকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি। তার এ ভালোবাসা কখনোই সে হারাতে দেবে না।

অহনা নিশ্চুপ থাকে। স্বামীর বুকে সন্তর্পণে জড়িয়ে আছে সে। তার ভালোবাসার সুখ, প্রাপ্তি সবই যে রিফাতকে নিয়ে। তার এ

অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিদান রিফাতকে দিতেই হবে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

গালি থেরাপি

এহতেশামুল হক শাওন

মোবাইল রিসিভ করে হ্যালো বলতেই প্রথমে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একটু পর এক পুরুষ কণ্ঠ ফিশফিশিয়ে অন্য কারো উদ্দেশে বললো, ভাবছিলাম ফারজানা ধরবে। ধরছে দেখি এক ব্যাটা। কি করবো?

অন্যজন লাইন কেটে দেয়ার পরামর্শ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাশ থেকে লাইন কেটে গেল। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির সবার সঙ্গে বসে টিভি দেখছিলাম। ওইদিন প্রথম কলটি এসেছিল। এর দুই দিন পর আবারো সেই একই নাম্বার থেকে কল আসতে থাকলো। যতোবার রিসিভ করে মোটা গলায় হ্যালো বলি ততোবারই লাইন কেটে দেয়। আমার বিরক্তি বাড়তে লাগলো। অন্যদিকে মোবাইলকারীও বোধহয় অধৈর্য হয়ে উঠলো। এক সপ্তাহ এভাবে কাটাকুটি খেলার পর এক দিন তীব্র ঝাজের সঙ্গে বলে বসলো, ওই ভাই, রোজ রোজ আপনে ফোন ধরেন ক্যান? যার ফোন হ্যারে দেন না।

শীতল গলায় বললাম, ফোনটা তো আমার। আপনি কাকে দিতে বলছেন?

হ, আপনার ফোন। এটা ফারজানার ফোন। হ্যার কাছে ফোন দ্যান।

আমি আরো শীতলভাবে আমার নাম-পরিচয় জানিয়ে বললাম, মোবাইল নাম্বারটা আমার এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীতে ফারজানা নামে আমার কোনো আত্মীয় নেই।

মোবাইলের ওই প্রান্তে যেন ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটলো। ওই মিয়া, ইয়ার্কি পাইছেন। দশ টাকার নোটে নাম্বার লিইখ্যা সঙ্গে লিখছেন বন্ধুত্ব ও প্রেম করতে চাইলে মোবাইল করুন, ফারজানা। আর অখন কইতাছেন ফারজানারে চিনেন না। যুবক পোলাপাইনের মাথা খাইতে চান? তাদের লগে প্রতারণা করেন?

তার কথার ঝাজে আমি দিশেহারা। এমন উদ্ভট কথাবার্তা আমি জীবনে শুনিনি। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। টাকায় লেখার মতো রুচিহীন কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব না। সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। এরপর ধমকের সঙ্গে বললাম, যতোবার কল করবেন ততোবার আমিই রিসিভ করবো। অতএব কোনো নারী কণ্ঠ শোনার প্রত্যাশায় সে যেন আর ফোন না করে।

এরপর শুরু হলো এসএমএস যন্ত্রণা। দিনের মধ্যে ১০-১৫টা। ফারজানার হাতের লেখা পড়েই সে রোমিও হয়ে গেছে। ফারজানাকে নিয়ে সে বাতাসে ভাসবে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে, সাগরের বালুকা বেলায় ঘর বাধবে, ফুলের বাগানে লুটোপুটি খাবে ইত্যাদি।

এসব প্লেটোনিক লাভ মেসেজ তা-ও সহ্য করে নিচ্ছিলাম। অবাক হচ্ছিলাম বাঙালির ভালোবাসার ক্ষমতা দেখে। যাকে চোখে দেখিনি, যার কণ্ঠ কানে শুনিনি, পৃথিবীতে আদৌ যার অস্তিত্ব আছে কি না জানি না, তাকে নিয়েই প্রতিনিয়ত স্বর্গ রচনা করে চলেছি। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই প্লেটো সাহেবের জায়গা চলে গেল সিগমন্ড ফ্রয়েড সাহেবের দখলে। প্রেমের স্থানে হঠাৎ করেই জেকে বসলো কাম। আকাশ-বাতাস, ফুল, পাখি, সমুদ্র, পাহাড় বাদ দিয়ে কুলাঙ্গার প্রেমিক ফারজানার শরীরের খাজ, ভাজ পরিভ্রমণ ও অবগাহন শুরু করলো। মনে পড়লো, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বুক স্টলে ইদানীং অ্যাডাল্ট এসএমএস গাইড নামের এক শ্রেণীর রঙচঙা চটি বই সারি সারি ঝোলানো থাকে। বুঝলাম প্রেমিক ব্যাটা ওই বই থেকে কাটিং করে এসএমএস দিচ্ছে।

অনেক হয়েছে। এবার কল ব্যাক করলাম। একবার, দুইবার, তিনবার...। ব্যাটা রিসিভ করে না। কিছু সময় বিরতি দিয়ে এক কলিগের মোবাইল থেকে কল দিলাম। টোপ গিললো।

বাংলা সাহিত্যে অনার্সসহ মাস্টার্স করেছি। তবে খাস বাংলা ভাষা বলে যে বিশেষ একটা ভাষা আছে তার চর্চায় কোনো কালেই অভ্যস্ত ছিলাম না। যাদের সঙ্গে কাজ করি, চলি-ফিরি কিংবা রাস্তাঘাটে আসতে-যেতে বাংলা ভাষার বিচিত্র সব খিস্তি-খেউর অহরহ কানে আসে। ভুলে করেও কখনো ওসব শব্দ উচ্চারণ করিনি। কিন্তু সেদিনই প্রথম করলাম।

শুরু করে যতোগুলো খাস বাংলা শব্দ মনে আসে সব বললাম। যেহেতু বলে অভ্যস্ত না, তাই দ্রুত শব্দ ভা-ার ফুরিয়ে গেল। ফলে আবারো প্রথম থেকে শুরু করলাম। এভাবে চললো পাক্কা পাচ মিনিট। এ সময়

বিটকেলটা শুধু তো তো করতে লাগলো। আমি লাইন কেটে দিলাম।

প্রায় এক বছর হতে চললো আর কেউ বিরক্ত করেনি। মাঝে মধ্যে তীব্র অনুশোচনা হয় একজন মানুষকে কিভাবে এতো জঘন্য গালি দিতে পারলাম।

দুটি পরামর্শ দিয়ে লেখা শেষ করবো–

১. প্রেমিক হন, পশু হবেন না।

২. টাকায়, বাসের সিটে, দেয়ালে, গাছের গায়ে অন্যের নাম-ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার লিখে বিব্রত করবেন না।

খুলনা থেকে

ভিখারিনী ও একটি কবুতর

কাশিক

ভিখারিনী তার সঙ্গী অন্ধ ভিখারিকে পরম মমতায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার হারিয়ে যাওয়া শৈশবে দেখা এ দৃশ্যটা পরিণত বয়সে আমাকে ভালোবাসা শেখালো।

একদিন 'মিরা' বলেছিল– 'ইস, আমি যদি ওই ভিখারিনী হতাম!'

পড়তে পড়তেই মিরার সঙ্গে আমার দেখা হলো। তারপর বন্ধুত্ব, অবশেষে বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে আরো বড় কিছু হলো।

ইচ্ছা ছিল মিরার সঙ্গে হিমালয় দেখবো, বরফের চাদরে ঢাকা হিমালয়ের বুকে হাটতে হাটতে ওকে বলবো, তুমিতো ভিখারিনী হয়েই আছো প্রিয় সখি আমার!'

কিন্তু। সে কথাতো আর বলাই হয়নি। তার আগেই তো নিয়তি এসে ওর ঠিকানা বদল করে দিল। মিরা এখন শত আলোকবর্ষ দূরে।

কিন্তু তাতে কি, যাওয়ার আগে সে ঠিকই কখন যে তার মনের সবটুকু ঐশ্বর্য ঢেলে একটা স্বর্গীয় প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল এ অন্ধ ভিখারির অন্তরে তা তখন বুঝিনি । আজ আমি সেই প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় পথ চলি । আহা! কি অনন্ত সুখ এ পথ চলায় । ওহে প্রাণের ভিখারিনী আমার, তুমি যেখানেই থাকো, যতো দূরেই থাকো, কখনো কখনো তোমার মনের সৌরভ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ো গো– যার ঢেউ এসে প্রদীপটাকে উস্কে দেবে ।

আমাদের বাসায় বেশ কয়েক জোড়া কবুতর ছিল । একটি জোড়া ছিল ভীষণ সুখী । ওরা এক সঙ্গে খেতো, একই সঙ্গে ওড়াউড়ি করতো আর নিত্য খুনসুটি তো ছিলই । একদিন উড়তে গিয়ে কবুতরটা (মেয়ে) ভীষণ আহত হয়ে ফিরে এলো । অনেক রক্ত ঝড়লো । শেষ পর্যন্ত ওকে আর বাচানোই গেল না । এদিকে সঙ্গিনীকে হারিয়ে বেচারা কবুতরের কি যে হাল হলো । সে খায় না, ঘুমায় না, সারা দিন-রাত শুধু খাচার বাইরেই বসে থাকে আর কি যে ধ্যান করে আল্লাই মালুম । এভাবে টানা সাতদিন পর সেও চলে গেল এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে । ‘প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় প্রিয়জনের মৃত্যু’ ।

আমার ভিখারিনী হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমার খেতে ও ঘুমুতে ভালো লাগে না । ভিখারিনীর ভাবনাই এখন আমার নিত্য সঙ্গী । আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার মুখেই এখন শুধু একটি প্রশ্ন, ‘এই তুমি এতো শুকিয়ে যাচ্ছো কেন?’

আমার মুখে প্রসন্নতার হাসি । শুধু ভাবি আহা কি যে সুখ আছে এই সিমপ্যাথেটিক সিনড্রোম-এ তা আমি ছাড়া আর কে এতো ভালো বুঝবে!

কি মধুর হলো আজি এ বিরহ-দহন…!

উত্তরা, ঢাকা থেকে

আঠারতম

দোলন

আজ এতোদিন আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি । অথচ কেউ কাউকে দেখিনি । এটা কি মানা যায় নীলা?

এটা ছিল নীলাকে পাঠানো মোহনের ষোলতম চিঠির কথা। এরপর নীলা আর 'না' করতে পারেনি। মোহনের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নিতে হয়েছে। মোহনের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ নিজের মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। কারণ নীলা খুব ভালোভাবেই জানে দেখা হওয়ার পর মোহন আর কখনোই নীলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। এ নিয়ে কম কথাও হয়নি। নীলা বহুবার বুঝিয়েছে দেখা হওয়ার চেয়ে না হওয়াটাই ভালো। কিন্তু মোহন যেন দিন দিনই আরো বেপরোয়া, আরো অবুঝ হয়ে উঠছিল।

মোহন এমনিতেই একটু জেদি। কোনো কথা বললে সেটা করে ছাড়বেই। শুধু নীলাকেই বোঝাতে পারছিল না প্রথম থেকেই। পত্রিকায় মোহনের লেখা ছাপা হওয়ার পর নীলাই প্রথম চিঠি লিখেছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে। উত্তর পেতেও খুব বেশি দেরি হয়নি মোহনের কাছ থেকে। কি অপূর্বই না ছিল সেই সব দিনগুলো! একটা চিঠি পাঠানোর পর থেকে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করা পরবর্তী চিঠির জন্য। প্রতিটি ক্ষণ যেন 'এই বুঝি চিঠি এলো, চিঠি এলো' ভাবে কাটতো। নির্মল বন্ধুত্বই ছিল প্রথম দিকে। এরপর মোহনের পাঠানো একটা চিঠি তোলপাড় করে দিল নীলার জীবন। কোনো রকম ভনিতা ছাড়াই মোহন জানিয়েছে তার ভালোবাসার কথা, জীবনের প্রথম ভালোবাসার আহ্বান। খুশিতে মন ঝলমল করারই কথা। অথচ নীলার মনটা কষ্টে ভরে গেল। কারণ সে জানে কোনোদিনই এ অসম ভালোবাসা সফল হওয়ার নয়।

চিঠির উত্তর পাঠাতে দেরি হলো। নীলা অনেক ভেবেছে। ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিল মোহনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার। মোহনের জন্য দুঃখই বোধ হলো নীলার। বেচারা হয়তো তাকে ভুল বুঝবে। অহঙ্কারী ভাববে। কিন্তু নীলা তো জানে না কিছুই করার নেই। এ প্রেম কখনোই সফল হবে না। কিছুতেই না। চিঠি পাঠানোর পর নীলা ধরেই নিয়েছে মোহন আর কখনোই তাকে লিখবে না। ভুল বুঝে দূরে সরে যাবে। প্রত্যাখ্যানের কষ্টে নীল হয়ে যাবে। অথচ তার কিছুই করার নেই। সে তো আসলে মোহনকে কষ্ট দিতে চায়নি।

নীলাকে অবাক করে দিয়ে মোহনের চিঠি এলো। মোহন লিখলো, নীলা তাকে ভালোবাসুক আর না বাসুক, সে একাই নীলাকে ভালোবেসে যাবে আমৃত্যু। মোহনের এ চিঠিটা নীলার মনে গভীর দাগ কাটলো। একদিকে মোহনকে পাওয়ার আনন্দ অন্যদিকে মোহনের চিঠির ভাষাগুলো নীলার মনে এক অন্য রকম সুখ সুখ অনুভূতির জন্ম দিল। নীলা কিছুতেই মোহনের বন্ধুত্ব হারাতে চায় না। কিন্তু মোহনের ভালোবাসার দাবি তার পক্ষে মানা সম্ভব নয়। এদিকে মোহনও প্রত্যেক চিঠিতেই তার ভালোবাসার কথা জানিয়ে আসছিল।

এক চিঠিতে মোহন তার মোবাইল নাম্বার জানালো। নীলাকে বললো কল করার জন্য বা তার নাম্বার দেয়ার জন্য। নীলার নিজস্ব কোনো মোবাইল নেই। অবশ্য প্রয়োজনও পড়ে না। তাছাড়া তখন মোবাইলের তেমন প্রচলনও শুরু হয়নি। নীলা মোবাইলের প্রসঙ্গ এড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে চিঠির উত্তর দিল।

মোহন এতে মনে ভীষণ কষ্ট পেল। কিন্তু হাল ছাড়লো না। পরবর্তী চিঠিতে মোহন তার ছবি পাঠালো। নীলাকেও তার ছবি পাঠাতে বললো। সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল, নীলা যদি তাকে ভালো না বাসে তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। এ চিঠিটা পড়ে নীলা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। সে কিভাবে এই অবুঝ, ভীষণ

রকম জেদি এবং ভীষণ রকম ভালো ছেলেটাকে বোঝাবে যে ভালোবাসা তার জন্য নয়। তাদের কেবল পত্র মিতালীই হতে পারে। ভালোবাসা নয়। কিন্তু এতোদিনের পত্র মিতালীতে নীলা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছে মোহন এবার একটা অঘটন ঘটিয়েই ছাড়বে। তাই সে মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই চিঠিটা লিখলো, যে চিঠিটা পাওয়ার জন্য মোহন অধীর আগ্রহে এতোদিন অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে তার একটা ছবিও দিল।

এমনিতেই নীলা বেশ সুন্দরী। তার ওপর ফটোগ্রাফারের কল্যাণে ছবিটা হয়েছে অসাধারণ! এ চিঠি পাওয়ার পরই মোহন নীলাকে দেখতে একেবারে উঠে পড়ে লাগলো। কিন্তু নীলা বারবারই বিভিন্ন অজুহাতে দেখা করতে চায়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ষোলতম চিঠিতে মোহন লিখলো আজ এতোদিন আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। অথচ কেউ কাউকে দেখিনি। এটা কি মানা যায়, নীলা? বলো নীলা, এটা কি মানা যায়?

মোহনের এ আকুল কণ্ঠের আবেদন নীলা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। তাই তার উত্তরে দেখা করার সম্মতি দিল। দেখা হবে নীলাদের বাসায়। সতেরতম চিঠিতে মোহন আসার তারিখ জানিয়ে দিল।

এদিকে নীলাও তার বাবা-মাকে মোহনের আসার সংবাদ দিল। তারা আগে থেকেই মোহনের ব্যাপারটা জানতো। তাই মোহনের আগমনের ব্যাপারটা মোটামুটি নির্বিঘ্নই হলো।

নির্দিষ্ট দিনে নীলা তার প্রিয় গোলাপি থ্রি পিসটা পরলো। নীলার মা-বাবাও ঘরদোর সাজিয়ে, ভালো রান্না-বান্নার আয়োজন করে মোটামুটি একটা উৎসবের আমেজ তৈরি করলো।

মোহন এলো দুপুরের দিকে। নীলার মা-বাবা মোহনকে সাদরে বরণ করলো। প্রাথমিক কুশল বিনিময় শেষে মোহন যখন নীলাকে না দেখে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল তখন নীলার মা বললো, যাও বাবা নীলা তার ঘরেই আছে। বলে নীলার ঘরটা দেখিয়ে দিল।

নীলার ঘরে ঢুকেই আনন্দে মোহনের মনটা ভরে উঠলো। নীলাও মুচকি হেসে চেয়ার এগিয়ে দিল। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত মুখ দেখে মোহন খুশিতে পাগলপ্রায়। মোহন যতোখানি ভেবেছে নীলা তার চেয়েও সুন্দর। আনন্দে মোহনের মুখের বাধন খুলে গেল। স্বভাবসুলভ চঞ্চলতায় কথার তুবরি ছোটালো। কিভাবে এলো, পথে কোনো সমস্যা হয়েছে, কি হয়নি। এখন নীলাকে নিয়ে তার কি পরিকল্পনা। নীলা সবই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছে।

মোহনের খুশিতে ঝলমল করা মুখ দেখে যতোটা না আনন্দ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে একটু পরই মোহনের এ উদ্দাম চঞ্চলতা থেমে যাবে। একেবারেই মিইয়ে যাবে মোহন। সেই কষ্টকর দৃশ্য দেখার চেয়ে নীলার এখনই মরে যেতে ইচ্ছা করছে। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

নীলার চোখে পানি দেখে মোহন ভীষণ অবাক হলো! তাহলে কি নীলা তাকে দেখে খুশি হয়নি? মোহন বেশ বিব্রতবোধ করছে। শেষে সাহস করে নীলাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার, তুমি কাদছো কেন? আমাকে দেখে তুমি খুশি হওনি? বলো নীলা, বলো। তোমাকে দেখার জন্য এতোদূর থেকে ছুটে এসেছি। অথচ তুমি কিছুই বলছো না। একটা কিছু বলো।

নীলা কিছুই বললো না। শুধু বালিশের নিচ থেকে একটা চিরকুট বের করে মোহনের হাতে দিল। তাতে লেখা মোহন আমি বোবা, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো!

সন্ধ্যার কিছু পর। মোহন চলে যাচ্ছে। নীলার বাবা-মা মোহনকে এগিয়ে দিচ্ছে। অনেক সাধাসাধির পরও মোহন থাকেনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে নীলা এলো। তার মুখে হালকা হাসির পরশ। কষ্ট করে রাখা। মনে কোথায় যেন একটু দ্বিধা। মনে হচ্ছে মোহন বুঝি চিরদিনের জন্যই চলে যাচ্ছে। যদিও মোহনের এতোক্ষণের উপস্থিতিতে সে রকম বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। মোহন নীলাকে আশ্বাস দিয়েছে, তার সঙ্গে মোহন সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। এও বলেছে যেহেতু নীলা রোড একসিডেন্টের কারণে মাথায় আঘাত পেয়ে আজ এ অবস্থা, কাজেই সে একদিন না একদিন তার বাকশক্তি ফিরে পাবেই। নীলা জানে, এসবই কেবল আশার কথা। তবু মোহনের মুখ থেকে তা দৈববাণীর মতো লাগছে।

সেই মোহন চলে যাচ্ছে। কষ্টে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি মোহন হারিয়ে গেল। ঠিক তখনি নীলা খুব সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলো তাদের বাসায় আসার পর থেকে মোহন একবারও নীলাকে ভালোবাসার কথা বলেনি।

এরপর গল্প সামান্যই। মোহন চলে যাওয়ার পর আজ অনেক দিন হলো। নীলা শুধু লক্ষ্য করলো মোহনের পাঠানো আঠারতম চিঠিটা আর আসছে না।

শাহ মখদুম, রাজশাহী থেকে

প্যাচালি

বাতেন

তুমি যদি চাও সূর্যকে নিয়ে যাবো তোমাদের বাড়ি/তুমি যদি চাও অক্সিজেনের সাথে করে দেবো আড়ি/যদি তোমার দু'চোখ রাত্রির খোজে পৃথিবীকে দেবো মুড়ে/তুমি চাইলেই বোবা পৃথিবীটা ভরে দেবো সুরে সুরে–

নচিকেতার মতো অনেকেই প্রিয় মানুষটির উদ্দেশে এ রকম হাজারো শপথ বাক্য পাঠ করি। যদিও বার্নার্ড শ বলেছিলেন, প্রেম হলো একটা জ্বলন্ত সিগারেটের মতো, যার শুরু আগুন দিয়ে এবং শেষ ছাইয়ে।

এ রকম করুণ পরিণতির কথা জেনেও আমরা কেউই কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে তেমন পিছিয়ে নেই। আর থাকারও কথা নয়। প্রথম মানব ভালোবেসেই গন্ধম ফল খেয়েছিল স্রষ্টার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ফলশ্রুতিতে স্বর্গচ্যুত হয়ে আবার ভালোবাসার বলেই বহু বছর পর হাওয়ার সঙ্গে মিলন ঘটে।

হেলেনকে জেমসের ভালোবাসার কারণেই ট্রয় যুদ্ধের সূচনা এবং ১০ বছরের যুদ্ধে ট্রয় নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

সীতাকে ভালোবেসে ফেলার কারণেই রাবণ তাকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং অবশেষে স্বর্গপুরী লঙ্কা জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়।

ভালোবাসার কারণেই ইউসুফকে জেলের ঘানি টানতে হয়।

বনবাসী আইয়ুবের মরণব্যাধি কুষ্ঠকে উপেক্ষা করে ভালোবেসেই রহিমা সারাক্ষণ তার সঙ্গে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন।

সাপে কাটা ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া লখিন্দরের সঙ্গে থাকে বেহুলা।

সাবিত্রী তার মৃত স্বামীর পুনর্জন্ম আনে ভালোবাসার বদৌলতেই।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী লোকের মুখে মুখে।

প্রেমের মালা গলায় দিয়েই সপ্তম এডওয়ার্ড রাজসিংহাসন ছেড়ে পথে নামেন।

সম্রাট শাহজাহান নিজের প্রেমের অম্লান স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই নির্মাণ করেন তাজমহল।

প্রেমের কারণেই লাইলি-মজনু, আনার-কলি, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট এমনকি শরৎ বাবুর দেবদাসের

করুণ বেদনার্ত পরিণতি আজো আমাদের অন্তরে রক্তপাত ঘটায়।

তবু প্রার্থিত মানুষটির আগমন প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে থেকে থেকে আমরা কেউ কেউ রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা ঘর-বাড়ি হয়ে যাই, হয়ে যাই ট্রাফিক পুলিশ। দাড়িয়ে থেকে থেকে আমাদের দুই পায়ে দুই হাজার ২১০টি শিকড় গজিয়ে যায়। হাড় ছিদ্র করা শীত ছোবল মারে, আজরাইল কুয়াশা জড়িয়ে ধরে আপাদমস্তক। শীতল বাতাস সুচালো বেয়নেট হয়ে লাগাতার হানে অস্থি-মজ্জায়। তবু আমরা দাড়িয়ে থাকি প্রিয় মানুষটি আসার প্রতীক্ষায়।

হায় ভালোবাসা! মনের মানুষটিকে এক পলক দেখার আনন্দের কাছে ঈদ, দুর্গাপূজা, পহেলা বৈশাখ, বড়দিন, মাঘি পূর্ণিমা, থার্টি ফার্স্ট নাইটও কিছুই নয়। ভালোবাসা মরে গেলে, ঘৃণা হয়ে যায়– সমরেশ মজুমদারের এ উক্তিটি অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। আর তাই সাবেক প্রেমিক অথবা প্রেমিকাকে দেখামাত্রই কারো কারো কাছে অমাবশ্যার দংশন, সুনামি-সিডরের আলিঙ্গন মনে হয়। যাতনার যাতাকলে দেহ-মন-প্রাণ সপে দেয় অনেকেই।

যার এক ফোটা হাসির কাছে হাজার বিয়ে বাড়ি, বনভোজন, নাট্যশালা বরাবরের মতো শূন্যতায় সীমাবদ্ধ ছিল। ছাড়াছাড়ির পর সে-ই হয়ে যায় কারো কারো কাছে আহত বাঘ, অজগর, হাঙরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বন্দুক, ক্ষেপণাস্ত্র, হাইড্রোজেন বোমের চেয়ে বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর।

এতোদিনের মুখোমুখি সহাস্যে বসা, সোনালি রোদে হাটা, হাত চেপে ধরা, ঝরনার ঝিরঝির হাসি, বসন্ত-ফাগুনের সুরভিতে বর্ণিত বাসনা সাজানো, জোসনার মিনারে ফিসফিসে প্রেমালাপ, প্রজাপতির মেলায় দুই চোখে বাসর গড়া, অনুভবের স্বর্গে ডুবে ঠোটে ঠোট গাথা এবং রঙধনু অভিমানগুলো জাহান্নামের আগুন মনে হয়। মনে হয় জোকের মতো। রাজাকার, বাদুর, চামচিকা, কেচো, থুথু, বমির মতো ঘিনঘিনে। অভিধানের প্রতারিত শব্দটিতে মিশে গিয়ে রাতের পর রাতগুলো হয়ে যায় দুই হাতে মুখ ঢেকে নিভৃতে ডুকরে ওঠা।

প্রেম বলতে কেবল যুবক আর যুবতীর সম্পর্ককেই বোঝায় না। সম্পর্কের ধরনও অনেক প্রকার। ভাইবোনের সম্পর্ক, বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে, ননদ-ভাবি, শ্বশুর-জামাই, শাশুড়ি-পুত্রবধূ, এমনকি বন্ধুত্বেরও হতে পারে। সে সম্পর্কগুলো হতে পারে সুসম্পর্ক, কুসম্পর্ক, মোটামুটি ভালো, তেমন একটা ভালো নয় ইত্যাদি। এছাড়া কারো কারো সঙ্গে দৈহিক, আত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক হাজার ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

মানুষের পাশাপাশি ঈশ্বরপ্রেমী, প্রকৃতিপ্রেমীর সংখ্যাও কম নয়। আত্মপ্রেম, সমাজপ্রেম, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেমসহ অসংখ্য রকমের প্রেম এবং প্রেমিক সমাজে বসবাস করছে। নানা ধরনের ভালোবাসার মতো এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিভিন্ন রকমের। সব ধরনের দৃশ্যত যোগাযোগ ছাড়াও একজন প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের খবরাখবর চালাচালি করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ আত্মিক

ব্যাপার।

প্রেমে সফলতার জন্য অনেক ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-খরা-ভূমিকম্পের মহাতা-ব সহ্য করতে হয়। আবার এতো কিছুর পরও অনিঃশেষ অন্ধকার প্রাপ্তি হয় কারো কারো। একেকজনের ভালোবাসা একেকরকম। কারো ঝাল ঝাল, কারো মিষ্টি মিষ্টি। আবার কারোটা টক। আর সেটাই তাদের সত্যাসত্য সুন্দর ভালোবাসা। ভালোবাসাটির প্রতিটি সোনালি-রুপালি-আসমানি-বেগুনি ইত্যাদি রঙের সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছরগুলো হয়ে যায় মনের মানুষটিতে পরিপূর্ণ।

কারণ হৃদয় দিয়ে দেয়াটা পাহাড় ছিড়ে বেরিয়ে আসা ঝরনার মতো। কিংবা ট্রিগারের চাপে বেরিয়ে যাওয়া বুলেটের মতো। একবার বেরিয়ে গেলে যাকে আর তার উৎসস্থলে কোনো প্রকারেই ফেরানো সম্ভব নয়। তাই কাউকে দিয়ে দেয়া হৃদয়কে আর কোনোক্রমেই ফেরানো সম্ভব হয় না। এ কারণে প্রাণের বন্ধুটিও হতে পারে নানা ধরনের। যেমনটি হাসানের মতো প্রাণের বন্ধুকে লাল বন্ধু, নীল বন্ধু, রঙ্গিলা বন্ধু নামে ডাকি। আদর করে ময়না-টিয়া-বুলবুলি– এ রকম নানা নাম দিই। কেউ কেউ আবার এক চোখে ট্যারা পছন্দসই মেয়েটির নাম দিই পদ্মলোচনা। কারো প্রেয়সী কখনো কুৎসিত হয় না– জে জে জেভ-এর উক্তিটি সত্যিই অনবদ্য।

আবার এ প্রেমে ব্যর্থতার কারণে কেউ কেউ বিষপান, আফিম, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা, মদ, ভাং, গাজা, বিড়ি, সিগারেটে আসক্ত হয়ে পড়ে। বখাটে, সন্ত্রাসী, কালোবাজারির খাতায় নাম লেখায় কেউ কেউ। কখনো কখনো মা-বাবার অবাধ্য হতে হয় প্রেমের কারণেই।

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, প্রেমের ব্যাপারে যদি কেউ জয়ী হতে চায়, তাহলে একমাত্র অস্ত্র হলো নিরুদ্দেশ হওয়া। তাই প্রেমে সফলতার জন্য ঘর ছাড়ে অনেকেই। প্রেম বলতে কারো কারো কাছে প্রয়োজন নামক একটি শব্দ। আমরা প্রেম পড়ি কেবল প্রয়োজনেই। প্রেমে পড়ে আমরা কখনো কখনো হতাশার হাটে যাই, টনে টনে যাতনা কিনি, কষ্টের জেলে বন্দি হই, হারাই অথই অনিদ্রায়, অনাহারে অর্ধাহারে হই অজ্ঞান, শরীরকে বানাই অযত্নের আখড়া।

অসুস্থতায় হই কুপোকাত, গড়ি দীর্ঘশ্বাসের দালান-কোঠা, অরণ্য বানাই অশ্রুর, বমিতে ভাসাই বুক এবং নিজের কাপড়-চোপড়। ওয়াক থু– নামকরণ করি জীবনের।

তবু আহসান হাবীবের পঙক্তিতেই প্রার্থনা করি– চলো যাই প্রেম আর বিশ্বাসের আলো হাতে নিয়ে এগিয়ে/ পেরিয়ে যাই ঘৃণার নদীর সাকো।

খানসামা, দিনাজপুর থেকে

পুলিশ অফিসার

মোহাম্মদ সোহেল রানা

জরি সবেমাত্র প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে এমএসসিতে ভর্তি হয়েছে। আমি পরীক্ষার্থী একই বিভাগ থেকে। পরীক্ষার পর শালবন, রামসাগর, মাতাসাগর, কান্তজী মন্দির, লালবাগ, নদীর তীর– এমন কোনো প্রেমের লীলাস্থান নেই, যেখানে আমাদের পদধূলি পড়েনি। ক্লাস ফাকি, বাড়ির নৈমিত্তিক কাজ, চাকরির প্রস্তুতি সব কিছু লাটে উঠলো। এসব কিছু তোয়াক্কা না করে চালিয়ে গেলাম প্রেমলীলা।

কথায় আছে– চোরের দশ দিন, গৃহস্থের এক দিন। আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটলো না।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ভালোবাসা দিবসে পরিকল্পনা মাফিক দুজন বের হলাম। কিন্তু জরির বাবা গণেশতলায় হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। তিনি বেশ ভদ্রলোক হওয়ায় সেদিন কিছু না করে আমার হাতের মুঠো থেকে জরির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, আগামীকাল বাসায় বেড়াতে এসো। এমন আচরণে আমি বিস্মিত হলাম।

মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। কথাটির বাস্তবতা বুঝলাম জরির বাসায় গিয়ে, ভেবেছিলাম আমাদের সম্পর্কটি বুঝি মেনে নেবেন কিন্তু বিধি বাম। উল্টো বুঝিয়ে বললেন, তোমার এমন দৃষ্টান্ত জানা আছে কি, একজন বাবা তার মেয়েকে বেকার ছেলের হাতে অর্পণ করেছে?

সমজদারকে লিয়ে ইশারাই কাফি, সুতরাং স্বাবলম্বী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে সেদিন ঘরের দরজা পরিত্যাগ করলাম। কিন্তু কতো ধানে কতো চাল হয়, তা টের পেলাম চাকরি বাজারের বাস্তব চিত্র দেখে। কঠোর মনোনিবেশ, সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন। কিন্তু না, দীর্ঘ ছয় মাসেও কোনো চাকরির দেখা পেলাম না। অথচ জরিরও মাস্টার্স পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পর নিশ্চয়ই কোনো বেকারের জন্য কোনো বাবা তার মেয়েকে ফেলে রাখবে না। সুতরাং হাতছাড়া ভালোবাসার পাখি এবার দৃষ্টিছাড়া হওয়ার উপক্রম। নানা চিন্তা-ভাবনা, বাড়ির লোকজনদের উপহাস, প্রতিবেশীদের নানা কথা যেমন এমএসসি পাস করার এক বছর হলো এখনো বাবার হোটেলের ভাত নষ্ট করছে, এতো লেখাপড়া করিয়ে কি লাভ হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা ধরেনর ভর্ৎসনা, গ্লানি, হতাশায় ভরাডুবি খেতে খেতে এক দিন আশার আলো জ্বলে উঠলো। পত্রিকায় দেখলাম বাংলাদেশ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে ৬৫৪ জন নিয়োগ দেয়া হবে। আশার আলো এ জন্য জ্বলে উঠলো যে, বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। টাকার প্রয়োজন হবে না।

কষ্টে অর্জিত জরি, তাকে পাওয়ার চেষ্টা, বেকারত্ব দূরীকরণের ঐকান্তিক চেষ্টা, সবার ভর্ৎসনা, বঞ্চনা, ঘৃণা ও উপেক্ষাকে অবদমিত করতে সক্ষম হলো। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ সাব ইন্সপেক্টর পদের এক বছর মেয়াদি ট্রেইনিংয়ের জন্য চলে আসি বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে। রাজশাহীতে আসার আগে

জরির বাবার সঙ্গে দেখা করি এবং চাকরির কথা জানালে তার মুখখানা আলোকিত হলো। হয়তো এই ভেবে যে, মাছের রাজা ইলিশ আর জামাইয়ের রাজা পুলিশ।

যখন শুনলো তিন বছরের মধ্যে আমি বিয়ে করতে পারবো না (এক বছর ট্রেইনিং, দুই বছর শিক্ষানবিশকাল) তখন মুখটা মলিন ও বিবর্ণ হলো। তারপর খানিকটা ভাবুক কণ্ঠে টেনে টেনে বললেন, তিন বছর। হঠাৎ ভাবমূর্তির পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

জরিকে না বলা অনেক জমানো কথা ছিল কিন্তু জরির বাবার ভাবমূর্তির পরিবর্তন জরির সঙ্গে দেখা বা কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলো। মনে মনে বললাম, মাছ জাল ছিড়ে পালাতে পারে কিন্তু পুকুর ছেড়ে পালাতে পারে না।

বর্ষাকালে পুকুর পানিতে ডুবে গেলে মাছ পুকুর ছেড়ে পালাতে পারে এটা তখন ভাবিনি। পুলিশ একাডেমিতে আসার পর বুঝলাম জরির বর্ষাকাল এসেছে। তার বাবা আমার হৃৎপি-ের প্রকোষ্ঠ থেকে তাকে সরকারি কলেজের প্রভাষকের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। চাকরি পেলাম ঠিকই কিন্তু সুনির্দিষ্ট সময়ের আগে বিয়ের সরকারি অনুমোদন না থাকায় কাঙ্ক্ষিত নারীকে হারালাম। অনেক দুঃখ-কষ্ট পেলেও, একাডেমির সার্বক্ষণিক নানামুখী প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে করতে অনেক সময় ভুলে থাকি। বাকি সময় ‘কপালে নেই ঘি ঠকঠকালে হবে কি?’ ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিই।

হতাশাযুক্ত ঘটনার পর মোবাইলের সিম কার্ড বদলে ফেলি। নিজেকে নতুনভাবে, আইনানুগ জীবন গড়ার চেষ্টায় রত আছি। সাধারণ জনগণের জীবনের সঙ্গে পুলিশ জীবনের পার্থক্য ব্যাপক। এখানে এসে উপলব্ধি করলাম। আগে নিজেকে প্রেমিক ভাবতাম কিন্তু বর্তমানে ভাবি একজন পুলিশ অফিসার।

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি

সারদা, রাজশাহী থেকে

তুমি-আমি

তুমি সমুদ্র, আমি অরণ্য।

তুমি অমিত, আমি লাবণ্য ।

তুমি স্রোত, আমি ধারা ।

তুমি আলী যাকের, আমি সারা ।

তুমি ভূগোল, আমি ইতিহাস ।

তুমি পারু, আমি দেবদাস ।

তুমি র‌্যাব, আমি গ্রেফতার ।

তুমি রামেন্দু, আমি ফেরদৌসী মজুমদার ।

তুমি বেসুর, আমি সুর ।

তুমি নাগরিক আতাউর রহমান, আমি আসাদুজ্জামান নূর ।

তুমি শ্মশান, আমি কবর ।

তুমি মোহাম্মদ নাসিম, আমি লুৎফুজ্জামান বাবর ।

তুমি বোকা, আমি ধোকা ।

তুমি নাগরিক, আমি নগরপাল খোকা ।

তুমি চিপস, আমি পপকর্ন ।

তুমি হুমায়ূন, আমি শাওন ।

তুমি থুজা, আমি আর্ণিকা ।

তুমি ক্লিনটন, আমি মনিকা ।

তুমি সুমন, আমি সাবিনা ইয়াসমিন ।

তুমি সৈয়দ হক, আমি তসলিমা নাসরিন ।

তুমি জিলাপি, আমি চমচম ।

তুমি সুচিত্রা, আমি উত্তম ।

তুমি গজা, আমি খাজা ।

তুমি মায়া, আমি রাজা ।

তুমি ইউনূস, আমি শাইখ সিরাজ চ্যানেল আই ।

তুমি নোবেল বিজয়ী, আমি হতে চাই ।

তুমি উত্তেজনা, আমি কোলাহল ।

তুমি ক্রিকেট, আমি ফুটবল ।

তুমি বাব্বা, আমি মাগো ।

তুমি হায়গো, আমি ওগো ।

তুমি ক্লোজআপ, আমি কোলগেট ।

তুমি রোমিও, আমি জুলিয়েট ।

তুমি বাংলা, আমি হিন্দি ।

তুমি টিপ, আমি বিন্দী ।

তুমি সুপার্ব, আমি সরি ।

তুমি লেখো, আমি পড়ি ।

তুমি হজমি, আমি টফি ।

তুমি চা, আমি কফি ।

তুমি ওকে, আমি ফাইন ।

তুমি অনিয়ম, আমি আইন ।

তুমি গুড়, আমি চিনি ।

তুমি হুলো, আমি মিনি ।

তুমি মাছ, আমি মাংস ।

তুমি বৃষ্টি, আমি ধ্বংস ।

নাম-ঠিকানাবিহীন

লেখককে তার নাম ও ঠিকানা

জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো

ফিড়ার মোড়

মমিনুল হক তালুকদার

এখন থেকে প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগের ঘটনা । ঘটনার শহর নাটোর । আমার প্রেমের শহর । ঘটনাটা এসএসসি পরীক্ষার পরের । প্রাণের বন্ধু, খালাতো বোন বিউটি সেন । সেও পরীক্ষা দিয়েছে ।

এক দিন ওদের বাড়ির কাছে বিগত যৌবনা অতি ক্ষীণাঙ্গী ইতিহাসখ্যাত রানীভবানী নদীর পাড় দিয়ে চৌধুরীদের আম বাগানের দিকে হাটছিলাম । সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে নবযৌবনা তখন রাত । উপরে আকাশ জুড়েই যেন চাদ । মায়াভরা নেশা ধরা তরল জোছনা আমাকে এমনিতেই মাতাল করে তুলছিল । পাশে প্রিয় সাথী আর দক্ষিণা বাতাস এবং ভালোবাসা বয়স । বিউটি হঠাৎই আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললো, চলো, বাড়ি যাই ।

ওর হাতটা মুঠোর মধ্যে পেয়ে গাঢ় করে ধরে বললাম, আমি আর বাড়ি যাবো না রে । আমার হাতের মুঠোয় চাদ যে! আকাশ হয়ে গেছি । বলো, আর কি বাড়ি ফেরা সম্ভব? একটা বাড়িতেই চাদ, আকাশ এতোসব ধরবে কি করে!

ও বললো, হাতটা ছাড় । ব্যথা লাগছে ।

বললাম, সুখ লাগছে তো!

ও হেসে বললো, সেটাও ঠিক। ধন্যবাদ, বলে ওকে জড়িয়ে ধরতেই কেমন ঐশী উচ্চারণে ফিশফিশিয়ে বললো, ফাজলামিটা কিন্তু খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আজ এখন এটা মোটেও ফাজলামি না। দোস্ত, এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালোবাসামি।

প্রগাঢ়ভাবে ও বললো, সত্যি বলছিস!

বললাম, সত্যি কিরে। হৃদয় ভরে ভালোবাসছি। তুইও বাস। তাহলেই লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ– অমর প্রেম।

যে জায়গাটাতে দাড়িয়ে আমাদের জীবনের সেই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ উদযাপন করেছিলাম, জীবনের সেই শ্রেষ্ঠতম স্মৃতির মন্দিরটা ছিল পশ্চাৎপদ জংলা ধরনের এক চৌরাস্তার মোড়। তখন ছিল অখ্যাত। নামবিহীন। এখন তা বিখ্যাত। নামকরণও হয়েছে। পাড়ার রসিক যুবকরা দেয়ালে লিখে রেখেছে ফিড়ার মোড়। আর আমার সেই প্রেমিকা। এখন আমার স্ত্রী। আমার একমাত্র সন্তানের মা।

কিন্তু দুঃখজনক এই যে, বহুদিন পর ওই রাস্তার ওই মোড় দিয়ে তাকে নিয়ে কয়েকবার ডাক্তারের কাছে যেতে-আসতে হলো। কারণ সে সম্পূর্ণ প্যারালাইজড এবং নির্বাক। সে কিছু বলে না। আমাদের জীবনের বিশেষ বাকের জন্মস্থান ওই প্রিয় মোড়টা সে চিনতে পারে না। আমাকে চেনে না। নিজের নাড়িছেড়া ধন প্রাণপ্রিয় সন্তানকেও চেনে না। কথা বলে না। যে কদিন ফিড়ার মোড় দিয়ে গেলাম-এলাম প্রতিদিন দেখলাম, উদোম শরীরে শুধু নেংটি পরা একজন লোক ঝড়-বৃষ্টি-বাদল-শীত-রোদ উপেক্ষা করে পরম শান্তিতে ছোট্ট পিড়িতে বসে আছে নির্বিকার চিত্তে। কি সুখে, কিসের টানে মোহগ্রস্ত হয়ে ঠায় বসে থাকে পিড়িতে, কে জানে! মোড়ের ওইটুকু সীমানায় তার জীবন পৃথিবী।

এই মোড়টাকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের বিশেষ একটা ঘটনার স্মৃতির চেয়েও অনেক বড় কোনো ঘটনায় সে হয়তো তার হৃদয়ের সর্বস্ব হারিয়েছে এই অচল আয়তন মোড়ে। প্রাচীনতম আসন ব্যবস্থার পিড়িই তার সার্বক্ষণিক সিংহাসন। এই মোড় তার রাজ্য এবং রাজসভা। তার ভালোলাগা ভালোবাসা।

লোকটাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করলাম কৌতূহলবশত, ভাই তুমি সব সময় এখানে পিড়িতে বসে থাকো

কেন? কয়েকবার জিজ্ঞাসা করার পর চরম বিরক্তি নিয়ে হাতের পেপারটা দেখিয়ে বললো– আমি কি ত্রি– উঃ আঃ (অর্থাৎ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, ফখরুদ্দীন আহমদ এবং মইন উ আহমেদ) যে সিংহাসনে বসে থাকবো!

তার এ কথায় চমকিত হয়ে বললাম, তাদের ব্যাপারে তোমাকে খুব নাখোশ মনে হচ্ছে।

একটু হেসে, একটু কেশে খানিকটা জ্ঞানী-গুণীর মতো করে বললো– আরে ভাই, আমি তো নিজে একা এই মোড়ে বসে থাকি। কাউকে ধসিয়ে-বসিয়ে দিইনি। তাতেই এতো কথা, এতো প্রশ্ন! আর উনারা (ত্রি– উঃ আঃ) যে গোটা দেশ-জাতিকে বসিয়ে দিচ্ছে। জনগণকে উর্ধ্বমূল্যের চাপে উঃ আঃ করিয়ে ছাড়ছে...।

এরপর আমার মন ভারি হয়ে উঠতে লাগলো। আমার স্ত্রী-সন্তান-জীবন-সংসার ধসে বসে যাচ্ছে। দেশ-জাতির ভবিষ্যৎও সত্যি সত্যিই ধসে পড়ছে না তো! নাকি গোটা দেশ-জাতিই আজ ফিড়ার মোড়? আর আমরা জনগণ সবাই ওই আগত ফিড়ারোহী। সন্তানের শিক্ষা ব্যয় গগনচুম্বী। স্ত্রীর চিকিৎসা খরচ ধরাছোয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। দুর্নীতির সুযোগহীন ছোটখাটো চাকরি করি। স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর মোটা চালের দর কেজিপ্রতি চল্লিশ টাকা। তবুও ভালোবাসা ছিল, আছে এবং থাকবে। তাই তো আসছে ভালোবাসা দিবসে অসুস্থ স্ত্রীকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানাতে যাবো। ফিড়ার মোড়ের পিড়ারোহীকেও বলবো– আই লাভ ইউ ম্যান।

তারপর তার পাশে নিজেও পিড়ি নিয়ে বসে যাবো। পাড়ার রসিক যুবকরা হয়তো এবার নতুন করে লিখবে– জোড়া ফিড়ার মোড়। তারপর হয়তো দেশ জুড়েই, ফিড়ার মোড় জিন্দাবাদ।

পারনওগা (দক্ষিণ), নওগা থেকে

একই সমান্তরালে

আহমেদ আব্বাস

তুই কখন আইছিস।

এই তো, অনেকক্ষণ ধরে তোর জন্যে অপেক্ষা করছি ।

চল, এখানে না, দক্ষিণ দিকে যাই । বড় বড় শটিগাছের ওতে (আড়ালে) । ওই জাগায় গেলে কেউ সহজে দেখতে পাবে না । এক অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে কাপতে কাপতে আমি নার্গিসকে অনুসরণ করি । গাছ গাছড়ার আড়ালে একটু ফাকা জায়গায় দুজনে বসে পড়ি । একে অপরের দিকে কিছু সময় অপলক চেয়ে থাকি । কি জন্যে দুজনের নির্জনে সহমিলন, দীর্ঘদিন ধরে কামনা করলেও মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলতে পারিনে ।

নার্গিস ব্লাউজ পরে আছে । ওড়নাবিহীন । নিচে পেটিকোট, এভাবে এ পোশাকই প্রায় সময়ই পরে সে । এখন ওর ঘন মোটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্রমেই স্ফীত গম্বুজ সদৃশ বুক দুটো বার বার দুলছে আর ব্লাউজ উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে ।

সন্ধ্যার আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদে আমাকে বলে, এই ছোড়া কিছু কইস না কি জন্যে । যা বলবি, করবি, তাড়াতাড়ি কর ।

তুই ক, আমার ভয় করে ।

তুই বুঝিস না তোক কি জন্যে আসতে কইছি । আমার কাছে আয় বলে, আমার গালে ওর ওষ্ঠাধর মিলিয়ে বেশ জোরে কামড়ে দেয় এবং ক্রমশ বিবসনা হতে উদ্যত হয় । কিন্তু ভয় ও উত্তেজনায় আমি ভীষণভাবে কাপতে থাকি । ইচ্ছা হয় ওর ওখানে হাত রাখি, আদর করি, বুকে জড়িয়ে তীব্রভাবে আলিঙ্গন করি । ক্রমাগত আনন্দসুধায় নিমজ্জিত হই । পনের বছরের আনকোরা জীবনের যতো জিজ্ঞাসা, যতো দিদৃক্ষা এবং সর্বোপরি লালিত ইন্দ্রিয় জিগীষার অবসান ঘটিয়ে ফেলি । কিন্তু টেনশন এবং সেনসেশনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই । পরিবারে কঠোর রক্ষণশীলতার কারণে বাইরে কারো কাছে এসব বিষয় জানার ফুরসত হয়নি । অথচ ওর কথা মনে পড়লে শরীরের তাপ বেড়ে যায় । ওর কথা ভেবে কত বিনিদ্র রজনী পার করেছি । শৈশব-উত্তর বয়স থেকেই আঠার মতো ওর পেছনে লেগে থেকেছি । ওযে আমার পাশের বাড়ির ময়না ।

তখন সন্ধ্যার আলো-আধারি ভাবটা কেটে গেছে । গ্রামের হাট থেকে ফিরছিল পড়শি মোক্তার মামা, আমাদের অনুভূতির চাপা প্রকাশ তার কানে পৌছে, বাগানের ওপাশে কে রে ।

কেউ না মামা, কণ্ঠস্বর শুনে প্রত্যুত্তর দিই ।

রাতের বেলা তুই ওটি (ওখানে) কি করিস ।

কিছু না মামা, বলতেই সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, নার্গিস দৌড় দিতে গিয়ে জমির আলপথ খুজে না পেয়ে সোজা ছুটে পালায় ।

ঠিক আছে আগামীকাল শুক্কুরবার । নামাজের পর বটগাছের তলা মসজিদের মানুষের কাছে সালিশ দিব ।

না মামা আমার দোষ নাই, ও ছাগল খুজতে আইছিল, বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করি ।

দেড় মাস পেরিয়ে গেছে । মামা আর সালিশ ডাকেনি, নার্গিসের সঙ্গে দেখাও নেই । ও মামাবাড়ি গেছে । কিন্তু ওর জন্যে ভীষণ মন খারাপ লাগে । দেখতে ইচ্ছা করে । কথা বলতে ইচ্ছা করে ।

এক দিন দুপুরবেলা বাড়ি থেকে টিফিন খেয়ে স্কুলে যাচ্ছিলাম দুপুর দুটোর দিকে । সে সময় পথঘাট ফাকা ফাকা হয়ে যায় । মানুষের চলাচল কমে যায় ।গ্রামের মানুষদের মনে হয় মধ্যাহ্ন বিরতি । বাগান পেরিয়ে সামনে যাই । যেতে যেতে মনে পড়ে । পেছন ফিরে সেদিনের ওই স্থানটির দিকে দৃষ্টি দিই । মনে হয় শেওড়া গাছের পাতাগুলো নড়ে উঠলো । এবং আবার । পুনর্বার ।

আমি থেমে গেলাম । একটু আড়ালে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, দেখলাম । নার্গিস এবং মোক্তার মামা ওখান থেকে বের হয়ে দুজন দুদিকে কেটে পড়লো । মনটা খারাপ হয়ে গেল । খুব খারাপ ।

ঘৃণা । দুজনের প্রতি ভীষণ ঘৃণা হলো ।

চলনবিল, নাটোর থেকে

আমরা এগারোজন

সাজবীর

আমাদের গ্রুপের অঘোষিত লিডার এবং প্রাণকেন্দ্র মুন্না । মেয়েদের ব্যাপারে সে বরাবরই নেগেটিভ ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কি না একটি মেয়ের প্রেমে পড়লো। আমার ভাবতেও ভীষণ অবাক লাগে। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা নিতান্ত একটি অহেতুক জিনিস ছিল যার কাছে, সে যে কিভাবে প্রেমে পড়লো তা শুধু প্রেমই জানে।

পারেসুল, যাকে আমরা বিশ্ব ছ্যাক খাওয়া প্রেমিক নামে ভূষিত করেছি, সে এবার হ্যাপির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার এবং হ্যাপির মধ্যেকার সম্পর্ক কখনো ভালো, কখনো খারাপ– এভাবে চলছে। যদিও এর পেছনে রয়েছে পারেসুলের অদম্য শ্রম, নিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লজ্জাহীনতা। কিন্তু সে যে আজো কি দুঃখে অদ্ভুত মস্তিষ্কের (খানিকটা!) হ্যাপির পেছনে চুইংগামের মতো লেগে রয়েছে তা আমার দুর্বল মস্তিষ্কে ধরে না।

সুন্দরী মেয়ে মানেই ফর্শা মেয়ে– এ নীতিতে বিশ্বাসী সজীব (যাকে আমরা জামাই বলে ডাকি, কারণটা বলা যাবে না) যথারীতি এবারো খুব ফর্শা একটি মেয়েকে পছন্দ করেছে (ধবল রোগী বলে সন্দেহ হয়)। সে এখন মেয়েটিকে নানাভাবে ইমপ্রেস করার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু মেয়েটি তাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না।

নিজের কপালকে 'কুফা' বলে দাবিকারী জিহানের প্রথম পছন্দ ছিল যে মেয়েটি খোজ নিয়ে জানা যায়, সে তার চেয়ে বয়সে সিনিয়র। সেবার ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন উদ্যমে আরেকজনকে পছন্দ করার পর জানা যায় সেই মেয়েটি অন্য ধর্মাবলম্বী। তবে ইদানীং জিহানের মুখে 'ভালোবাসা মানে নাকো কোনো ধর্ম, বর্ণ' ইত্যাদি টাইপ কথা শোনা যাচ্ছে।

গোপন প্রেমে বিশ্বাসী অঙ্কন। বন্ধুদের সবার অজান্তে সে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে চলেছে। কিন্তু বেচারা বোধহয় ঔপন্যাসিক শংকরের 'ধোয়া, টাকা আর প্রেম কিছুতেই ঢেকে রাখা যায় না, ঠিক ফুটে বেরুবেই' কথাটি জানে না। জানলে সে আমাদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখতো না। যাই হোক ঔপন্যাসিক শংকরের কথামতো বেচারা অঙ্কনের গোপন বিষয়টি আমাদের কাছে যথারীতি ফাস হয়ে যায়।

মেহরাজ, প্রেম ঘটিত ভালোবাসায় সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী। সে একটি মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন চুটিয়ে প্রেম করে। তার প্রেমের কাহিনী শুনে শুনে আমাদের অনেকেই তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। কিন্তু ইদানীং তার কণ্ঠে, 'পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই' টাইপের গান শোনা যাচ্ছে। ব্যাপার কি?

একজন স্থায়ী প্রেমিকা রেখেও নিয়মিত মোবাইলে টাংকি মেরে যাচ্ছে সৌরভ। তার মতে, 'স্থায়ী প্রেম করবো একজনের সঙ্গে, টাংকি মারবো সবার সঙ্গে'। আমি বুঝতে পারছি না এটি কি চতুর্মুখী প্রেম নাকি ফোর টোয়েন্টি কাজ-কারবার।

অনেক দেখেশুনে বাছাই করে কোনো মেয়েকে মন দেয়ায় অভ্যস্ত জাকি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ওই মেয়েকে অফার করার আগেই জানা যায় মেয়েটি দুই নাম্বার। অর্থাৎ... বেচারা এখনো তার কাঙ্ক্ষিত মনের মানুষকে খুজে বেড়াচ্ছে।

যে সুন্দর চেহারার এবং সুন্দর ফিগারের মেয়ে দেখলেই তাকে ভালোবাসতে চায় সে হচ্ছে রবিন। যদিও সে চেহারার চেয়ে ফিগারকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। সেও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মতো মনে করে ‘প্রেম শুধু ফাকি প্রলাপ, দৈহিক প্রয়োজন।’

প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে এবং সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করতে ভালোবাসে হিমাদ্রী। সে মেয়েদের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করার মধ্যেই ভালোবাসা খুজে পায়। তবে এটা ঠিক যে, সে তার মিথ্যা কথার ঝুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যে কোনো মেয়েকে পটাতে পটু, ফলস্বরূপ আমাদের ঈর্ষার পাত্রে নিজেকে পরিণত করা।

এবং সবশেষে আমিই সে নরাধম যে এতোক্ষণ ধরে বন্ধুদের ভালোবাসার পোস্টমর্টেম করলাম। আমার ভালোবাসাটা একটু অন্য ধরনের। আমি চুপচাপ থাকতে ভালোবাসি। আমি পুশকিনের সঙ্গে একমত– ‘ভালোবাসা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, এ ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় না।’ এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, আমি কি কোনো মেয়েকে ভালোবাসি? হয়তো ভালোবাসি হয়তো বা বাসি না।

ঈদগা, চট্টগ্রাম থেকে

উড়ো চিঠি

সাব্বির

হঠাৎ করে চিঠিটা এলো। উড়ো চিঠি, কোনো নাম-ঠিকানা নেই। আধুনিক যুগে চিঠির তেমন প্রভাব নেই। এখন সব যোগাযোগ মোবাইলে করতে পছন্দ করে মানুষ। এখন সাধারণত উড়ো চিঠি আসে না। আসে ‘উড়ো ফোন’। আমার এ ছোট্ট জীবনে কোনো চিঠিই পাইনি। আর আজ প্রথম যা পেলাম, তা-ও আবার উড়ো চিঠি!

কে দিতে পারে এ চিঠি? এখনো খুলিনি। খোলার আগে একটা ধারণা করি। কে কে দিতে পারে? আমার বন্ধু কেউ নয়। কারণ কোনো বন্ধুই আমার কাছে এখনো প্রকৃত বন্ধু নয়। সেটা আমি বুঝি।

তবুও সবার সঙ্গে চলতে হয় স্রেফ বন্ধুত্ব বজায় রাখতে। এছাড়া বাকি থাকে আত্মীয়স্বজন। তাদের সবার সঙ্গেই আমার মোটামুটি যোগাযোগ আছে। তবে তা মোবাইলে। তাদের কেউ আমাকে উড়ো চিঠি পাঠাবে বলে মনে হয় না।

আমার সঙ্গে কারো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তাই মেয়েরাও বাদ। নাহ এখন মনে হচ্ছে, ভুল করে কেউ আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। হয়তোবা পরিবারের অন্য কেউ এর প্রাপক।

হঠাৎ মাথায় একটা কিছু পড়ি পড়ি করছে। নাহ মনে পড়ছে না। আমার মনে হয় কোনো ভুল রয়েছে। কিন্তু চিঠিতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আমার নাম ও ঠিকানা। সিওর হওয়া ছাড়া খুলতে বা পড়তে ইচ্ছা করছে না এ চিঠি। হতে পারে চিঠিতে কোনো দুঃসংবাদ থাকতে পারে। আমার কাছে তো আবার সুখের ঘটনা আসে না বললেই চলে। আমার জীবনটা দুঃখ বিলাসী। সব মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত থাকে। অর্থাৎ নিরামিষ। কিন্তু আমার জন্য তা দুরামিষ। জীবনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো ভালো বন্ধু পাইনি। সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে চললেও সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। আর প্রেম! সে তো অনেক দূর।

হ্যা, গত বছর যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি তখন অনেক সাহস করে অফার করলাম আফরিনকে। কিন্তু সেই অফারেই প্রেমের ইতি। তার পাচ আঙুল এখনো মনে হয় আমার গালে আঘাত করছে। এর পর থেকে আমার জন্য ভালোবাসা ভালো নয় মেনে নেই। এ সত্য এখনো মেনে চলি। এখনো যদি কলেজে আফরিনের সঙ্গে দেখা হয় কান্না আসে। কিন্তু আমার আবেগ দেখানো ভালো লাগে না। তবুও! আমিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ।

নাহ। চিঠিটা পড়বো না। ওটা পড়ে থাক। মন ভালো নেই। এমনিতে মন কখনো ভালো থাকে না। তার ওপর আজ আরো মন খারাপ। কারণ কলেজে আজ আফরিন আমাকে নোট সংগ্রহ করে দিতে বলেছে। আমি খুব অবাক হলাম ওর সহজ ভাষায় নোট চাওয়ার কথা শুনে। কারণ আমার সঙ্গে সে কোনো দিন কথা বলেনি। নিশ্চয়ই আমাকে নতুনভাবে অপমান করতে চাইছে। আমি অবশ্য এড়িয়ে গিয়েছি।

মোবাইল ফোনের বাজনা শুনে ভাবনায় ছেদ পড়লো। এতো রাতে আমার কাছে কে ফোন করলো?

হ্যালো।

কেমন আছেন? চমকে উঠলাম মেয়েলি গলা শুনে। মিষ্টি কণ্ঠস্বর। নিশ্চয়ই প্রেমিকের কাছে করতে গিয়ে ভুলে আমার নাম্বারে করেছে।

আপনি বোধ হয় ভুল... ।

না ।

আমাকে প্রশ্নটা শেষ করতে দিল না ।

আমি আপনাকে করেছি । চিঠিটা পেয়েছেন ।

আপনি কে? বুঝতে পারলাম উড়ো চিঠির মালিক উনি ।

চিনতে পারেননি?

না! মানে... ও! আপনি? এ রকম বিস্মিত জীবনে হইনি ।

হ্যা, আফরিন ।

চিঠি আপনি দিয়েছেন?

বুঝতে পারলাম চিঠি পড়েননি । থাক পড়া লাগবে না । শুনুন, আমি গত বছরের ঘটনার জন্য দুঃখিত । তবে এখন আমার একটি কথা রাখবেন । তা হলো আমি আপনাকে ভালোবাসি । আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না । এতোটুকু বলেই লাইন কেটে দিল ।

বিস্ময়ের ধাক্কা পুরোপুরি কাটার আগেই মেসেজ এলো, আই লাভ ইউ ।

চিঠিটা হাতে নিলাম । খুব ইচ্ছা করছে পড়তে । কিন্তু পড়বো না । কারণ পড়লেই মজা শেষ । পরে এক সময় পড়া যাবে ।

হতে পারে আমাদের বাসর রাতেই!

ফেনী থেকে

অসহায়

সোনা

আজ কেন জানি বেশি বেশি মনে পড়ছে বাবার কথা। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে বাবা, তুমি কেন বিদায় নিলে?

বাবাকে হারিয়ে সত্যিই আমি দিশেহারা। বাবা যদি বেচে থাকতো তাহলে এ অবুঝ মেয়ের মনের কথা অনুভব করতে পারতো। আমার মনের কষ্টটুকু বুঝতে পারতো। বিধাতাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে– কেন আমার বাবাকে কেড়ে নিলে এবং আমাকে এতিম বানালে? এ এতিম মেয়েটার অনেক জ্বালা, এটা হয়তো বিধাতা বোঝে। কিন্তু বিধাতার তৈরি মানুষগুলো বোঝে না।

বাবা, তুমি আমাদের মধ্যে ফিরে আসো। তোমাকে ছাড়া থাকতে আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। আমি যদি আগে জানতাম বাবাকে হারাতে হবে তাহলে কোনোদিন বাবার ওপর অভিমান করতাম না। কোনোদিন বাবাকে ভুল বুঝতাম না। রাগ ও অভিমান করে কতোদিন বাবাকে বাবা বলে ডাকিনি। আজ বাবা নেই, বাবাকে বড়ই ডাকতে ইচ্ছা করে। বিধাতার এ কেমন নিয়ম-নীতি, সারা পৃথিবী খুজেও বাবাকে পাবো না। আমি আজ বড় অসহায় বাবা। তোমাকে কোথায় খুজে পাবো? তুমি একবার আমাকে বলে দাও। আবারো বলছি, বাবা, আজ আমি বড়ই অসহায়। সবার বিপদে বাবা আসে, আমার বিপদে কেন তুমি আসো না?

তোমাকে আমি ডাকি। তুমি কি আমার ডাক শুনতে পাও না। তুমিও কি আমার মতো অভিমান করেছো? আমি না হয় অবুঝ ছিলাম, তাই অভিমান করেছি। তুমি কেন অভিমান করবে? তুমি তো আমার মতো অবুঝ নও।

তোমার জ্ঞান আছে। আমি তো জ্ঞানহীন ছিলাম, তাই তো তোমাকে দুঃখ দিতে পেরেছি।

মারা যাওয়ার আগে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারিনি বাবা, কারণ তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে।

আমার জন্য এটা যে কতো কষ্টের তা তোমায় বোঝাতে পারবো না।

পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

তোমার ক্ষমাটুকু আমার চলার পথে পাথেয় হবে।

বগুড়া থেকে

নিঃস্ব

আমার একটি গোলাপ ছিল। সেই আধো ফুটন্ত থেকে একে আমি যত্ন-আত্তি করে আসছি। দেখতে অন্যান্য গোলাপের মতো খুব সুন্দর না হলেও গোলাপ গোলাপই। এর সুবাস আমাকে অজানা ভালো লাগায় আচ্ছন্ন করতো। এর মসৃণ পাপড়ি স্পর্শ করে আমি বিমোহিত হতাম। দেখতে দেখতে গোলাপটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হলো। এবার এর সুবাস শুধু আমি না, অন্য আরো অনেকে উপভোগ করতে চাইলো। আমি না করলাম না। ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকার সবারই আছে। আর ফুলের ধর্ম হচ্ছে নিজের সৌন্দর্য দিয়ে অন্যকে মোহিত করা। এতে আমার আপত্তি করার কিইবা আছে? দূর থেকে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে কেউ যদি আনন্দ পায় তাহলে সেটা আমার গোলাপেরই কৃতিত্ব। ভুলটা এখানেই করলাম। হঠাৎ করে এক দিন কেউ একজন আমার গোলাপটা দুমড়ে-মুচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে চলে গেল। তার ক্ষত-বিক্ষত দেহটা দেখে আমার দুই চোখ জুড়ে শ্রাবণের বর্ষণ হলো। এরপরও বিবর্ণ এ গোলাপটাকে আমি নতুন করে প্রাণ দিতে চাইলাম। নিজের বুকের ভেতর এর সুবাস মাখতে চাইলাম। বললাম, তুমি আমার কাছে ঠিক আগের মতোই আছো। এখনো ঠিক সেদিনের মতো তোমার সুবাস আমি পাচ্ছি। তুমি গতকাল যেমন ছিলে, আজো আছো এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সে আমাকে ফিরিয়ে দিল। তাকে রক্ষা করতে না পারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে এ শহরে এখন আমি নিঃস্ব, অসহায় জীবনযাপন করছি। বহন করে বেড়াচ্ছি তার সুবাসিত সুখস্মৃতি। হয়তো এভাবেই চলে যাবে অনাগত দিনগুলো।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

ম্রা

মেহেদী হাসান

অনেক দিন ধরে প্ল্যান করছিলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে উচু দুই পাহাড় কেওক্রাডং আর তাজিনডংয়ের চূড়ায় উঠবো। কিন্তু বন্ধুদের সবার সময় একসঙ্গে মিলছিল না। শেষে গত ফেব্রুয়ারিতে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রওনা দিলাম তিন বন্ধু। পাপ্পু, উজ্জ্বল আর আমি। ঢাকা থেকে বান্দরবান। সেখান থেকে রুমা বাজার। প্রথমে চান্দের গাড়িতে (এক ধরনের জিপ) করে আড়াই ঘণ্টা যাত্রা, তারপর নৌকায় আরো দুই ঘণ্টা চলার পর বান্দরবান থেকে রুমা বাজার পৌছলাম। সেখান থেকে গাইড ভাড়া করলাম। নাম লারাম।

তারপর আর্মি ক্যাম্পে নাম লিখিয়ে বিপদসঙ্কুল পথ বেয়ে যাত্রা করলাম বগালেকের উদ্দেশে। সেখানে পৌছে উচু একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করলাম। তারপর ঢাল বেয়ে নেমে এলাম বগালেকের পাড়ে। উচু পাহাড়ে ঘেরা অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বগালেকের পাড় ধরে শ্রান্ত দেহে হাটছিলাম তিনজন।

হঠাৎ প্রচ- শক খেয়ে দাড়িয়ে পড়লাম। একটু দূরে বগালেকের পানিতে পা ডুবিয়ে একটা মেয়ে বসে আছে। উদাসভাবে দূরে কোথাও তাকিয়ে সে। পড়ন্ত বিকালে পাহাড়ের ফাক গলিয়ে আসা আলো আর আধারি মিলিয়ে তার চারপাশে এক অপার্থিব সৌন্দর্য তৈরি করেছে। দুই বন্ধু উজ্জ্বল আর পাপ্পুও দাড়িয়ে গেছে বিহ্বল হয়ে।

গাইড লারামের ডাকে সংবিৎ ফিরলো আমাদের। সে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। বগালেকের পাড়ে বোম সম্প্রদায়ের একটা পাড়া আছে। সেখানে সিরাম নামে এক মহিলা কয়েকটি ঘর তৈরি করেছেন টুরিস্টদের জন্য। তারই একটায় রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে রওনা হলাম কেওক্রাডংয়ের উদ্দেশে। উচু উচু পাহাড় বেয়ে দীর্ঘ হাটা পথ। চারদিকে বাতাসের শো শো শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। নিচে, অনেক নিচে শাদা শাদা মেঘ।

এভাবে ঘণ্টা দেড়েক চলার পর উচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা বোম পাড়ায় এসে পৌছলাম। লারাম পাড়ার বললো, হারামন। যার অর্থ শাদা চিংড়ি। ঠিক হলো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো এখানে। সঙ্গে আনা বিস্কিট আর পানি খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি। গতকাল বগালেকের পাড়ে যাকে দেখেছিলাম। আজো সে উদাসভাবে দূরের এক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্য পাহাড়িদের মতোই তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, কিন্তু চোখ, নাক অন্য পাহাড়িদের থেকে অনেক সুন্দর। তার বসে থাকায় অদ্ভুত এক উদাসী ভঙ্গি রয়েছে। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু

সমস্যা হলো এদিকের পাহাড়িরা কেউ বাংলা বোঝে না। অগত্যা লারামকে ডেকে মেয়েটা সম্পর্কে একটু সাবধানে জিজ্ঞাসা করলাম। তাতেই বেরিয়ে এলো এক গভীর বেদনার কাহিনী।

মেয়েটার নাম ম্রো। সে এ হারামন পাড়ারই বাসিন্দা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সে বান্দরবান মহিলা কলেজে পড়াশোনা শেষ করে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিনের জন্য। তারপরই তার জীবনে ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

বগালেক পাড়ার এক পাহাড়ি যুবকের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ছেলেটা প্রথম যৌবনে শান্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। নিজের পরিবার আর ম্রোর চাপাচাপিতে কিছুদিন পর ফিরে আসে সে। কিন্তু ততো দিনে শত্রু তৈরি হয়ে গেছে তার। এক দিন ইউনিভার্সিটির ছুটিতে বাড়িতে আসা ম্রোর সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছিল ছেলেটা, তখন শান্তি বাহিনীর একটি গ্রুপ অতর্কিত আক্রমণ করে মেয়েটার চোখের সামনেই ছেলেটাকে মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। সেই থেকে বদলে গেছে ম্রো।

পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে পরিবারের বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলা, মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে চিরতরে। সারাদিন এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ায়। ম্রো আর তার ভালোবাসার ছেলেটার গল্প পাহাড়িদের মুখে মুখে ফেরে। ম্রোর মা-বাবাকে দেখলাম। তার বাবা এ পাড়ার কারবারি (গোত্র প্রধান)। অল্প বাংলা বোঝে, অল্প বিস্তর বলতে পারে। আমরা আমাদের সহানুভূতি জানিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

দীর্ঘ যাত্রা শেষে এরপর কেওক্রাডং জয় হলো, কিন্তু অদ্ভুত কিছু কারণে লারাম তাজিংডং যেতে কোনোভাবেই রাজি হলো না। অগত্যা ফিরতি পথ ধরলাম আমরা।

যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে না গিয়ে লারাম আমাদের অন্য পথ ধরে ফিরিয়ে নিয়ে চললো। একটা ছড়ার (ছোট ঝরনা) কাছে এসে ছোট বাথরুম পেয়ে গেল আমার। ওদের এগিয়ে যেতে বলে দাড়িয়ে পড়লাম এক কোণে। কিছুক্ষণ পর আমি আবার হাটতে শুরু করলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝলাম ভুল ট্রেইলে চলে এসেছি, সামনে ওদের কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। নিজেই খুজে পাবো ভেবে কয়েকবার এদিক-ওদিক বৃথাই হাটলাম। তারপর কোনো উপায় না দেখে উচ্চস্বরে ওদের নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার।

পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো আমার কণ্ঠস্বর। কিন্তু ওদের কোনো সাড়া পেলাম না। এদিকে বিকাল হয়ে এসেছে, যে কোনো সময় ঝুপ করে নামবে সন্ধ্যা। আমার পিঠে ঝোলানো ব্যাগে গরম কাপড় চোপড় আছে। কিন্তু এদিকে রাত কাটানোর কথা ভাবতেই আমার অস্থিরতা বাড়তে লাগলো।

সরু পথ দিয়ে হাটছিলাম সাবধানে, পাশে গভীর খাদ । পা হড়কালেই হাজার ফিট নিচে হারিয়ে যেতে হবে । চলতে চলতে হঠাৎ করে একটি ফাকা জায়গায় এসে পড়লাম । দেখি গাছে হেলান দিয়ে একটি পাহাড়ি মেয়ে দাড়িয়ে আছে ।

আমি এক দৌড়ে তার কাছে গিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে লাগলাম, পথ হারিয়ে ফেলেছি । কয়েকবার বগালেক শব্দটা উচ্চারণ করে তাকে আমার গন্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করলাম । মেয়েটা এতোক্ষণ বড় বড় চোখ করে আমার কা-কারখানা দেখছিল । হঠাৎ সে পরিষ্কার বাংলায় বললো, পথ হারিয়ে ফেলেছেন?

আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি মেয়েটা আর কেউ নয়– ম্রো ।

আমি শুধু ওপরে-নিচে মাথা ঝাকালাম । সে বললো, আমার সঙ্গে আসুন ।

আমি বিহ্বলের মতো তার পেছন পেছন হাটতে থাকলাম । কিছুক্ষণ পর দেখি একটা উচু মতো জায়গায় এসে দাড়িয়েছি । দূরে, অনেক নিচে বগালেকের ঝকঝকে পানি দেখা যাচ্ছে । হঠাৎ চিৎকার শুনে পাহাড়ের নিচে তাকিয়ে দেখি গাইড নিয়ে পাপ্পু আর উজ্জ্বল আমাকে খুজে চলছে । বিদায় নেয়ার জন্য ঘুরে দেখি ম্রো নেই । আমাকে পথ দেখিয়ে আবার হারিয়ে গেছে পাহাড়ি অরণ্যে ।

পরদিন ভোরে উঠে বগালেক থেকে রুমা বাজারের উদ্দেশে ফিরে চললাম । এবার লারাম আমাদের নিয়ে চললো ঝিরিপথ ধরে, ঝরনার পানিতে ভেজা পাথুরে পথ । বগালেকের পাহাড় থেকে যখন নিচে নামছি, তখন হঠাৎ পাশের পাহাড়ের দিকে চোখ চলে গেল, দেখি পাহাড়ের খুব উচুতে ম্রো দাড়িয়ে আছে । দূরের কোনো এক অজানার দিকে তাকিয়ে কি বিষণ্ন উদাস ভঙ্গিতে দাড়িয়ে আছে সে ।

মনে হলো, ভোরের মিষ্টি আলো সামনের দিকে একটু ঝুকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে থাকা মেয়েটার গভীর বেদনাকে প্রাণপণ মুছে দেয়ার চেষ্টা করছে ।

গ্রিন রোড, ঢাকা থেকে

খুজে পাওয়া

সোহেল ।

নইম

আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে বারবার দেখছে নূপুর অর্থাৎ নূপুর আহম্মেদ । কিছুক্ষণ আগের সংবাদটা ওকে এক অনাবিল শান্তি এনে দিয়েছে । এক অদ্ভুত ভালোলাগায় তার শরীর-মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে । নূপুরের মনে হতে লাগলো, সোহেলকে কিভাবে বিষয়টা জানাবে? কথাটা মাথায় ঢুকতেই লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে গেল । হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠতেই রিসিভ করে মাকে খুশির খবরটা জানালো । মেয়ের কাছ থেকে খবরটা শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান । নিজেকে সংবরণ করে জানতে চান, সোহেল খবরটা জানে কি না ।

মায়ের সঙ্গে কথা বলার পর নূপুর ফোনটা হাতে নিয়েই অনেকক্ষণ সোফায় বসে রইলো । মনটা তার শুধুই দুরু দুরু করছে, সোহেলকে বড্ড জানাতে ইচ্ছা করছে । হাতের মোবাইলে সোহেলের নাম্বারটি তুলেও আবার ক্যানসেল করে দেয় । মনে মনে ভাবে, এখনই নয় আর কিছুক্ষণ পরই সোহেল আসবে । তখন তাকে একটা সারপ্রাইজ দেয়া যাবে । এ চিন্তা করতে করতে নূপুরের খেয়াল হলো আজ ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ তারিখ । আগামীকাল ১৪ তারিখ, ভ্যালেনটাইন ডে এবং সে সঙ্গে ওদের চতুর্থ বিয়ে বার্ষিকী । এটা ভাবতে ভাবতে উঠে দাড়ায় নূপুর । আবার গিয়ে দাড়ায় ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে । কাধ থেকে শাড়ির আচলটা ফেলে দিয়ে ব্লাউজের শেষ সীমানা থেকে নাভি পার হয়ে তলপেটের নিচ অবধি হাত বোলাতে থাকে । একটি জীবন্ত অস্তিত্বের অনুভব করার চেষ্টা করে নূপুর । ভাবতে থাকে ফেলে আসা পুরনো দিনগুলোর কথা ।

সোহেলের সঙ্গে প্রথম দেখা কলেজেই । দেখা থেকে পরিচয় । তারপর বন্ধুত্ব । এরপর তাকে আরো নিবিড় আপন করে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা । এই যে একান্ত আপন করে পাওয়ার বাসনা, এর নামই বুঝি প্রেম । কিন্তু মনের আঙিনাতে এ কথা ধরা পড়লেও সোহেলকে কখনোই বুঝতে দিতে চায়নি নূপুর । এদিকে সোহেলও নূপুরকে পছন্দ করলেও বলতে পারছিল না । আর এমনি করে হৃদয়ের রাস্তায় চলতে চলতে এক সময়ে দুজনই দুজনার কাছে ধরা পড়ে যায় । তারপর একটি শুভক্ষণে শত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পারিবারিকভাবেই দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ।

বিয়ের পরবর্তী দিনগুলো যথেষ্ট আনন্দঘন পরিবেশে কেটেছে ওদের । সোহেল সারা দিন অফিসে ব্যস্ত থাকায় একাকিত্বের যন্ত্রণা মাঝে মধ্যে নূপুরকে পেয়ে বসে । তবে সোহেলের ঐকান্তিক আবেগে ও বুঝে নিয়েছে যে, সোহেল একদম সময় নষ্ট করে না । অফিস শেষ হতেই বাসায় ফিরে আসে । কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এক অদ্ভুত ভালোলাগার অনুভূতি বয়ে যায় নূপুরের শরীর ও মনে । আর আজ তার সঙ্গে যুক্ত হলো যেন আরো এক নতুন উপসর্গ । আবার নিজের তলপেটে হাত বোলায় নূপুর । জীবন্ত অস্তিত্ব খুজতে গিয়ে তলপেটের গভীর জানু দেশে নেমে যায় তার হাত । এভাবে খুজতে খুজতে সোহেলকেই যেন খুজে পায় সে ।

হঠাৎ বেজে ওঠে কলিং বেল। বাজানোর ভঙ্গি শুনে আর বুঝতে বাকি থাকে না কে এসেছে। ভেবেই রক্তিম হয়ে ওঠে তার মুখটা।

লজ্জায় নত হয়ে পড়ে। এভাবেই কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। আবারো বেজে ওঠে বেল, সেই পুরনো ভঙ্গিতে একই ঢঙে। সম্বিৎ ফিরে পায় নূপুর। দ্রুত যায় দরজার কাছে। দরজা খুলেই দেখে, একগুচ্ছ টকটকে তাজা লাল গোলাপ নিয়ে দাড়িয়ে আছে সোহেল। মুখে সেই চিরাচরিত দুষ্টুমির মৃদু হাসি।

দরজা দিয়ে ঢুকেই নূপুরকে জড়িয়ে ধরে সোহেল। কোনো কিছু বোঝার আগেই নূপুর অনুভব করে তার ঠোঁট দুটি চলে গেছে সোহেলের উষ্ণ মুখের ভেতরে। এক ঝটকা মেরে সোহেলকে সরিয়ে দেয় নূপুর। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, দেখছ না দরজা খোলা?

আবার জড়িয়ে ধরে সোহেল। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতে নিতে বলে, আমি তো কোনো অন্যায় করছি না। আমার বিয়ে করা বউকে আদর করছি।

তাছাড়া এ মুহূর্তে এ রকম আদরই তোমার প্রাপ্য। তবে দুঃখ কি জানো, খবরটা আমার প্রথমে শুনতে হলো মায়ের কাছ থেকে। কথাগুলো বলেই এক ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দেয়

নিলটুলী, ফরিদপুর থেকে

tonmoyzz456@gmail.com

মনি

জিপসী

মনি আর আমি ফেনী গিয়েছিলাম। সবাই জানতো মনি যাচ্ছে জিয়া মহিলা কলেজে ক্লাস করতে। আর আমি আসছি ঢাকায়। কিন্তু দুজনেই পরিকল্পিত শেডিউল বাদ দিয়ে গোপনতম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিকটতম বন্ধু রুবেলের সহযোগিতায় ঢুকে যাই একটি খালি ফ্ল্যাটে। তারপর সকাল দশটা থেকে দুপুর প্রায় তিনটা পর্যন্ত অন্যের সাজানো ফ্ল্যাটে আমরা বাস্তবায়ন করি আমাদের সাজানো পরিকল্পনা।

ওই তারিখের আগেও তার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু কেন জানি ওই দিন আমরা দুজন এতবেশি উত্তেজিত ছিলাম যে ব্যালান্স রাখা যায়নি। আর ওই ব্যালান্সহীনটাই আমাদের জন্য কাল হয়ে দাড়ায়। যাক সে কথা। তারও প্রায় ছয় মাস পর তার সঙ্গে আমার সর্বশেষ সম্পর্ক হয়। সে আমার মামাতো বোনও ছিল– সেই সুবাদে যখন নানা বাড়িতে যাই তখন রাত প্রায় একটার দিকে সুযোগ পেয়ে সে আমাকে তার রুমে যাওয়ার জন্য বলে।

আমি প্রেমিক বাবাজীও তো ওই অপেক্ষায়ই ছিলাম...। তাই যত দ্রুত সম্ভব তার রুমে গিয়ে মহা আকাঙ্ক্ষিত কাজ শুরু করে দিলাম।

সেদিন সে এতটাই উত্তেজিত ছিল যে প্রথমেই আমাকে প্রচ-ভাবে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোটগুলোকে, আমার জিভকে তীব্রভাবে তার ঠোটের মধ্যে পুরে নেয়। এ যেন আমাকেই, আমার পুরো অস্তিত্বটাকেই তার সমস্ত শরীরটার মধ্যে প্রবেশ করানোর তীব্র আকুতি। আমি তাকে পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিই। তারপর শুরু করি তার উপর আমার আদরের নিজস্ব স্টাইলগুলো।

তার চাদমুখখানা ধরে দুচোখে দুটো চুমো দিই। তারপর তার নরম ঠোট দুটোতে ক্রমাগত চুমো দেয়া শুরু করি আর হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখি তার দারুণ সুন্দর স্তনগুলোতে। দুজনের গরম নিঃশ্বাস দুজনকেই এক দারুণ সুখকর আর আরামদায়ক অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত করে তুলছিল। এরপর তার দারুণ সুন্দর নাভিতে চুমু দিয়ে যখন সেই চির আকাঙ্ক্ষিত রহস্যময় গুহার সন্ধান পাই তখন নিজেকে আর সামলানো যায়নি। তারপর দুজনেই স্বর্গীয় সুখ পাওয়ার তীব্র বাসনায় নিজেদের সমর্পণ করে দিই। এরপর চূড়ান্ত সুখকর অনুভূতি লাভ আর সেই অনুভূতির মোহনীয় আবেগে মুগ্ধ থাকা... উফ, এত সুখ সহ্য করা যায়?

না, এত সুখ সহ্য হয়নি আমাদের কপালে।

সে আজ অন্যের স্ত্রী, তার স্বামী একটি কম্পানির এরিয়া ম্যানেজার। মোটামুটি মানের স্যালারি পাওয়া এই মানুষটা তাকে কতোটুকু সুখে রেখেছে সেই ভালো জানে। শুনেছি তার একটি পুত্র সন্তানও হয়েছে। আশা করি সে তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ পেয়েছে, যে সুখের জন্য অবলীলায় সে আমাদের সম্পর্কটাকে অস্বীকার করেছিল।

তার এনগেজমেন্টের দিনে আমি যখন আমাদের সম্পর্কের দাবি নিয়ে তাদের বাড়ি অর্থাৎ আমাদের নানাবাড়ি যাই তখন আমার শিক্ষিত সজ্জন মামারা আমাকে মেরে বেধে পুলিশে খবর দেয়। আমাকে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পর আমার মনি নাকি তার হবু শ্বশুরের সামনে বলে আমি ছোটবেলা থেকে ওই বাড়িতে ছিলাম, আমাদের মধ্যে শুধু কাজিন সম্পর্ক ছিল, আর কোনো সম্পর্ক কখনোই ছিল

না ।

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত নারীর ভালোবাসা । তারপর তার বিয়ে হয় আর এই আমি তারই শোকে, নাকি তার প্রতারণার তীব্র আঘাতে এক ভিন্ন জীবনে প্রবেশ করেছি, যেখানে আর কোনো নৈতিকতা আর মূল্যবোধের স্থান নেই– অন্ততপক্ষে এইসব ভালোবাসার ব্যাপারে ।

beautifulmind_shakil@yahoo.com

গুপ্তা

রাজেন্দ্র কর্মকার

আমার বয়স তখন চৌদ্দ-পনেরো হবে । দেহসৌষ্ঠবের সব কিছু আমার তখনো অজ্ঞাত । আমরা ঢাকা শহরে থাকি । আর লম্বা ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই ।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গেলাম গ্রামের বাড়ির হাওয়া খেতে । গ্রামে আমার বয়সী মামাতো ভাই-বোন আছে । গ্রামের টিনের ঘরগুলোয় একই ঘরে দুটি বা তিনটি পর্যন্ত খাট বিছিয়ে ঘুমানো হয় । আমি শহর থেকে গেছি বলে আমার জন্য একটু আলাদা সম্মান । আমাকে এক খাটে একাই ঘুমাতে দেয়া হলো । আর বিছানা গোছগাছ করে আমাকে ঘুমাতে দিয়ে গেল আমার মামাতো বোনের বান্ধবী গুপ্তা ।

সে ঘুমালো পাশের খাটে আমার মামাতো বোনের সঙ্গে । বয়সে গুপ্তা আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় । তার বয়স তখন ষোল কি সতেরো হবে । শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমালেও টিনের চালার ঘরে আমার একটু শীত শীত করছিল । হঠাৎ গভীর রাতে আমাকে জাপটে ধরে একটি বলিষ্ঠ দেহ ফিশফিশ করে বলে উঠলো 'শীত করছে?' ।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে কম্বলের মধ্যে ঢুকে আমাকে সজোরে জাপটে ধরে বললো 'শ! শ! চুপ ।' আমি 'গুপ্তা' তোমার শীত দূর করবো । তুমি ঘুমাও ।

আমার কেমন জানি ভয় করছিল । তার শরীরটা তখন অনেক গরম । তবে এভাবে কোনো মেয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলে কি করতে হয় সেটা আমার জানা ছিল না । সে কানে কানে বললো 'নৌকা চালাবে মাঝি?'

বললাম, আমি নৌকা চালাতে জানি না ।

গুপ্তা বললো, শিখিয়ে দেবো, তুমি শুধু শক্ত হাতে বৈঠা মারবে ।

ইতিমধ্যে আমার ঠোট দুটি সে কামড়ে ধরেছে । আমার ইচ্ছা হচ্ছিল জোরে চিৎকার দিই, কিন্তু শরীরে কি যেন এক আবেশ খেলে যাচ্ছিল । আমার শরীর ভয়ে কাপছিল ।

এরপর গুপ্তা বললো, এইতো ভালো ছেলে, এবার মাঝি তোমার বৈঠা বাও । আমি বোবার মতো নিথর । আমাকে নিচে রেখে বিশাল পুরুষ্ট গুপ্তার দেহটা কেবল কাপছে । চার-পাচ মিনিট পর বৃষ্টি নামলো । নৌকা চলা বন্ধ হলো । এবার সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নরম দুটি ঠোট দিয়ে আমার নাকে একটা চুমু দিয়ে বললো, বড় অদক্ষ মাঝি তুমি । আরো শক্ত হাতে বৈঠা চালাতে হয়, ঘুমাও ।

এরপর গুপ্তা চলে গেল পাশের খাটে । আমি অনেক কষ্ট করে বুঝলাম আজকের এ নৌকা বাইচ আসলে কল্পনা নয়, বাস্তব ।

পরের দিন নদীর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে সবাই মিলে যখন পানিতে নেমে হৈ-হুল্লোড় করছিলাম তখন গুপ্তার দিকে তাকিয়ে বারবার আমার শরীর গরম হয়ে উঠছিল । ভেজা কাপড়ের সঙ্গে লেগে থাকা তার সুডোল দুটি স্তন যেন বারবার আমাকে দোলা দিয়ে ডাকছিল । যাই হোক, সেবার দুদিন থেকে আবার শহরে ফিরে এলাম । কিন্তু আমার মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে এলাম গুপ্তাকে ।

দুই বছর পর এইচএসসি শেষ করে আবার গেলাম গ্রামের বাড়িতে । মনের মধ্যে গুপ্তাকে দুই বছরে নানাভাবে উল্টেপাল্টে দেখেছি । ভেবেছি, ওতো আমার চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড় । তাই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি বড়দের নিয়ে এমন ভাবতে নেই । সেদিন মামার বাড়িতে মেহমান আসায় রাতে শোবার জায়গা নিয়ে কিছুটা ঝামেলা দেখা দিল । গুপ্তা দেখি আগ বাড়িয়ে এসে মামিকে বলে ম্যানেজ করলো যে, ওদের ঘর ফাকা পড়ে আছে তাই আমি গুপ্তাদের একটা ঘরে আরামে ঘুমাতে পারবো । মামি আমাকে গুপ্তাদের ঘরে ঘুমাতে বললো ।

বিছানায় শুয়ে আছি । একটা ঘরে আমি একা এক খাটে । পাশের ঘর থেকে গুপ্তার গলার আওয়াজ পেয়ে আমার মনে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে । প্রচ- গরম পড়েছিল । তাই গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না । হঠাৎ ঘুম ভাঙল, আবার সেই ফিশফিশ আওয়াজ । রাজা, আমি তোমার রানী, কাছে এসো ।

আমি বললাম, দেখো গুপ্তা তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, তোমার সঙ্গে এসব করা কি ঠিক?

সে কান না দিয়ে ইতিমধ্যে আমার পরনের লুঙ্গি খুলে ফেলেছে। ডিমলাইটের আলোয় গুপ্তার সুপ্ত সৌন্দর্য যেন ফুটে উঠেছে। সে বললো, দরজার ছিটকিনি আটকিয়ে দিয়েছি, বাড়িতে ছোট বোন আর মা ছাড়া কেউই নেই, ওরা ঘুমাচ্ছে। আজকের রাতে রাজা তুমি আমার সব জ্বালা দূর করো।

আমিও এবার দক্ষ মাঝির মতো হাল ধরলাম। বললাম, ‘রানী এবার মাঝি কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ, বৈঠার আঘাত সইতে সামলে থাকিও, নইলে নৌকা চৌচির হয়ে যাবে।’

এক সময় নৌকা থেকে বৃষ্টি নামলো। আশপাশের সব ভিজিয়ে নিয়ে গেল। মধুর বৃষ্টিতে ভিজে শালকাঠের বৈঠাটা ছোট হয়ে নেতিয়ে পড়লো। এভাবে আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম ভোর পর্যন্ত।

ভোরে ঘুম ভাঙলো, আমরা নিজের কাপড় পরে নিলাম। তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। গুপ্তা চলে গেল পাশের ঘরে। আমি ঘণ্টাখানেক পর নদী থেকে গোসল সেরে নিলাম। এ রাতটি ছিল আমার জীবনের এক সেরা রাত।

এখন আমি পাড়ি জমিয়েছি বিদেশে। অস্ট্রেলিয়ায় আমি পড়াশোনা করি। ঢাকা থেকে বাবা-মা এখনো মাঝে মধ্যে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান। আমার মন থেকে এখনো মুছে যায়নি গুপ্তা। তুমি আমার মনে গুপ্ত থাকবে আজীবন।

সিলেট থেকে

ঢাকা মেডিকাল কলেজের ইতিহাস

ডা. আজিজ

ভালোবাসতে মজা লাগে, ভালোবাসার কথা বলতে মজা লাগে, ভালোবাসার ত্যাগ প্রকাশ করতে গর্ব লাগে, ভালোবাসার লজ্জা ভাঙতে মজা লাগে– এ জন্যই বোধ করি ইংরেজিতে একটি কথা আছে এঞবব মৎবধঃবংঃ ঢ়ষবধংঁৎব ড়ভ ষরভব রং ষড়াব ‘ভালোবাসার পাগল’ বললেও মনে খুশির মুচকি হাসি বা বিটলা হাসি ওঠে। ভালোবাসার মধ্যে সত্যি জয় করার বা বীরত্বের আনন্দ আছে। তাহলে সত্য প্রকাশে লজ্জা কেন?

ভালোবেসে আমার জীবনের ২৪টি অপেক্ষার বসন্ত গেল। ভালোবাসার মরার কোকিলে বিদেশে উড়াল

দিছে … পাখিরে আজো ভুলতে পারি নাই । এ ২৪টি বছরকে মনে হচ্ছে ২৪টি মাস, ২৪টি সপ্তাহ, ২৪টি দিন কিংবা ২৪টি ঘণ্টা মাত্র । অবশেষে জেনেছি– ভালোবাসলে সময় চলে যায় অতি দ্রুত । ‘ভালোবাসা যতো বড়– জীবন ততো বড় নয় ।’

লাইলির জন্য মজনুর অপেক্ষা কতো বছর ছিল জানি না । শিরির জন্য ফরহাদের অপেক্ষার ক্ষণকাল জানি না । চণ্ডীদাস-রজকিনীর, শশী-পুন্নুর অপেক্ষার সময়ও জানি না । তবে আমার অপেক্ষাকাল ‘আমৃত্যু’ যদি ১০০ বছরও হয় (আল্লাহপাক যদি ততোদিন হায়াত দেন) তবুও ভালোবাসার এ জনমকে অপেক্ষায় মাত্র ১০০ ঘণ্টাই মনে হবে । ২৪ বছর মানে দুই যুগ আমার কাছে দুই পক্ষ মনে হচ্ছে মাত্র (অর্থাৎ অপেক্ষায় আমার ভালোবাসার সময় কাটে দ্রুত) । বাংলাদেশে ভালোবাসার ‘ভ্যালেনটাইনস ডে’ আমদানিকারক পত্রিকার সঙ্গে আমার ভালোবাসার একটা মিল আছে তা হলো উভয়ের জন্ম ১৯৮৪ সালে । তাই এ দেশে যতোদিন এ পত্রিকা থাকবে আমার ভালোবাসা ততোদিন একজন ডাক্তারের ভালোবাসার ইতিহাস হয়ে থাকবে । আর তা যেন হয়ে থাকবে আমার প্রেমের সমাধি ‘ঢাকা মেডিকাল কলেজের’ ইতিহাস হয়ে ।

কুমিল্লা থেকে

প্রত্যয়ন

গোলাম সারওয়ার

জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে বন্ধনে তো দূরে থাক ভালোবাসার বন্ধনেও আবদ্ধ হওয়া ঠিক নয় । প্রেম-ভালোসার বেগুনি, নীল, আসমানি রঙের স্বপ্ন দেখাও উচিত নয় ।

আমি এ ভুলের আজো প্রায়শ্চিত্ত করছি । পছন্দ করে কোর্ট ম্যারেজ নয়, রীতিমতো সেটেলড ম্যারেজ করেই ভালোবাসার ঘর করি । কিন্তু ভালোবাসার ঘরটি যেভাবে গড়ে ওঠার কথা ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি শুধু আর্থিক দীনতার কারণে । অর্থকষ্ট আমাদের ভালোবাসার ঘরকে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের মতো দুমড়ে-মুচড়ে তছনছ না করলেও অনেকখানিই এলোমেলো করে দিয়েছে ।

১৯৯৫ থেকে ২০০৮ প্রায় তের বছর ধরে আমাদের ভালোবাসার ঘর । অর্থকষ্ট আমাদের মনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, আমাদের ভালোবাসার ঘরকে ভাঙতে পারেনি ঠিকই তবে ভালোবাসার বহিরাবরণ অর্থাৎ ভালোবাসার বাগান তথা ভোগবিলাসের অনুষঙ্গকে ঠিকই দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে ।

শুধু মন থাকলেই যদি ভালোবাসার অস্তিত্ব টিকে থাকতো সম্রাট শাহজাহান তাহলে বেগম মমতাজের প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন ‘তাজমহল’ কেন দাড় করালেন? ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখতে হলে চাই প্রাচুর্য, চাই

ভোগবিলাসের ন্যূনতম চাহিদাও। চাই ঝকঝকে অফসেট পেপারের রঙিন পাতায় মুদ্রিত কবিতার ছন্দ। এ ক্ষেত্রে শেখ সাদীর উদাহরণও প্রণিধানযোগ্য। গরিবি পোশাকে দাওয়াত খেতে গিয়ে শেখ সাদী সম্মান পাননি অথচ বেশভূষায়।

জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে আজো আমরা সে শিক্ষাই পাচ্ছি। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট আরো ভয়াবহ, আরো দুর্বিষহ। নুন আনতে পান্তা ফুরায় যেখানে ভালো ড্রেস কোড সেখানে থাকে কি করে? দ্রব্যমূল্যের বিরামহীন ঊর্ধ্বগতি আমাদের জীবনযাত্রাকে, ভালোবাসার ঘরকে উচ্ছন্নে ফেলে রাখছে। সবকিছুতে উপেক্ষিত রেখে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে।

এক টাকা রোজগারও ছিল না যখন, বাবার সীমিত আয়ের ওপর নির্ভর, তখন ঘরে তুলি নূপুরকে। বিয়ের তিন বছর পর বাবা প্রয়াত হলেন। তখন থেকে আয় করতে বা আয় বাড়াতে সচেষ্ট থাকলাম। এক পর্যায়ে মোটামুটি ভালোই চলেছিলাম। কিন্তু বর্তমানের বাজার পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে যেন সিডরের মতো আঘাত করছে। এখন প্রতি মাসে প্লাস মাইনাস দশ হাজার টাকা হাতে পেয়েও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ সংসারের খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছি। যাদের অবস্থা আমার চেয়েও বেগতিক তাদের কথা চিন্তা করলেই গা শিউরে ওঠে।

ভালোবাসায় অর্জিত শ্রেষ্ঠ সম্পদ তূর্য, ঐশীকে নিয়ে দেশের ভেতরে ঢাকা ছাড়া আর কোথাও বেড়াতে পারিনি। পৃথিবীর দীর্ঘতম স্বাস্থ্যকর সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার দেখা এবং উপভোগ করার শখ আজো পূর্ণ হয়নি। এমনি আরো নানা স্বাদ-আহ্লাদ আমাদের অপূরণ থেকে যাচ্ছে।

অর্থকষ্ট কতোভাবে যে বঞ্চিত করে রাখে তার একটা বাস্তবতা না বললে পরিষ্কার হবে না। ফিক্সড ইনকাম থেকে সাড়ে পাচ হাজার টাকায় ঢাকা বেড়াতে যাই। মোট আটদিন ভ্রমণে রিকশা, সিএনজি, ট্যাক্সি ক্যাব ইত্যাদির ভাড়া মেটাতেই সিংহভাগ টাকা চলে গেল। সিলেট ফেরার আগের দিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ঢাকার লাভ রোডে অবস্থিত 'যায়যায়দিন' অফিস দেখতে প্রথমবারের মতো আমি একাই যাই। অথচ আমার সঙ্গে ঐশী, তূর্যসহ নূপুরেরও আসার কথা ছিল। ঢাকার গোড়ান থেকে তেজগাও পর্যন্ত সিএনজি বা ট্যাক্সি ক্যাবের ভাড়াও নেহাত কম নয়। তার চেয়ে বাসে এবং কিছুটা পথ পায়ে হেটে একা চলে গেলে টাকার অনেকটা সাশ্রয় হবে চিন্তা করে সবাই সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

ধারকর্জ করে রি-অ্যাডমিশন ফি জমা দিয়ে তূর্যকে ক্লাস সিক্সে দিতে হয়েছে এই জানুয়ারিতে। ঐশীর বয়সও পাচ পেরিয়ে গেছে। স্কুলে ভর্তি করানো খুব দরকার। কিন্তু টাকা? টাকার যন্ত্রণা তো টাকা দিয়েই শেষ করতে হবে। প্রেম, ভালোবাসা সেখানে নিরর্থক, উপেক্ষিত। নয় কি? আর কিছু পারি না পারি বাচ্চা দুটোকে মানুষের মতো মানুষ রূপে গড়ে তুলতে হবে। দেশের সেরা সম্পদে পরিণত করতে হবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে। ভালোবাসা দিবসে এ

আমার প্রত্যয়, এ আমার অঙ্গীকার ।

প্রত্যয়দীপ্ত বা সিরিয়াস হওয়ার জন্য আরেকটি নমুনা এখানে উল্লেখ না করলেই নয় । সেদিন যায়যায়দিন অফিসে ‘খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার’ কলাম লেখক মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে পরে শরিফ রনিকে সমঝিয়ে দিলেন যায়যায়দিন অফিস ঘুরেফিরে দেখানোর জন্য । শরিফ রনি যথাযথ কাজটি করায় আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ । এরপর মাহমুদ ভাই পরিচয় করিয়ে দেন নিশাত মাসফিকা এবং সাকিল ভাইয়ের সঙ্গে যিনি ‘মিল-অমিল-গরমিল’ নিবন্ধটি অত্যন্ত রস সহকারে লিখে থাকেন । দুপুর প্রায় দুটা পর্যন্ত প্রাণবন্ত, হাসিখুশি সাকিল ভাইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলা প্রায় শেষ তখন সম্পাদক শফিক রেহমানকে দেখতে পেলাম । সাধারণত বিকাল বা সন্ধ্যার পর ছাড়া তিনি এ সময়ে বিশেষ কাজ ছাড়া অফিসে আসেন না । কাগজ হাতে এ ডেস্ক থেকে সে ডেস্কে যাচ্ছেন আর কাকে বা কি যেন উদ্বিগ্ন হয়ে খুজছেন । এ রকম মুডে সাকিল ভাই আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন শফিক সাহেবের সঙ্গে ।

আমি যথারীতি তার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করি । তিনি তখনো উদ্বিগ্ন এবং বিড়বিড় করে সাকিল ভাইকে কি যেন বলার পর আমার উদ্দেশে স্মিত হেসে আমার বুকে তর্জনী ছুইয়ে ‘আমি একটু চিন্তায় আছি’ বলেই সামনে পা বাড়ালেন ।

পরদিন সিলেট আসার পথে কমলাপুর রেল স্টেশনে যায়যায়দিন পত্রিকা হাতে নিতেই প্রথম পাতায় ‘আবার নেড়ি কুকুরের ইন্টারভিউ’ শীর্ষক শফিক রেহমান কর্তৃক লেখাটি দেখতে পেয়েই বুঝতে পারলাম গতকাল তিনি এ কারণেই উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, সিরিয়াস ছিলেন । পুরো জাতির উদ্দেশে একটা লেখা ছাপাতে গিয়ে কোনো লেখক বা পত্রিকার সম্পাদক যে এতো সিরিয়াস, দৃঢ়প্রত্যয় হন, ভালোবাসার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিতে পারেন তা না দেখলে সত্যি বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ।

তাতীপাড়া, সিলেট থেকে

বউ

সোয়েব আহমেদ

আমি আসলেই সারপ্রাইজড হয়ে গেলাম । কে হতে পারে?

দুই বছর হয়ে গেল কিন্তু আমার মোবাইল ফোনে কেউ ফোন করে এভাবে বলেনি, বলেন তো আমি কে? তাও আবার মেয়ে কণ্ঠ ।

আমাকে ফোন করে এমন মেয়ে কেবল বেলি। আমার কাজিন। উইমেন স্টাডিজে পড়ে। থাকে কুয়েত মৈত্রী হলে। আর আমি জিয়া হলে। ওর সঙ্গে তো কলাভবনে প্রায়ই দেখা হয়।

কে আপনি? আবার উৎসুক আমি।

মেয়েটি বললো, এটা আপনার জন্য সারপ্রাইজ। কিছুক্ষণ ভেবে বলুন, আমি কে? নইলে আর কোনোদিন আমাকে চিনতে পারবেন না।

বুঝতেই পারছিলাম না কে হতে পারে? আমতা আমতা করে বললাম, আমায় চেনেন তো!

না চিনে ফোন করিনি, রহস্যময়ী বললো, আপনিও আমাকে চেনেন।

এবার আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। তাহলে এই কি সে? যাকে আমি কয়েক বছর ধরে গোপনে বুকের ভেতর রেখে দিয়েছি। ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে আর জেগে ওঠার পরে যাকে পাঠ করি, সবটুকুই চার আলিফ টেনে। তার মুখ, চোখ, ঠোঁট, নাক, হেসে উঠলে বের হয়ে পড়া মুখের সেই বাকা দাতটি আর হাতের মিহি আঙুল ও তার কথা– মিষ্টি কিংবা রাগের সবটুকুই আমি উল্টে-পাল্টে দেখি। পড়তে পড়তে ঘুমাই আবার জেগে উঠে পড়ি।

আমি মেলাতে চেষ্টা করলাম, হিন্টস দিন তো। আপনার সঙ্গে কি আমার অনেক বছর দেখা হয় না? মিথ্যে বললাম, ওকে আমি সব সময়ই দেখি মনের আয়নায়।

ও বললো, অনেক বছর না, মাত্র সাড়ে তিন বছর।

এবার আমার শরীর ঘেমে যেন জ্বর ছাড়লো। বলে ফেললাম, তুমি মিম।

ও পাশ থেকে রহস্যময়ী হেসে বললো, না, হলো না।

এবার মেজাজ দেখালাম, তাহলে কে আপনি? আমি আপনাকে চিনি না।

সে বললো, হ্যা, আমি মিম। আপনাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু নিজেই এখন সারপ্রাইজড। চিনলেন কি করে! ওর কণ্ঠ থেকে ভালোবাসা বের হয়ে এলো।

আমি বোবা হয়ে গেলাম। আমার গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো বুকের ভেতর থেকে। মনে মনে বললাম, তোমাকে আমি আমার ভেতরে মেখে নিয়েছি আর চিনবো না।

হ্যা, সাড়ে তিন বছর পরে মিমের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। ওর ভয়েস কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে তবে একেবারে নয়। টোনটা এখনো আগের মতোই আছে। ও এখন দেখতে কেমন কে জানে। সাড়ে তিন বছরে মেয়েরা কতোটুকু চেঞ্জ হয়?

আমি যখন মিমকে শেষ দেখি বা ওদের বাসায় শেষবার গিয়েছি, তখন সে ফাইভে পড়ে। আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে তার হাউস টিউটর। ঠিকমতো না পড়ার জন্য ওর গালে আমার হাতের চড় এবং শোধ নেয়ার জন্য আমার হাতে ওর সিলো গ্রিফার কলমের চোখা মাথার খোচা আর কিছু অভিমান ভরা আচরণ সব মিলিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আর শেষবারের মতো ওর গালে চার আঙুল বসিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম, যদিও গালের দাগ দেখে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল।

কোন ক্লাসে পড়ো, জানতে চাইলাম।

এইটে। মিম পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনার পড়া শেষ হয়নি?

না, আরো দুই বছর আছে।

ঠিক আছে দুই বছর পর ফোন করবো।

তুমি আমার ফোন নাম্বার পেলে কিভাবে?

হাসতে হাসতে সে বললো, সে আরেক গল্প।

শুরু করলো সে, আম্মুর কাছে শুনলাম আপনি একটি পত্রিকায় কাজ করেন। কিন্তু পত্রিকাটির ফোন নাম্বার জানি না। ফোন করলাম ইত্তেফাকে। রিসেপশন থেকে আপনার পত্রিকার ফোন নাম্বার নিয়ে

সেখান থেকে মোবাইল নাম্বার পেয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত আপনাকে পেলাম, স্যার ।

বললাম, হ্যা অনেক কষ্ট করেছো । তো এতোদিন পরে কি মনে করে?

দুই বছর পরে বলবো ।

আচ্ছা, অপেক্ষায় থাকলাম ।

ফোন কেটে দিল সে ।

কিন্তু পরের দিন আবার ফোন । এভাবে প্রতিদিন । আমাদের কথা হতো সেই ফেলে আসা দিনের স্মৃতি নিয়ে ।

ওর আম্মুকে আমি আন্টি ডাকতাম । আমাকে চা-নাশতা দিলে অনেক সময় শুধু চা খেতাম ।

মিম বলতো, ইস আমার আম্মু কতো কষ্ট করে নাশতা বানান আর গেয়ো ভূত সেগুলো খায় না ।

একবার গার্হস্থ্য পরীক্ষার জন্য শাদা কাপড়ে ওর নাম লিখে মিম দুটো রুমাল বানিয়েছে । আমাকে একটা নিতে বলায় কিছুটা লজ্জা পেলাম ।

আন্টি বলেছিলেন, ছাত্রী নিজে বানিয়ে দিচ্ছে । নাও, লজ্জার কি আছে ।

আন্টি রুমালটি ইস্ত্রি করে দিয়েছিলেন, আমি নিয়েছিলাম সেটা । ওকে রাগানোর জন্য তখনই নাক মুছেছিলাম । ও কিছু বলেনি ।

তবে প্রতিদিনই সে রুমালটি দেখতে চাইতো ।

একদিন রুমালটি হারিয়ে ফেললাম । দেখাতে পারলাম না । বললাম, হারিয়ে গেছে ।

সে আমার ওপর খুব রাগ করলো।

এরপর থেকেই আমার কথা শুনতো না, ঠিকমতো পড়তো না। এ ঘটনার পর একবার গ্রামের বাড়ি গিয়েছি। দুই দিন থাকার কথা বলে গিয়েছিলাম কিন্তু থেকেছি সাত দিন।

এক সন্ধ্যায় এলাম মিমকে পড়াতে। ও রেগে গিয়ে বললো, গ্রামে এতো কি? আমার পড়াশোনা নাই নাকি!

সে আরো যা বললো তাতে থ হয়ে গেলাম। বললো, এমনিতেই কালো ভূত, গ্রামে গিয়ে আরো কালো হয়ে এসেছে।

রেগে গিয়ে চড় বসিয়ে দিলাম ওর শাদা গালে। চার আঙুলের দাগ হয়ে গেল।

এসব খুনসুটি আচরণ নিয়েই ফোনে কথা হতো। আমি বলতাম তোমার দোষ, ও আমার দোষ দিতো। এভাবে আমার ভেতরটা খরস্রোতা পদ্মা নদী হয়ে যেতে থাকলো। কেমন যেন মনে হতে থাকলো, আমি ওকে ভালোবাসি।

একদিন বলে ফেললাম, মিম আই লাভ ইউ।

ও বললো, আমি জানি।

তুমি?

বললো, আমি জানি না।

এরপর থেকেই আমাদের ভালোবাসার নদী বইতে লাগলো। আমি মিমকে ডাকি বউ।

ও বলে, হ্যা আমি তোমার বউ।

আমি বলি, মিম আমি যে তোমাকে বউ ডাকি এটা কি তুমি ভেতর থেকে বিশ্বাস করো?

হ্যা, বিশ্বাস করি।

আমি বলি, তুমি আমার সারা জীবনের বউ। অন্য কেউ আমার বউ হবে না কোনো দিন।

ও ভালোবাসা মেখে বলে হু।

মাঝে মধ্যে দেখা হতে লাগলো আমাদের, ওদের বাসায়ও যেতাম। এভাবে কাটলো আরো দুই বছর। একদিন আমাদের সম্পর্কের কথা জেনে ফেললেন ওর বাবা-মা। আমাকে কিছু বললেন না।

কিন্তু ওকে প্রচ- মারলেন। গোপনে যে মোবাইল ফোনটা কিনেছিল তাও কেড়ে নিলেন। এ কথা ওর ছোট বোন ঝর্না আমাকে ফোনে জানায়।

বাবা-মায়ের প্রচ- চাপে আমার বউ আমাকে ফোন করা বন্ধ করে দিল। কিন্তু ও একদিন ফোন না করলে আমার বুকের ভেতর প্রচ- ব্যথা শুরু হয়ে যেতো।

দুদিনের মাথায় অনেক চেষ্টায় ওর কোচিংয়ের বন্ধু দীনের ফোনে ওকে পেলাম। বললাম, আমার বুকের ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছে। আমাকে বাচাও, কেদে ফেললাম আমি।

তারপর থেকে আমার বউ আমাকে আরো বেশি ভালোবেসে যাচ্ছে। মিম এবার টেনে পড়ে। আমিও পড়াশোনা শেষ করতে যাচ্ছি।

ইদানীং মনে হচ্ছে, ওর বাবা-মাও কিছুটা নরম হয়ে এসেছেন, মেনে নিতে পারেন শেষ পর্যন্ত। তাদের সঙ্গেও মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়। তারা আমাকে বোঝান, ও এখনো ছোট, পড়াশোনা শেষ করুক। বয়স হোক তারপর দেখা যাবে।

আশায় আছি, একদিন একেবারে নিজের করে কাছে নিয়ে আসবো আমার বউ আমার মিমকে।

আজ ভালোবাসা দিবসে একটাই চাওয়া, সারা জীবন যেন মিমকে ভালোবেসে যেতে পারি আর পাই ওর ভালোবাসা।

নীল খাম

আমিনুল ইসলাম

মা, সাব-আপা হ্যারা খুব ভালা না মা?

করুণ ও নরম সুরের কথাটা কানে আসতেই গান থেমে যায় আমার। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি ফিজিকাল কলেজের ওয়াল ঘেষে উসকোখুসকো, এলোমেলো চুলের ২০/২৫ বছরের একটি মহিলা। পরনে সবুজ রঙের শাড়ি। আচলের একটি বিরাট অংশ ছেড়া। ছেড়া আচলটি মাথার ওপর দিয়ে পেছনের দিকে ফেলে রেখেছে অবহেলায়। বাম হাত দিয়ে এক বছরের বাচ্চাটিকে পরম যত্নের সঙ্গে ধরেছে বাম কোলে। ডান হাতে ছাই রঙের একটি মোটা কাপড়ের বাজার ব্যাগ। তাতে পাতিল জাতীয় কিছু আছে, ব্যাগের পেট দেখে বোঝা যায়। ইট ভাঙা হাতুড়ির ডা-টাও জানিয়ে দিচ্ছে মহিলা ইট ভাঙা শ্রমিক। পেছনে দৌড়াচ্ছে মনে হলেও হাটছে তিন-চার বছরের একটি ন্যাংটা শিশু।

হাতে একটি সিলভারের ঠোসকা পড়া গামলা। গামলাটি এমনভাবে উচু করে ধরে হাটছে, মনে হচ্ছে ওতে কিছু আছে। হ্যা, পান্তাভাত, খুব সম্ভব যে সাব-আপার কথা বলতে বলতে আসছিল। ওনারা দিয়েছেন হয়তো।

ওরা আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ন্যাংটা শিশুটাকে দেখে কেন জানি মায়া হলো। বললাম, আপা একটু দাড়ান।

এ মায়াভরা ভালোবাসা শব্দটা যেন তার অপরিচিত। এমন মায়াভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন বহুদিন এমন আদর মাখা ডাক শোনেনি সে। ন্যাংটা শিশুটা ভয় পেয়ে তার মায়ের পেছনের দিকে এমনভাবে লুকিয়ে আছে, মনে করছে তাকে কেউ তার মায়ের কাছ থেকে নিতে পারবে না।

মহিলাকে বললাম, তোমার নাম কি বোন?

ও বললো, নাম দিয়ে কি হইবো ভাইজান। তয় এতো বড় ঢাহা শহরে কতো মানুষ, সবাই মোরে কুত্তার

মতো খাবলায়ে খাইতে চায়। আর আপনি মোরে বৈন কৈয়লেন। তয় একটু খাড়ান ভাইজান, বলে কোল থেকে বাচ্চা নামিয়ে আমাকে ছালাম করেছিল পায়ে ধরে। চোখে ভালোবাসার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে কাদো কাদো কণ্ঠে বলেছিল, 'ভাইজান আপনার জীবনে কোনোদিন যেন বিপদ-আপদ না আসে। আর আপনার মতো ভালো মানুষ যেন এ দেশের রাজা হয়। তাহলে আমাদের মতো মানুষের ভাতের অভাব হবে না। আল্লাহ রহমত করবে আমাদের দেশে' ইত্যাদি বলে দোয়া করেছিল।

হ্যা, হতভাগিনীর নাম ছালমা। ছালমা তিন বছর প্রেম করে বিয়ে করেছিল জহরকে। ওদের গ্রামেই বাড়ি ছিল জহরের। নদী ভাঙনে সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন কোথায় থাকে কেউ জানে না। হঠাৎ কোথাও কারো সঙ্গে দেখাও হয় কিন্তু জহরের সঙ্গে হয় না। ছোট পোলাডারে তিন মাসের পেটে রেখে কল্যাণপুর পোড়া বস্তি থেকে এই যে গেল আর দেখা পায়নি।

দুই বছর আগে দেখা হয়েছিল সদরঘাটে। বরিশাল থেকে এসে যখন সদরঘাটের ভিআইপি গেটের সামনে বসে ভাবছে মোহাম্মদপুর বেড়িবাধে কিভাবে যাবে– ঠিক তখন লোকটা একটি বাজার করার ব্যাগ হাতে করে শ্যামবাজারের দিকে চলে গেল। ডেকে লাভ হয়নি। আবার পোটলা-পাটলি, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভিড় ঠেলে ধরতে যেতেও পারেনি হতভাগিনী। এখন যেখানেই ইট ভাঙে সেখানেই সংসার। স্থায়ী জায়গা নেই ছালমার। সুবিধা এই যেখানে ইট ভাঙা হয় সেখানেই অনেকদিন থাকা যায়। ছালমার এখন বেশি ভয় ইট ভাঙা মেশিনটারে। এই যন্ত্রটাই না এক দিন ছালমার মতো মেয়েদের বেকার করে দেয়।

ওইদিন আমার পকেটে ছিল ২১৩ টাকা, যা আমার বেকার জীবনের সর্বোচ্চ বাজে খরচের জন্য বরাদ্দ। মনে মনে ঠিক করলাম, আজো এই টাকাটা বাজে খরচ করবো না। তাই ছালমাকে বললাম, তুমি থাকো কোথায় বোন?

গাবতলী বেড়িবাধে ভাইজান। তোমার বাসায় যাবো আজ।

গেলাম ছালমার বাসায়। বাসা তো নয় যেন মুরগির রাজপ্রাসাদ। ঘরের ভেতরে বাচ্চাটি ছাড়া ছালমা সোজা হয়ে বসতে পারে না। ছালমা ভেতরে শোয়ার সময় ছাড়া ঢোকে না সচরাচর। সে যখন ঢোকে তখন পা দুইখানা আগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তারপর বডিসহ মাথা। এ যেন এক গরিব দেশের কঙ্কালসার অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

আজ ভালোবাসা দিবস জানো ছালমা?

তা তো জানিনে। তই হুনছি আজ নাকি ভাইজান কি দিবস? আপনি ভাবিজানরে লয়ে ঘুরতে যাবেন না?

বললাম, তোমার ভাবি এখনো হয়নি। তবে হওয়ার জন্য বসে আছে। ও সকাল থেকে আমার জন্য লালমাটিয়া মহিলা কলেজ গেটে অপেক্ষা করছে একসঙ্গে সারা দিন ঘুরতে যাবো বলে। হয়তো রাগ করে ফিরে গেছে। কারণ এখন বেলা একটা। যাওয়ার কথা ছিল সকাল নটায়।

ছালমা ও ছালমার বাচ্চা দুটি নিয়ে গেলাম চিড়িয়াখানায়। সারা দিন ঘোরালাম ওদের। সামান্য কিছু ফাস্ট ফুড কিনে দিয়েছিলাম আমার সাধ্যমতো। সে কি আনন্দ বাচ্চা দুটির। বাচ্চাদের আনন্দ দেখে ছালমা বারবার চোখ মোছে। মলিন ছেড়া শাড়িটা দিয়ে অশ্রু ঢাকার বৃথা চেষ্টার এক ফাকে বলে, ভাইজান, ঢাহা শহরের এতো খারাপ মানুষের মধ্যে আপনি এতো ভালা মানুষ হলেন ক্যামনে?

ভাবলাম, এতো অল্পে যারা তুষ্ট তাদের খুশি করা তো খুব বেশি ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ব্যয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম। একটু ভালো আচরণ, আদরমাখা কথা, স্নেহভরা ডাক, মমতাভরা হাতখানা তো তাদের মাথায় রাখতে পারি। ভালোবাসার এই দিনে কপোত-কপোতীরা যদি ছালমার মতো কোনো ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে দিনটি কাটাতো বেড়িয়ে কিংবা আদর ও স্নেহভরা ভালোবাসার গল্প করতো তাহলে মনে হয় ভালোবাসার দিনের, ভালোবাসার একটি নতুন রূপ পেতো পৃথিবীতে।

এমনিভাবে সারা দিন ঘোরার পর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখি একটি নীল খাম। তাতে লেখা, আজ জীবনের শেষ ভালোবাসা আমার। তোমাকে আর কোনো দিন চাইবো না, কোনো ভালোবাসা দিবসে। হ্যা, আর কোনোদিন খুজে পাইনি তাকে। আজো নীল খামটি আমার গোপন ভালোবাসায় পূর্ণ কিন্তু আগের মতো আবেগ ও উচ্ছ্বাস নেই তাতে। এখন খামটির দিকে তাকালে মনে হয়, নীল রঙ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। তবুও বসে আছি খামটিকে আকড়ে মাকড়সার মতো ডানা মেলে একাকী।

কুষ্টিয়া থেকে

শুভেচ্ছা

লুবনা

১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে আমার বন্ধু-বান্ধবীদের উদ্দেশে আমি ভালোবাসার সৌজন্যমূলক দুটি কথা উপহার দিতে চাই। শাওন, সুজিদ, সোহেল এবং দ্বিশা ও চৈতি– প্রিয় বন্ধু ও বান্ধবীরা, বন্ধু হিসেবে আমি তোমাদের কতোখানি ভালোবাসি তা আমি যেমন জানি তেমনি তোমরাও তা জানো, বোঝ এবং অনুভব করো। আর সে জন্যই তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসাটা আরো গভীর এবং আরো মধুময় করে তুলতেই ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে, ভালোবাসার এই বিশেষ দিন উপলক্ষে তোমাদের জানাই

আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং একগুচ্ছ লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। বন্ধুরা তোমরা জীবনে অনেক সুখী হও এবং তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা এমনিভাবেই সব সময় অটুটু থাকুক– এ কামনা করি। তবে বন্ধুরা জানি না, এখানে লেখা ভ্যালেনটাইন উপলক্ষে তোমাদের প্রতি আমার এ ভালোবাসার কথাগুলো তোমাদের চোখে পড়বে কি না। যদি তোমাদের চোখে পড়ে এবং তোমরা তা পড় তবেই আমি সার্থক হব। এবং সার্থক হবে আমার এই লেখা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া

যাবো অন্য দিন

আইন উদ্দিন আমান

রাত গভীরে বাড়ি ফেরা, এই বদ অভ্যাসটা আমার অনেক দিনের। সারা দিনই কর্মব্যস্ততার পর বাজারে চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরি।

আজ রাতে আমার নববিবাহিত স্ত্রী শুয়ে থাকা ঘরের দরজায় দাড়িয়ে আস্তে করে ডাকতে থাকলাম। কিন্তু অনেক বার ডাকার পরও অন্য দিনের মতো দরজা খুলছে না। নাকি আজ আমার ডাকার শব্দ ও শুনতে পাচ্ছে না! গলা ছেড়েও ডাকতে পারছি না মায়ের ভয়ে। মা প্রতিদিন বলে থাকেন, যেন রাত করে বাড়ি না ফিরি। আর কতোক্ষণ দরজায় দাড়িয়ে থাকবো। শেষে গলা ছেড়ে ডাক দিতেই যে কথা সে কাজ। ঘর থেকে উঠে এসে এক ডাকের মাথায় দরজা খুলে দিল আমার স্ত্রী, স্ত্রী নয় আমার প্রাণ। আমার জীবনসাথী।

দরজায় দাড়িয়ে না থেকে ঘরে ঢোকে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আজ এমনটি কেন করলে?

তোমার কি শরীর খারাপ? সে না সূচক উত্তর দিয়ে দাড়ালো। এমনভাবে ঘুরে দাড়ালো যেন মাথায় আচল টেনে ঘুমটা পরে। আমি তখন তার শাড়ির আচল ধরে টান দিয়ে তাকে আমার বুকে নিয়ে এলাম। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে হাত বাড়ালাম। এমনি সে হঠাৎ যেন বিদ্রোহী কণ্ঠে বলে উঠলো, সাবধান, আমাকে স্পর্শ করবে না।

আমি তখন হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, যাকে এতো আদর করে কাছে টানলাম, সে কি না...। তবুও ধৈর্য ধরলাম, তার ওপর তেমন রাগ করলাম না। তার এ রকম বাড়াবাড়ি অনেক বারই দেখেছি।

আজকের রাগ করার কারণ জানতে চাইলে সে আরো বেশি রাগ মেশানো গলায় বলে উঠলো, তুমি প্রতিদিন অন্য মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঘরে ফেরো, আমার কথা তোমার মনে থাকে না, তাই না? ঘরে বউ রেখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে লজ্জা করে না? তাদের সঙ্গে কথা বলতে এতোই যদি মন চায় তাহলে আমাকে বিয়ে করলে কেন? আমি এক্ষুণি বাড়ি চলে যাবো, তোমার সংসারে আর থাকবো না। নির্লজ্জ পুরুষ, অন্য মেয়ের হাতের রান্না টেস্ট করতে চায়। সে নানান ভঙিতে বাক্যালাপ শুরু করে দিয়েছে।

রাগে আমার সারা শরীর যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাকে এ মুহূর্তে গলা টিপে মেরে ফেলি। কিন্তু আমি রাগ হজম করতে জানি। তাছাড়া আমি তাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তাকে কিভাবে মেরে ফেলি। তার ওপর সামান্য রাগ করতেও আমার মায়া হয়।

সে শুধু বক বক করেই চলেছে। আমি নাকি তাকে কথা দিয়ে কথা রাখি না। আমি নাকি লুচ্চা, বদমায়েশ, আমার ভেতরটা খারাপ ইত্যাদি যা মুখে আসে তা বলে যখন গালি দিতে লাগলো তখন আর সহ্য করতে পারলাম না। ঠাস করে তার দুই গালে কয়েকটা থাপ্পর দিয়ে বিছানায় ফেলে দিলাম। থাপ্পর খেয়ে সে যেন আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। চোখ-মুখ দিয়ে মনে হয় আগুন বের হচ্ছে। আর যেন কোনো কথাই বলতে পারছিল না। আমি কোনো কথা না বলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সে সারা রাত আর আমার সঙ্গে ঘুমাতে আসেনি। সকালে কাপড়-চোপড় গোছাচ্ছে এবং বলছে, এমন বদমায়েশের বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। এক্ষুণি বাড়ি চলে যাবো। বাবার বাড়ি আমার কিসের অভাব?

বকাবকি করতে করতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। দরজার কাছাকাছি যেতেই একটু জোর গলায় বললাম, দাড়াও।

সে অমনি দাড়িয়ে গেল। তার মুখোমুখি গিয়ে দাড়ালাম।

আমার দিকে সে অশ্রু মেশানো অগ্নিচোখে তাকিয়ে রইলো।

তার হাতের ব্যাগটা অসহায়ের মতো ঝুলছে।

বললাম, চলে যাবে যাও, আমি তোমাকে বাধা দেবো না। তবে একটি কথা শুনে যাও। তুমি যা ভাবছো, যা বলছো এর একটিও সত্য নয়। আড্ডা দিই সেটা সত্য। কিন্তু কোনো মেয়ে মানুষের সঙ্গে নয়। আমার কোনো মেয়ে বন্ধু নেই। বন্ধু যদি থেকে থাকে সেটা তুমি। আর ভালো যদি বেসে থাকি, সেটা তুমি।

এরই মধ্যে তার হাতের ব্যাগটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। বুঝতে পারলাম তার শরীর নেতিয়ে পড়ছে। তাই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসালাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই, সে এক মধুময় নীরবতা। অনেকক্ষণ এভাবে স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করার পর প্রশ্ন করলাম, বাপের বাড়ি যাবে না?

তার দৃষ্টি তখন দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারের দিকে। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বললো, আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে-তে তোমাকে ছেড়ে কি করে যাই বলো। যাবো অন্য দিন।

হোগলাকান্দি, নরসিংদী থেকে

আকুতি

মনির হোসেন সিরাজী

যখন স্কুলে পড়তাম বড় ভাইরা বলতেন, কলেজে গেলে দেখবি স্বাধীনতা কাকে বলে। নিজের পছন্দ মতো সব কাজ করবি। ইচ্ছামতো ঘুরবি, প্রেম করবি।

কিন্তু কলেজে যাওয়ার পর শুনি সেই একই কথা। বড় ভাইরা বললো, এখন পড়াশোনা কর, জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় এটা। ইউনিভার্সিটিতে গেলে দেখবি মেয়েরা তোকে খুজবে। গুনে শেষ করতে পারবি না।

ভাগ্যের গ্যাড়াকলে চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে ফরেস্ট্রিতে এসে পড়লাম। এখানে এসে দেখি প্রকৃতির অসম বণ্টন। আটাশ জন ছেলের মধ্যে চার জন মাত্র মেয়ে।

এখন কি করি, তার ওপর ক্লাস টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট, সেমিস্টার ফাইনাল– সব মিলিয়ে এক বছর পার হতে যাচ্ছে। এখন আর ভালো লাগে না। একাকী জীবন সহ্য হচ্ছে না। কয়েক দিন আগে

ভ্যালেনটাইনস ডে-তে হস্টেলের সামনে বাগানে গোলাপ ফুটে আছে। খরচ লাগবে না। তারপর কাউকে দেয়ার মতো খুজে পেলাম না। হতাশ হয়ে ক্যাম্পাসে বের হলাম। গিয়েই মাথা গরম হয়ে গেল। পাশের দেয়ালগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকারা এমনভাবে বসে আছে যে, পুরো ক্যাম্পাসটা আমার কাছে অসহ্য লাগলো। হেটে হেটে শহীদ মিনারের দিকে গেলাম। এতোগুলো রিকশা দাড়িয়ে আছে অথচ একটাও নিতে চাইছে না আমাকে, আমি একা বলে। কারণ জুটি উঠলেই তো বাড়তি কিছু পাবে। তখন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে আমার অবস্থা দেখে বললো, যা

কাউকে নিয়ে আয়। তাহলেই রিকশায় উঠতে পারবি।

এ কথা শুনেই এক রিকশাওয়ালা ফিক করে হেসে দিল। আমার কাটা গায়ে লবণের ছিটা পড়লো। কিন্তু রিকশায় ওঠা হলো না। কি আর করা, চারপাশ দেখে হাটতে হাটতে এক নাম্বার গেটের দিকে গেলাম। তখনই চোখে পড়লো একটি ব্যানার– 'ভালোবাসার সুষম বন্টন চাই'। দেখেই আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হলো– 'কেউ পাবে আর কেউ পাবে না/তা হবে না তা হবে না।'

তাই আজো স্বপ্ন দেখি এ ১৪ ফেব্রুয়ারিই হবে আমার একাকিত্বের শেষ ১৪ ফেব্রুয়ারি। করতোয়া নদীর স্রোত থেমে থাকেনি, থেমে নেই জীবনও।

নিলি নামের একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি এবং ভীষণ ভালোবাসি। ওর সঙ্গে দেখা হয় না বহুদিন। জীবনের নিয়মে আমিও পাল্টে গেছি। তবুও মনে হয় পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে আমার চিরহরিৎ হৃদয়। জীবন বদলায়, বদলায় সময়; শুধু বদলায় না ভালোবাসার রঙ। তবুও আশা করি, আসছে ভ্যালেনটাইনস ডে-তে নিলি অপ্সরী হয়ে দেখা দেবে।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

তার বিহনে কেমনে বলো থাকি

অমরকৃষ্ণ পাল নান্টু

বাবার গরিব সন্তান ছিলাম আমি। সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। সুন্দর মেয়েগুলোকে দেখে ভাবতাম, পরী! ওরা আকাশে থাকে। মাটি থেকে কোনো দিনই আমি ওদের নাগাল পাবো না।

গরিব বলেই হয়তো মেধাবী ছিলাম। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সৃষ্টিকর্তা কাউকে ঠকান না। কোনো দিকে কিছু

ঘাটতি দিলেও অন্যদিকে তা পুষিয়ে দেন।

ইমাম মাঝে মধ্যেই ঠাট্টা করতো সেই ছেলেবেলায়... একে ওকে জড়িয়ে। হেসে উড়িয়ে দিতাম। প্রেম করার বয়স হয়নি। ক্লাস টেন পর্যন্ত হাফপ্যান্ট পরেছি। গোফ গজায়নি। কেমন করে প্রেমের কথা বলবো? আর তাছাড়া? ভালো ছেলের একটা তকমা জুটে গিয়েছিল গায়ে।

আমারও মনে হতো, ভালো ছেলেরা কখনো প্রেম করে না।

তাই ক্লাস নাইনের মুর্শিদা, নাসিমা, নার্গিসরা চোখের সামনে উড়ু উড়ু করলেও মনে মনেই মনকলা খেয়েছি। সাহস করে কোনোদিনও কাউকে কিছু বলা হয়ে ওঠেনি আর....।

এমনি করে করেই কলেজে গেলাম। আনন্দমোহন কলেজ। মেয়েহীন ক্লাস। শুধু সুন্দর সুন্দর ম্যাডাম আছেন।

ক্লাসে পড়াতে এলে মাঝে মধ্যে ক্লাস ভুলে সুন্দরের দিকে চেয়ে থাকতাম। ম্যাডামরা খুব সাজগোজ করে আসতেন। পরক্ষণেই মনকে শাসন করতাম। এই যে... ম্যাডাম!

কলেজে পড়াশোনার খরচ মেটাতে টিউশনি নিলাম। সবে এসেছি ময়মনসিংহে। গ্রামের আনকোরা ছেলে আমি। শহরের লোকজন দেখে ভয়ই পেতাম। কখনো কখনো লজ্জা। বিশেষত মেয়েদের কাছে।

তাইতো মাঝে মধ্যে যখন ছাত্র সুমনের বোন রিংকু বলতো, স্যার এই পড়াটা একটু বুঝিয়ে দেবেন? লাভ মানে কি?

আমি লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম।

একদিন সুন্দর এক ছাত্রীর সঙ্গে হাসতে দেখে তার মা আমার টিউশনিই বাতিল করে দিলেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা যার ঘাড়ে– প্রেম করার মতো বিলাসিতা তার কি চলে? ছাত্রজীবন থেকেই চেষ্টা করতে লাগলাম। কী করে একটা চাকরি পাওয়া যায়।

চাকরি পাওয়া গেল। প্রথম পোস্টিং পলাশবাড়ী। অফিসের সঙ্গে লাগোয়া একজনের বাড়ি। তার মায়া মায়া চোখের কাপনের কাছে বাধা পড়তে বেশি সময় লাগেনি। নাইনে পড়তো সে। কম বয়স। নাম ডলি। খুব সুন্দর গান গাইতে পারতো সে।

বাড়ি থেকে অনেক দূরে কর্মস্থল। মাসে/দু'মাসে একবার বাড়ি যেতাম। আর সারা মাস কাটতো ডলির সঙ্গে। অব্যক্ত নীরব প্রেম করে। আমি থাকতাম উপরতলায়। জানালা গলিয়ে নিচে তাকালেই দেখা যেতো ডলির ঘুম থেকে ওঠা, পড়াশোনা, স্নান, স্কুলে যাওয়া... সবকিছু।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে চলে যেতো কালীমন্দিরে প্রণাম করতে। কী যে ভালো লাগতো আমার! আমার কিশোর বয়সের প্রথম প্রেম।

আমার কলিগরা কেউই পাত্তা দিতে চাইতো না। আমার তখনো গোফ গজায়নি। কেবল দু' একটি উকি দিচ্ছে।

ডলিকে মনে মনেই ভালোবেসে চললাম।

কিন্তু লাজুক মুখচোরা ছিলাম বলে কিছু বলতে পারিনি।

বদলি হয়ে গেলাম মিঠাপুকুর। মিঠাপুকুর থেকে হাতিবান্ধা। কিন্তু ডলিকে ভুলতে পারলাম না। ডলি আমার মনের স্বপ্নচারী পরী। সারাক্ষণই সে আমার মনে থাকে। তাকে নিয়ে গল্প লিখলাম, কবিতা লিখলাম। একটা উপন্যাস লেখারও চেষ্টা করলাম। যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে ডলি। সে যে আমার স্বপ্নকন্যা।

আমার সকাল-দুপুর-রাত সবসময়েই তার সঙ্গে বসবাস। কিন্তু হায়, এখনো পর্যন্ত সে জানে না আমি তাকে ভালোবাসি। একপক্ষীয় প্রেম।

বিধাতার ছকে আমি আবারো হাতিবান্ধা থেকে মিঠাপুকুর হয়ে পলাশবাড়ী বদলি হলাম। কি করে তা সম্ভব হলো আমি জানি না। কারণ আমি কোনো তদবির করিনি।

ডলি এখন বড় হয়েছে। কলেজে পড়ে সে। যৌবনবতী নারী হওয়ার দিকে এগুচ্ছে। সে আর ফ্রকপরা ছোট্ট

কিশোরীটি নেই। গান গায় উন্মুক্ত মঞ্চে। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়।

ডলির সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আমি থাকবো না তা কি হয়? যেখানেই গান গাইতো সে, সেখানেই আমি যেতাম। কিন্তু মুখ ফুটে তাকে বলতে পারতাম না– এই যে, দেখ, তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি। কতোদিন ধরে...।

আর এতোদিনে আমার মনেও গো চেপেছে। আমি তাকে প্রথম ভালোবাসি কথাটা বলবো না। যদি ভালোবাসা সত্যি হয়ে থাকে তবে সেই বলবে। একদিন আমার এক কলিগের বউ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে জানালো– ডলি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি আনন্দে আত্মহারা। সমস্ত প্রকৃতি যেন আমার সঙ্গে নৃত্য করছে। তাথৈ.. তাথৈ... তাথৈ।

একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করবে। খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এ দেখাতো সেই দেখা নয়। যার কথা চিন্তা করছি ক'বছর ধরে সে আজ নিজে থেকেই দেখা দিতে চেয়েছে। দেবী যেন নিজেই নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে ভক্তের করুণ প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে মনোবাসনা পূরণ করতে।

এক মনোরম সন্ধ্যায় আমার স্বপ্নকন্যার সঙ্গে দেখা হলো। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। একী দেবী না মানবী। ধ্যান ভঙ্গ হলো একজনের কথায়।

দেখা হলো, কথা বলছেন না।

কি কথা বলবো? 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই কথাটি আজ পর্যন্ত কতো মিলিয়ন প্রেমিক-প্রেমিকা বলেছেন আমি জানি না। তবে আমি চাইনি, এই তিনটি শব্দের মাধ্যমে অর্ঘ্য নিবেদনের। চেয়েছিলাম, মনের মানুষ নিজেই পড়ে নিক তার নিকটজনের অন্তরের ভালোবাসার পাঠ।

কথা হলো, জল গললো, দেখা হলো, নীরবে প্রেমের পাঠ চললো। কিন্তু হায়– আবারো ছন্দপতন। সাক্ষাতের দুদিনের মাথায় আমার বদলি সুন্দরগঞ্জ।

তার কাছে ছবি চাইলাম। বললাম কাছে থেকে তো দেখতে পাবো না। তোমার সুন্দর মুখশ্রীর ছবি আমাকে দাও, আমি মন ভরে দেখবো।

সে দিয়েছিল । সুন্দরগঞ্জ থেকে চিঠি লিখলাম... কখন-কোথায় কীভাবে তোমাকে আমার ভালো লেগেছে তা আজ আর ঠিক মনে নেই । কিভাবে এ কাজটি তুমি করলে হে রহস্যময়ী ।

খুব যে ঘন ঘন যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম তা নয় । পলাশবাড়ীর ভেতর দিয়ে কোথাও গেলে খোজ খবর নিতাম । একদিন শুনলাম তার বিয়ের খোজখবর চলছে । তার বান্ধবী আমাকে জানালো, ভিন্ন জাতের কারণে তার বাবা আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি নয় ।

আমার ভেতরে নায়াগ্রার জলপ্রপাতের শব্দ পেলাম । হায় প্রেম, হায় ভালোবাসা ।

আমার জীবনে তারপরে অনেক প্রেম এসেছে । অনেক মেয়ে ভালোবাসতে চেয়েছে । কিন্তু আমি পারিনি । অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে । কিন্তু আমার ভেতরের বরফ গলাতে পারেনি ।

তাইতো মাঝে মধ্যে আমার ঘরণী বলে, অনেককে ভালো বাসতে বাসতে তোমার ভালোবাসার ভা-ার ফুরিয়ে গেছে । কিন্তু হায়, ভালোবাসা কি ফোরানোর জিনিস? ভালোবাসা সংক্রামক? ইংরেজির ছাত্রী রুম্পা আমাকে বলেছিল, যদি আপনি কাউকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন, তবে জেনে রাখবেন, সেও আপনাকে ভালোবাসবে ।

এখনও যখন রুপালি পূর্ণিমার চাদ উঠে আকাশে, ভরা বর্ষায় চারদিক থৈ থৈ হয়ে যায়, নিশুতি রাতে এমনি এমনি যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখনো মনে হয়, আমি কাকে যে খুজে ফিরি ।

আমি জানি, এখন কোনো রক্তমাংসের সুন্দরীকে আমি খুজে ফিরি না । যে সৃষ্টিকর্তা আমার অন্তরের অন্তস্থলে লুকিয়ে আছে, যে আছে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, যে আমাকে দিয়েছে অনেক, অথচ যাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি, তার জন্য হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে বসে আছি । জানি না, কখন তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানাতে পারবো?

শেরপুর, বগুড়া থেকে

চার দেয়াল

ছোট্ট রাজকন্যা

আমার ‘জান’। আমার ভালোবাসার মানুষটাকে আমি এ নামেই ডাকি। সেও তেমনি আমাকে ডাকে ‘জান’। খুব পরিচিত একটা শব্দ। কিন্তু আমরা যখন ডাকতাম তখন কাউকে তেমন ডাকতে শুনিনি। মজার ব্যাপার হলো, ঝগড়া করার সময়ও আমরা ‘জান’ ডাকি। তবে ঝগড়া না, মান-অভিমানই বেশি হয়। ও একটা পাগল! কতো আজগুবি ব্যাপার নিয়ে যে অভিমান করবে! খুব বেশি অবুঝ। মাঝে মধ্যে মনে হয় একটা ছোট বাচ্চা। ওরও নাকি আমাকে একই রকম মনে হয়। ‘বাচ্চা’। যখন বেশি অভিমান করে তখন বলি ‘আমার বাবু জান?’ ব্যস, নির্মল একটা হাসি। কোথায় পাও এতো ভালোবাসা তুমি?

অনেক দিন হয়ে গেল তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আমি।

মনে আছে, কতো ঘুরে বেড়াতাম আমরা। ‘মেয়ে’ বলে সব জায়গায় যাওয়া যাবে না– এমন ধারণার বিরুদ্ধে ছিল ও। তাই সঙ্গে করে সব জায়গায় নিয়ে যেতো। আমিও যেতাম। ভয় লাগতো না। ও বলতো, ‘শক্ত হতে হবে’। হঠাৎ কিভাবে যে কি হয়ে গেল। আমার ভালোবাসায় ভরা বিশাল পৃথিবীটা এক মুহূর্তেই ১,৫০০ বর্গফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

সত্যিই আমি অনেক শক্ত হয়েছি। তোমাকে ছাড়া আমি বেচে আছি। খাচায় বদ্ধ পাখির মতো শুধু জানালা আর বারান্দায় ঘুরে ফিরি। একটা সময় আকাশ দেখতে আমার অসম্ভব ভালো লাগতো। গভীর নীল আকাশ দেখে কেমন যেন পাগল পাগল লাগতো। ইদানীং আকাশের সঙ্গে কোথায় যেন ওর মিল খুজে পাই। মনে হয় সারা আকাশ জুড়ে ‘ও’। দেখছে আমার দিকে। আকাশের মতো ঘিরে আছে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষণে। পৃথিবীর যেখানেই আমাকে রাখুক, যতো গভীরেই লুকিয়ে রাখুক না কেন, ও সেখানে পৌছবেই। অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ছোট ফুটো দিয়ে যেমন সামান্য আলোর রেখা দেখা যায়, সেভাবেই ওর ভালোবাসার আলোও আমার কাছে আসবেই।

মানুষ চিনতে ভুল করিনি আমি, তবে বাছাই করতে অনেক বড় ভুল করেছিলাম দুজনেই। তাই হয়তো এই শাস্তি।

আজকাল খুব বেশি রেডিও শুনি। কি করবো, অফুরন্ত অবসর যে আমার। এফএম চ্যানেলগুলোতে ট্রাফিক নিউজগুলো প্রতি ঘণ্টায় দেয়। খুব মন দিয়ে শুনি আমি। যেসব জায়গার কথা বলে, কতো ঘুরেছি ওখানে তার সঙ্গে। এখন যখন শুনি মনে হয় এ ব্যস্ত রাস্তার কোথাও হয়তোবা আমার জান আছে। একা একা। মনে মনে আলতো করে হাতের ওপর হাত রাখি। বুকের ভেতরে বলি, ‘এই তো জান আমি আছি তোমার পাশে, তোমার বুকের ভেতর।’ কতোদিন দেখি না জান তোমাকে। আমার ভালোবাসার আকাশকে বলি, ‘আমার জানকে তুমি ছায়া দিয়ে রেখো।’

আচ্ছা, মনে আছে গতবারের ভ্যালেনটাইন ডে-র কথা তোমার? সকাল থেকেই বৃষ্টি ছিল। আমার

পেছন পেছন লুকিয়ে তুমি আসছিলে। অনেক দূর আসার পর হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি তুমি। সুন্দর একটা ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিলে। আবার আমাকে এক্সপ্লেইনও করেছিলে। লাল ফুলগুলো আমাদের ভালোবাসার, হলুদ ফুলগুলো বন্ধুত্বের, কমলাগুলো জীবনের প্রতীক, বেগুনিগুলো আমাদের কষ্টের রঙ আর ছোট সাদা ফুলগুলো এই সাত বছরের ছোট ছোট অনেক ঘটনার প্রতীক। এতো ভালো লাগছিল শুনতে। তুমি সত্যিই অসাধারণ।

আমাদের প্রথম দেখা করার দিনও ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। এবার অনেক দূরে আমরা দুজন। তবে শরীরটাই শুধু দূরে। আমি আছি সব সময় তোমার পাশে, যেখানেই তুমি যাও না কেন, আমি আছি। আমি আছি সকালে তোমার ঘুম ভাঙার সময়, নাশতা করার সময়, অফিস যাওয়ার সময় বাসের ভিড়ে, অফিসের ব্যস্ততায়, যখন সবার সঙ্গে লাঞ্চ করো তখনো আমি থাকি। বিকালে কাজের ফাকে সামান্য অলসতায়, সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার সময় আর রাতে যখন মায়া করে ঘুমাও তখনো।

আমি চার দেয়ালে বন্দি। আমার ভালোবাসা তো বন্দি না। শুধু তোমার ভালোবাসার কাছেই বন্দি আজীবন।

পান্থপথ, ঢাকা থেকে

প্লাটিনাম জুবিলি

এ এন ওয়াহিদ

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি প্রায় এগারো বছর আগে। যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি সে এখনো শেষ বয়সে নানা রোগব্যাধি থাকা সত্ত্বেও নিজ হাতে নাশতা বানিয়ে খাওয়াচ্ছে। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমিও প্রতিদানে তার জন্য গ্রাম থেকে আর্সেনিকমুক্ত পানি এনে দিচ্ছি।

আমরা বিয়ের পঞ্চান্ন অর্থাৎ ডাবল ফাইভ বছর কাটিয়ে দিলাম ভালোভাবেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালোই আছে। মাঝে মধ্যে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হচ্ছে। আমাদের তো সামর্থ্য নেই, তাই প্রবাসী ছেলেমেয়েরাই তাদের ভাইবোনকে সাহায্য করে থাকে। এমন কি আমাদের কানাডা প্রবাসী ছেলে আমাকে সাংসারিক খরচ দিয়ে থাকেন। মেয়েও প্রবাসী, সে এখন নিউ ইয়র্কে থাকে। সে প্রত্যেক মাসে আমাকে হাত খরচ দেয়, তার জন্য পাকু ও ফাতেমাকে ধন্যবাদ। এ লেখার মাধ্যমে ছেলেকেও ধন্যবাদ সঙ্গে পুত্রবধূ মেরুনাকেও। নাতি ও নাতনিরা ভালো থাকুক।

সময় কম তাই গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরতি পথে আলাপন টেলিফোনে এর দোকানে বসে লিখছি। দোকান

মালিক সাজ্জাদকে জায়গা দেয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সে আমাকে নানা বলে ডাকে।

ভালোবাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায়। জীবনে মানুষের সেবা করেই পরম তৃপ্তি পাই। ছাত্র জীবনে স্কাউট ছিলাম যার ব্রত ছিল দেশ আগে নিজে পরে। সেই ব্রত নিয়েই সত্তরটি বছর কাটিয়ে দিলাম।

জ্ঞানী ও গুণীরা বলে থাকেন, স্বার্থের ছোয়া লাগলে নাকি ভালোবাসা সার্থক হয় না। আমি নিঃস্বার্থভাবেই ভালোবেসে গেলাম। অবসর জীবন কাটাই নানা অনুষ্ঠানে গিয়ে, মাঝে মধ্যে গোল টেবিল আলোচনা সভায়ও যাই। অবশ্য আমার স্ত্রী এসব বেশি পছন্দ করে না। তার অভিযোগ - কেন তাকে একটা দোতলা বাড়ি করে দেয়া হলো না।

আমি শুধু বলি, বেগম সাহেবা আমাকে ক্ষমা করো, আমার এখন সময় নেই তবে আশীর্বাদ করি সৃষ্টিকর্তা যেন তোমাকে দোতলা ঘরে রাখেন। আমি মাটির মানুষ, মাটিতে অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোরেই থাকতে চাই। মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসুক এ কামনাই করি, যেন সবাই সুখে থাকে।

জিগাতলা ঢাকা থেকে

ভালোবাসা কেন কাদায়

মোহাম্মদ মোস্তাক আহাম্মেদ লিমন

রুকসানা, তুমি ছিলে আমার শশী, আকাশের এক ফোটা বৃষ্টি, একটি স্বপ্ন, একটি আশা।

ময়মনসিংহ

মনের কথা

আইনাল

স্বাগতা, মিতা, আনিকা, আখি, ফাল্গুনী, অনন্যা, সুমি, সাথী, উর্মি তোমরা অনেক ভালো থেকো এবং জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হও– এ কামনায় তোমাদের স্যার।

রাজশাহী

নিপু ও ফারজানা

ভালোবাসা দিবসে তোমাদের জানাই ফুলেল শুভেচ্ছা। ভালো থাকো, সুখে থাকো অনাদিকাল।

বন্ধু

চট্টগ্রাম

স্মৃতি

এসেছিল তুমি চলে গেলে জানি

দিয়ে গেলে শুধু স্মৃতিখানি।

মোরশেদ মিয়া

শিবপুর, নরসিংদী

মেঘ দুপুরের প্রজাপতি

বি আশিক বিশ্বাস

কে জানতো, এমন বিশ্রী একটা দৃশ্য দেখে দিন শুরু হবে! ডান পাশের খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে জামাল। তার পরনের লুঙ্গি পড়ে আছে ফ্লোরে। এ ধরনের ঘটনা আজই প্রথম নয়। আগেও ঘটেছে। সকালবেলায় জামালের লুঙ্গি কখনো গলার কাছে, কখনো পায়ের কাছে, আবার কখনো আজকের মতো ফ্লোরে গড়াগড়ি খায়। ওকে বহুবার বলা হয়েছে, রাতে ঘুমের সময় ট্রাউজার্স নয়তো হাফ প্যান্ট পড়ে ঘুমাবি। অন্য কোনো দিন হলে আজ ঠিক ঠিক দুর্ভোগ ছিল জামালের কপালে। কিন্তু আজ তাকে কিছুই বললো না রাসেল। কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাথরুমের দিকে এগোতে লাগলো।

মেঘাচ্ছন্ন সকাল। ব্যালকনিতে দাড়াতেই মুখোমুখি সাদিয়া। ওকে দেখেই মাথা নিচু করে চলে গেল সাদিয়া। অন্য কোনো দিন হলে সে হাসতো, কথা বলতো। রাসেলের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল।

গতকাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি যখন নূপুর পরে সারা শহরময় নেচে বেড়াচ্ছিল, রাসেলের ঘরে বসে গল্প করছিল ওরা তিনজন– রাসেল, জামাল আর সাদিয়া। ইউনিভার্সিটিতে এক সঙ্গে পড়ে ওরা। পাশাপাশি বাড়িতে বসবাসের সূত্রেই সম্পর্কটা আরো কাছের। সুযোগ পেলেই বাড়ির ছাদে কিংবা ব্যালকনিতে চলে সময়জ্ঞানহীন তুমুল আড্ডা। এই ত্রিরত্নের আড্ডারও কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, বর্তমান সরকার ব্যবস্থা, দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, বিপাশা বসুর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মুভি, নবাগতা প্রফেসরের উচু দাত আর পাতলা কাপড়ের ব্লাউজ থেকে শুরু করে চলতি পথের ঘটমান নানা বিষয়বস্তু লাগামহীনভাবে উঠে আসে ওদের আড্ডায়। বৃষ্টির কারণেই ছাদ এবং ব্যালকনিকে ডিভোর্স করে ওরা বসেছে রাসেলের ঘরে। হঠাৎ জামাল বললো, খালি মুখে গল্প জমছে না রে। আমি বরং দোকান থেকে মুড়ি-চানাচুর নিয়ে আসি।

সাদিয়া হাততালি দিল। ভেরি গুড আইডিয়া। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে যাবি কি করে?

জামাল উঠে দাড়ালো, নো প্রবলেম। ছাতা আছে।

রাসেল মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো ওকে। জামাল অবশ্য ইচ্ছা করেই সুযোগটা করে দিল। আড্ডায় ছেদ পড়ার সুযোগে আচমকা প্রশ্নটা করেই ফেললো রাসেল। হ্যারে সাদিয়া, তুই নাকি বেড়াতে যাচ্ছিস?

যেতাম তো আগেই, বড় ফুফুর জন্য যাওয়া হচ্ছে না। উনি বাড়ির কাজ করছেন, এ মুহূর্তে যেতে নিষেধ করেছেন।

ভেরি গুড।

ভেরি গুড কি জন্য?

একটু সময় চুপ করে থাকে রাসেল। কিছু না, এমনি বললাম। একটা কথা বলি সাদিয়া?

বল।

না থাক বলবো না।

দুই ভ্রূর মাঝখানে কিঞ্চিৎ ভাজ পড়ে সাদিয়ার। কিরে, হঠাৎ তোর কথার ভোল পাল্টে গেল মনে হচ্ছে।

নাহ, কিছু না। বাদ দে ওসব। আজ খুব সুন্দর লাগছে তোকে।

তুই তো সুযোগ পেলেই এ কথা বলিস।

আজ তোকে সত্যিই খুব সুন্দর লাগছে। একটা কবিতা শুনবি, জীবনানন্দের কবিতা!

সাদিয়া ঠোট উল্টে বলে, শোনা।

'তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে

তুমি আমার পদ্মপাতা হলে।'

সাদিয়া হাসলো। আজ তোর কি হয়েছে রে?

কি আবার হবে?

কিছু একটা তো হয়েছে। আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

লুকোচ্ছি না। তুই শুনতে চাইলে বলতে পারি। তুই আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে বলতে পারবো না।

ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে সাদিয়ার। সে অন্যদিকে ঘুরে তাকালো।

অন্যদিকে তাকালে হবে না, তুই চোখ বন্ধ কর।

এবার শব্দ করে হাসে সাদিয়া। ওকে, চোখ বন্ধ করলাম।

আজকের মতো এমন চমৎকার মুহূর্ত মানুষের জীবনে খুব বেশি আসে না। কি এক প্রশ্রয়ে রাসেল নিঃশব্দে সাদিয়ার আরো কাছাকাছি সরে এলো। ওর নিঃশ্বাসের উষ্ণতা আচ করতেই শিউরে ওঠে রাসেল। প্রত্যাশার দৈর্ঘ্য খুব বেশি নয়, স্রেফ একটা চুমু।

চমকে ওঠে সাদিয়া। এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সে কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। চোখ দুটো স্থির তাকিয়ে থাকে রাসেলের মুখের দিকে। এক সেকেন্ড... দুই সেকেন্ড... তিন সেকেন্ড... এক ছুটে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সাদিয়া।

রাসেল চোখ বন্ধ করে বসে আছে খাটের ওপর। মিশন সাকসেসফুল। তবু প্রশ্নটা কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে রাসেলের মাথায়। বান্ধবীকে চুমু খাওয়া কি খুব বেশি অপরাধ কিংবা পাপ? সাদিয়া কি খুব বেশি রাগ করবে?

সব শুনে হো হো করে হেসে উঠলো জামাল। আমাকে বাইরে পাঠিয়ে তাহলে এইসব। তা শুধু চুমুতেই ইতি নাকি আরো কিছু...।

ক্ষেপে যায় রাসেল। দেখ জামাল, সবকিছু নিয়ে ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

আরে বাহ! চুমু খাবে আবার রাগও দেখাবে।

প্লিজ জামাল, ফাজলামি করিস না। সাদিয়া খুব মাইন্ড করেছে।

আরে ধ্যাৎ। একটা চুমুতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। এতো ভাবিস না তো। মরিচ-পেয়াজ কেটে আন, মুড়ি মাখছি।

সারা রাত বড্ড অস্বস্তিতে কেটেছে রাসেলের। সাদিয়া যদি আর কখনো কথা না বলে কিংবা কাছে না আসে। কেন যে অমন কাজটা করতে গেল। এতোদিনের চমৎকার সম্পর্কটা যদি নষ্ট হয়ে যায়। এই যে ব্যালকনিতে দাড়িয়ে কতো কথা হতো সাদিয়ার সঙ্গে। অথচ আজ সে মাথা নিচু করে চলে গেল। এক

একা অনেকক্ষণ ব্যালকনিতে দাড়িয়ে থাকে রাসেল।

ততোক্ষণে ঘুম ভেঙেছে জামালের। লুঙ্গি বিষয়ক সমস্যাটা ওর কাছে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ নিয়ে কোনো কথা নয়, সে হাত রাখলো রাসেলের কাধে। কি হে মন খারাপ?

রাসেল চুপ করে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। জামাল সান্ত্বনা দিয়ে বললো, এতো আপসেট হচ্ছিস কেন? দুদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রয়োজনে আমি সাদিয়াকে বুঝিয়ে বলবো। মন খারাপ করিস না। সাদিয়াকে বুঝিয়ে সব ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার।

হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে যায় রাসেলের। বেশি মাস্টারি করিস না তো। তোর তো ব্যাটা নিজের লুঙ্গি সামলাতেই দিন যায়। সে আবার আরেকজন ম্যানেজ করে। যা ভাগ।

কথা বাড়ালো না জামাল। হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। ছাদে উঠে আসে রাসেল। মেঘ দুপুরের ঠা-া বাতাস গায়ে লাগতেই শিউরে ওঠে সে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ছাদের কোণায় এসে দাড়াতেই ওপাশের ছাদে সাদিয়াকে দেখা গেল। চোখে চোখ পড়তেই চট করে কান ধরলো রাসেল। ভুল হয়ে গেছে। প্লিজ মাফ করে দে। এই কান ধরে উঠ-বস করছি। প্রথমবারের মতো মাফ করে দে।

সাদিয়ার ঠোটে চাপা হাসি। তুই ভীষণ ফাজিল হয়ে গেছিস। এতো সহজে তোকে ক্ষমা করা যাবে না।

তোর যে কোনো শাস্তি মেনে নেবো। যা বলবি তা-ই করবো। তবু রাগ করিস না প্লিজ।

ওকে, তাহলে তুই চোখ বন্ধ করে কান ধরে পাচ মিনিট এক পায়ে দাড়িয়ে থাকবি। এই তোর শাস্তি। এরপর ভেবে দেখবো তোকে ক্ষমা করা যায় কি না?

সাদিয়ার কথামতো এক পায়ে, কান ধরে, চোখ বন্ধ করে দাড়িয়ে থাকে রাসেল। খোলা ছাদে এ অদ্ভুত ভঙ্গিমায় যুবককে দেখে বোধহয় মেঘেদেরও কৌতূহল বেড়ে গেল। জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেশ শীত শীত লাগছে। দুই মিনিট... তিন মিনিট...।

মিনিট পাচেক পর চোখ খুললো রাসেল। তার ঠিক মুখোমুখি দাড়িয়ে হাসছে সাদিয়া। আজকের বিশ্রীভাবে শুরু হওয়া সকালটার কথা বেমালুম ভুলে যায় সে।

পুলিশ লাইন, খুলনা থেকে

নয় মাস

ফরহাদ সাফায়েতুল কবীর

বিজয়,

কেন তোকে চিঠি লিখছি তা জানি না। হয়তো মনের কথাগুলো কাউকে বলে হালকা হতে হয়। এমনটা আমি ধরে নেই যে, আমি মারা গেছি। বাস্তবেই আমার মৃত্যু হয়েছে। আমি আর আগের স্মৃতি নেই। তোরা আমাকে জানতি এক দুরন্ত মেয়ে হিসেবে। একদিন আমি নিজেকে তাই ভেবেছিলাম। আমি জয়তি, আমি সাহসিকা। হায়! কতোটাই না ভুল বুঝেছিলাম নিজেকে। একদিন সহজেই যে সবার সঙ্গে মিশতো সেই আজ পালিয়ে বেড়ায় নিজের কাছ থেকে।

তোরা জানিস আমি দিদির বাড়ি বেড়াতে গেছি। আমার মা নিশ্চয়ই প্রচার করেছে সেখানে আমি মারা গেছি। আমি আমার মাকে যেভাবে বুঝি তাতে তিনি নিশ্চয়ই এ ধরনের কথা বলেছে। মার দোষ দেবো না। বাংলাদেশের কোনো মা তার মেয়ের সর্বনাশ দেখতে চাইবে না। তার তো শুধু একটা মেয়ে নয়। আরো মেয়ে আছে। একটার জন্য বাকি মেয়েগুলোকে সে মেরে ফেলতে পারে না। আমাদের সমাজে একজনের বদনামে বাকিরাও মারা পড়ে। অথচ বদনাম রটার মতো কাজ আমি করিনি। আমি একটা ঘটনার শিকার।

কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতেছি। মিছিল করেছি। সাংস্কৃতিক কর্মকা- অংশ নিয়েছি। দৌড়ঝাপ করেছি। আড়ালে অনেক বলেছে ছেলেদের মতোন মেয়ে। তখন শুনেও শুনিনি। কারণ সামনে এসে বলার সাহস তাদের ছিল না। নিজেকে নিয়ে আমারও ভয় ছিল না। আহামরি সুন্দরী ছিলাম না আমি।

কিন্তু জানতাম না অনেকেই ভেতরে ভেতরে আমাকে কামনা করে। তারা মাস্তান ছিল না। আমারই সহপাঠী ও বড়ভাই ছিল। আমার কলেজ জীবনের সহপাঠীরা যেন আলোর মাঝে ভেতরে অন্ধকার পুষে রাখতো। আমি জানতে পারিনি। কোনো একদিন অন্ধকারে তাদের আসল চেহারা বের হয়ে পড়বে। নাম বললে

তাদের চিনতে পারবি ।

বাবা ভালো মানুষ । মা সংসারের বাইরে কিছুই ভাবতেন না । তবে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরাটাকে তিনি মেনে নিতে পারতেন না । তারপরেও আমার দৃঢ়তার কারণে মা আমাকে ঘটাতেন না । আমি নির্ভার ছিলাম । আমি জানতাম আমি কোনো অন্যায় করছি না ।

তোরা তো জানিস সেদিন কলেজে এক অনুষ্ঠান ছিল । শেষ হতে খানিকটা রাত হয়ে গিয়েছিল । তোরা বলেওছিলি বাড়ি পৌঁছে দেয়ার কথা । আমি বললাম না । কারণ আমি এ সমাজেরই মানুষ । আমার ভয় কিসে । কিন্তু আমি জানতাম না মানুষও আসলে দুপেয়ে জানোয়ার মাত্র । অনন্ত অন্ধকার । বাসার পাশে হাজীবুড়ির যে বাগানটি ছিল সেখানেই তারা ছিল । তারপর অন্ধকারে আমার সর্বনাশ করলো ।

সেই প্রথম আমি মানুষকে ঘৃণা করতে শিখলাম । ভয় পেতে শিখলাম । একরাশ কষ্ট আমাকে তছনছ করে দিয়ে গেল । তারা যে কয়জন ছিল । আমি তাদের চিনে ফেলেছিলাম । জানতাম যদি চিৎকার করি তাহলে তারা আমাকে মেরে ফেলবে । তারা চলে যাওয়ার পর মনে হলো কেন আমি তাদের বোঝালাম না আমি তাদের চিনে ফেলেছি । তাহলে সেখানেই তারা আমাকে মেরে ফেলতো ।

মা বুঝতে পেরেছিল কোনো একটা গোলমাল হয়েছে । কিন্তু আমার মা তখনো সেই পুরনো আমাকেই ধরে নিয়েছিল । মা জানতো না আমি সেই সন্ধ্যায় আমাকেই হারিয়েছি ।

প্রতিদিনই তো সূর্য ওঠে । পরের দিনের সূর্য আগের দিনের মতোই ছিল । কিন্তু আমি জানলাম আমার ভেতরে মেঘ জমে গেছে । পুরুষদের আমি মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছি ।

যন্ত্রণা শুরু হলো যখন আমি জানতে পারলাম, আমার ভেতরে একজন এসেছে । সেই প্রথম আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম । বুঝে উঠতে পারলাম না আমার কি করা উচিত? আচ্ছা তুই মেয়ে হলে এ অবস্থায় কি করতি । না তোকে এ প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি । হয়তো অন্য কোনো মেয়ে হলে তা বুঝতে পারতো । আমি বিভ্রান্ত হয়েও আরেকজন পুরুষের সাহায্য নিতে গেলাম ।

তুই জানতি কি না জানি না সজল আমাকে ভালোবাসতো । ছুটে গেলাম তার কাছে । সে শুধু আমাকে ফিরিয়ে দিল না তার চোখমুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যেন আমি একটা কুলটা । যে সহজভাবে মেশার জন্য তোরা আমাকে বন্ধু ভাবতি সেটাই যেন আমার জন্য কাল হয়ে দাড়ালো । সজল বললো, আমার এ পরিণতির জন্য নাকি আমি দায়ী ।

একই কথা বললো আমার মা ।

আমি এ পৃথিবীকে বুঝতে পারি না । তারা কেন অপরাধীকে অপরাধী ভাবে না, শক্তিশালী অপরাধীদের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে? সে সময় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যারা এ কা- করেছে তাদের নাম প্রচার করে দেবো ।

সে সুযোগটি দিল না আমার মা । তিনি আমাকে কৌশলে তার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । খালু মারা গেছেন অনেক আগে । ফলে খালাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি ।

যখন আমি একাকী থাকতাম অনেকবার মনে হয়েছে মারা যাই । কিন্তু নিজের কাছে মনে হতো অন্যের পাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি তার জন্য নিজেকে হত্যা করবো কেন । খালার বাসায় আলাপ শুনে বুঝতে পারলাম তারা এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমার ভেতরে যে আছে তাকে নষ্ট করে ফেলবে । কিন্তু তারা তা পারলো না

কারণ আমি কোনোমতেই চাইনি ওটা নষ্ট হোক । আমি চেয়েছি নয় মাস পর তাকে জন্ম দিতে । যতো কষ্টই হোক, যতো অপমানই হোক, তাকে জন্ম দেবো । এ ভাবনাই যেন আমাকে আবার আগের আমিতে ফিরিয়ে আনলো । তারা এতোদিন আমাকেই নির্দেশ দিতো । আর আমি সেই নির্দেশ মেনে চলতাম । এবার আর তাদের কথামতো চলতে রাজি হলাম না । আমি আমার পেটের সন্তানটিকে পেটের মধ্যে বড় করতে লাগলাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম নয় মাসের জন্য । কারণ আমি তাকে জন্ম দেবো নিজ হাতে তাকে হত্যা করার জন্য ।

আমি পুরুষদের ঘৃণা করতে শিখেছিলাম । এ যে শুধু আমার নয়, কোনো পুরুষেরও সন্তান । সেও আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে থাকলো । জানতাম না পেটের ভেতরে যে আছে সে কে? ছেলে না মেয়ে? তুই তো জানিস যখন আমার বড় বুবুর সন্তান হবে বলে আমাদের বাসায় চলে এলো । তখন তার আদর ছিল অন্য রকম ।

যখনই তারা আমার পেটের সন্তানটিকে নষ্ট করার কথা বলতো আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাতাম । আমার এ প্রতিবাদ একটা সময় বাড়াবাড়ি হয়েছিল নিশ্চয়ই কারণ তারা আমাকে ভয় পেতো । সে সময় আমার মাথা ঠিক ছিল না । একটা পাগলিকে সবাই ভয়ই পায় । যদিও তাদের ভয় ছিল আমাকে নিয়ে তার চেয়ে তাদের বড় ভয় ছিল আমার পেটের সন্তানটিকে নিয়ে । তবে তারা জানতো আমি নিজের জীবন দেবো তবুও সন্তানটিকে পৃথিবীতে এনেই ছাড়বো । তারা হাল ছেড়ে দিল ।

তারপরও তারা আমাকে ঘরে আটকে ফেললো । আমি একাকী একটা ঘরে একটু একটু করে দিন গুনতে লাগলাম । নয় মাস আসতে আর কতো দেরি? যতোই দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো আমি গুনগুন করে গান গাইতে লাগলাম । কারণ আমার প্রতিশোধ নেয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে । সবাই ভাবলো আমি পাগল হয়ে

গেছি।

ঘরে আমার প্রতিটি দিন কাটতো কিভাবে শিশুটিকে হত্যা করবো সেই ভেবে। এর মধ্যে দিয়েই যেন আমার প্রতিশোধ নেয়া সার্থক হবে জগতের সব পুরুষের ওপর। সে সময় আমি কোনো পুরুষকে সহ্য করতে পারতাম না। এমনকি আমার বাবাকেও না। যতোক্ষণ পর্যন্ত না শিশুটি পৃথিবীতে আসবে, তাকে নিজ হাতে হত্যা করবো ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বেচে থাকতেই হবে।

আমি বেচে থাকলাম। আমার সন্তানটি বেচে থাকলো। নয়টি মাসের যন্ত্রণা শেষ হয়ে আসার সময় ঘনিয়ে এলো। আমি ভয় পেতাম আমার অগোচরে তারা না আবার সন্তানটিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলে। তারা ভাবতো আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসি। তাকে আমি এ পৃথিবীতে আনতে চাই। তাদের হুমকি দিয়ে রাখলাম যদি আমি আমার সন্তানের মুখ না দেখি তাহলে সবাইকে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়ে নিজে বিদায় নেবো।

আমার ভেতরের রক্তক্ষরণে আমি বুঝতে দিলাম না। নয় মাস শেষে হয়ে এলো। আমি বুঝতে পারলাম সময় এসেছে। আমার চোখে মুখে এক আনন্দ খেলা করতে লাগলো। আমি আমার সব কিছু দিয়ে চেষ্টা করলাম যাতে আমার ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ না হারাই। কিন্তু একটা সময় তীব্র যন্ত্রণা আমাকে কাবু করে ফেললো। যে যন্ত্রণার অনুভূতি বোঝানো যাবে না। আমি একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি সাময়িক জ্ঞান হারালাম।

ঘরে একটা দাই রাখা হয়েছিল। মা ছিল বাইরে। দাইয়ের কণ্ঠস্বর কানে বাজলো, ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছে। আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। দাইকে বললাম কোলে দাও। সে একবার আপত্তি জানিয়ে বললো আপা আপনি দুর্বল। আমি তার দিকে তাকালাম। আমার চোখের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার কারণে সে আর কোনো কথা বললো না। আমি ছেলেটিকে কোলে নিলাম। দাই বললো, ছেলেটি মায়ের মতো হয়েছে। মায়ের মতো চেহারা পাওয়া ছেলেরা ভাগ্যবান হয়। তাকে বললাম তুমি এবার যাও। সে ভেবেছিল আমি বোধহয় আমার ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াবো। সে বললো এইটা করতে নাই আপা। এরপর সে বাইরে চলে গেল। সে যদি বুঝতো তাহলে বাইরে গিয়ে চিৎকার করতো। আমি তাকে সে সুযোগটা দিতে চাইনি। সে বাইরে চলে যাওয়ার পর আমি শিশুটির গলার দিকে হাত বাড়ালাম। সে যেন কান্না থামিয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো। আমার মনে হলো এ ছেলেটা বড় হয়ে আবার কোনো মেয়েকে ধর্ষণ করবে। ওর এ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়াই ভালো। আবার হাত বাড়ালাম গলার দিকে। যেন সে তার মাকে চিনতে পেরেছে এভাবেই সে আমার হাতটা ধরে নিল। জানি না এটা আমার ভুল কি না। সেই হাত এতোটা নিশ্চিত ছিল যে গলার কাছে হাত নিয়েও হাতটা চেপে ধরতে পারলাম না। আমার নয় মাসের যন্ত্রণা, কষ্ট, বেদনা, ঘৃণা, প্রতিজ্ঞা এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল।

আমি জানি শহরে আর ফিরতে পারবো না, ফিরতে পারবো না পরিবারে, সমাজে। না ফেরার কারণটি এ শিশু। হয়তো তোদের ভালোবাসাও আর পাবো না। কিন্তু আমি এক ভালোবাসাকে খুজে পেয়েছি, যার মধ্য দিয়ে বেচে থাকতে চাই আরো অনেক বছর। আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসায় মানুষ করতে চাই। যাতে সে পশু না হয়ে মানুষ হয়। ভালোবাসাই তো মানুষকে মানুষ করে।

ইতি

স্মৃতি

ঢাকা থেকে

মহাজাগতিক

সালেহীন

রোকা, দেখো ওই গ্রহটা দেখতে সুন্দর লাগছে না?

বাট, তোমার বিশ্রি অভ্যাসটা বদলাও, যা দেখো তাই তোমার ভালো লাগে। গ্রহটায় ভালো লাগার কি আছে? চার ভাগের তিন ভাগই তো পানি।

হু, তুমি তো তাই বলবে। কেন পানি কি খারাপ? পানি না থাকলে আমরা বাচতে পারতাম বলো? আমাদের স্পেসশিপের ফিউয়েলের অর্ধেকের বেশির ভাগই কি হাইড্রোফিউয়েল থেকে আসেনি?

আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, হার মানলাম। কিন্তু এতে আমি ল্যান্ড করতে পারবো না।

কেন, সমস্যা কি?

কি? আবারো তুমি জিজ্ঞাসা করছো? ঢ-১৫৭-এ কি করলে মনে নেই? ওখানকার অধিবাসীরা কি আমাদের

চুমো খেতে চেয়েছিল? ঠিকমতো পালিয়ে আসতে না পারলে কি হতো আমি কল্পনাও করতে পারি না।

নাহ, তোমার অভ্যাস বদলালে না। সবাই কি কখনো এক হয়? চলো না এখানে নামি। তারা হয়তো খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। না নামলে ...।

তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। ঠিক আছে চলো।

অনেকক্ষণ পর ...।

রোকা : বাট, ল্যান্ড কোথায় করবো বলো তো? মূল কমপিউটারের রিপোর্ট দেখো, গ্রহটির নাম অধিবাসীরা দিয়েছে পৃথিবী। সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ আমেরিকা। এ গ্রহের অধিবাসীদের নাম মানুষ। এরা খুবই ভয়ানক। রিপোর্ট দেখো, এরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে নিজেদের ধ্বংস করছে। নাহ, ল্যান্ড করার জায়গা নেই। যারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করে তারা বাইরের গ্রহবাসী দেখলে...।

বাট : রোকা, দেখো দেখো, এ দেশটি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ, নাম বাংলাদেশ। এতে ল্যান্ড করা যায়। কি বলো?

রোকা : তুমি খুব একগুয়ে। ঠিক আছে, চলো।

ল্যান্ড করার পর ...।

রোকা : বাট, অনুবাদক লাগিয়ে চলো বের হই।

বাট : চলো। আচ্ছা এগুলো দেখেছো, কি সুন্দর, এদের বলে গাছ। সেকি! মানুষরা আমাদের দেখে ছোটাছুটি করছে কেন?

রোকা : আগেই বলেছিলাম, ওই দেখো একজন কি যেন হাতে নিয়ে আসছে।

বাট : হ্যালো, পৃথিবীর মানব, তোমাকে স্বাগতম।

স্বাগতমের গুষ্টি কিলাই, তোরা কারা, ভূত, মানুষ, জিন যা-ই হস না কেন, জলদি দশ টাকা দিয়া এখান থেকে ফুট ।

রোকা : মানে? তুমি কে?

আবার কথা কয় । প্যাদানি দিলে টের পাবে কে আমি । আমি জামাইয়ের রাজা পুলিশ । টাকা না দিলে থানায় চল । মোখলেছ

মোখলেছ : জি স্যার?

ধর এ দুইটারে । থানায় নিয়া যখন জেএমবির এহছার সদস্য বানায়া দেবো তখন টের পাইবো ।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর সবকটি মানমন্দিরে মহাজাগতিক প্রাণী প্রবেশের খবর পাওয়া গেছে । আরো জানা গেছে এরা বাংলাদেশে ল্যান্ড করেছে । সবকিছু জানাজানি হওয়ার পর দেশের প্রধানমন্ত্রী−

: প্রাণী দুটোকে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে যাও, এখনি সেখানে মহাসমাবেশ হবে । আর খবরে প্রকাশ করো, দেশের উন্নয়নের জোয়ারে মুগ্ধ হয়ে মহাজাগতিক প্রাণী এ দেশে ল্যান্ড করেছে ।

ওদিকে বিরোধীদলীয় নেত্রী বক্তৃতা দিচ্ছেন−

: আপনারা দেখেছেন কিভাবে নাটক সাজানো হচ্ছে? দুটি নিরীহ কুত্তাকে সাজিয়ে মহাজাগতিক প্রাণী বলে চালানো হচ্ছে ... ।

এদিকে রোকা আর বাট খাচা থেকে পালিয়ে−

রোকা : যাক বাবা, বাচা গেল । চল তাড়াতাড়ি পালাই । মানুষ যে কতো ভালো বোঝাই যাচ্ছে ।

বাট : দাড়াও, ওই যে, ওখানে একজন মানুষ কাদছেন । উনি একজন মহিলা । ‘মা, আপনি কাদছেন কেন?’

তোমরা কে বাবা? আমার পোলাডা আইজ তিন দিন যাবত না খাইতে পাইয়া মইরা যাইতাছে।

বাট : রোকা, শিগগির কিছু খাবার নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি।

খাবার এনে দেয়ার পর... খোদা, তোমাগো ভালো করবো বাবারা, তোমরা দীর্ঘদিন বাইচা থাকো। মহিলা বাট ও রোকাকে জড়িয়ে কাদছেন।

ফিরে যাওয়ার সময় ...।

বাট : দেখলে রোকা, সবাই খারাপ না, অল্প কিছু মানুষ দেখেই এদের খারাপ বলা উচিত নয়। সৌরজগতের এ ক্ষুদ্র গ্রহের জন্য আমি আমার গ্রহের পক্ষ থেকে নিবেদন করছি ভালোবাসা।

পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

নটরডেম কলেজ, ঢাকা থেকে

প্রজন্ম

দীপু

বিবাহিত জীবনের একযুগ পেরিয়েছে দুবছর আগেই। ভালোবাসার খরা আর কাটলো না। সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসাকে মর্যাদা না দিলে এমনটিই হয়। ভুল-বিচারের মাশুল গুনছি।

ছোট ফুপু (বাবার চাচাতো বোন, বড় হয়ে জেনেছিলাম) আমাকে বেশি আদর করতেন। পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় যখন তখন গিয়ে হাজির হতাম। এখনো আমার অনুভূতিতে আর কোনো ফুপু বা খালা এতোটা স্থান দখল করতে পারেননি।

নীলু ছোট ফুপুর মেয়ে। আমার এক বছরের ছোট, ‘লেংটা কাল’ থেকেই আমরা পাশাপাশি। গলাগলি

করে যেমন আম কুড়াতাম, তেমনি খুনসুটি করতে গিয়ে আহতও করেছি অনেক। কিন্তু ফুপু কখনোই আমাকে বকেননি।

আমার ফুপাজি ধনী ছিলেন, কিন্তু বেহিসেবি স্বভাবের কারণে নীলুর জন্মের অনেক আগেই তার অবস্থা দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে আসে। তাই ছোট ফুপুর সুখ আমি দেখিনি।

ক্লাস নাইনে ওঠার পর আমার মনে হতে থাকে ছোট ফুপুর পেছনে কোনো গল্প থাকতে পারে। কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। এদিকে আমার অজান্তেই আরেকটি গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে। নীলুকে দেখলে কেমন যেন লাগে আমার।

ফার্স্ট ইয়ারে উঠলাম। বোধহয় একটু বেশি বড় হয়ে গেছি, ফুপু এখন আর আমার কাধে হাত রাখেন না। নীলু আমাকে দেখে পালায়। তবে ফুপু আমাকে দেখে খুশি হন। ওর এড়িয়ে চলা আমাকে আহত করে। সন্দিহান হই, ফুপু কি তাহলে ওকে মানা করেছেন? কিন্তু কেন?

যাকে বউ ভাবতে শুরু করেছি সে এভাবে অচেনা হয়ে যাবে– এ মেনে নেয়া যায় না। নীলু আর ফুপু ছাড়া কেউ বাড়িতে নেই। নীলুর সঙ্গে বোঝাপড়ার এটাই ভালো সময়। ফুপু উঠানে। কথা বলিনি, মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে ওর হাত ধরে ফেলি, ‘পালাস কেন। কি দোষ করেছি আমি?’

নীলু কথা বলে না, মাথা নত করে থাকে। আমি ঝাকুনি দিই, তবুও নিশ্চুপ। ফুপু ঘরে আসছেন, তাই ছেড়ে দিতে হলো।

গ্রামের বাড়ি, প্রেক্ষাপট ১৯৮৭, আমার অভিভাবক, আরো কতো ভয়। যখনই সুযোগ পেয়েছি বলেছি, ‘নীলু তোমাকে ভালোবাসি।’

পাত্তা দেয়নি। আমার ক্রমাগত অত্যাচারে একদিন মুখ খোলে, শীতল কণ্ঠে বলে, ‘তুমি কি জানো যে সব কিছু ঠিক থাকলে আমরা সহোদর হতাম ...।

মামা সন্ধ্যায়ও মায়ের পাশে ছিলেন। ভোরের আলোয় তিনি হারিয়ে যান মায়ের জীবন থেকে। সেই থেকে মায়ের কষ্ট, আজো। দীপু ভাইয়া, আমাকে ক্ষমা করো। মায়ের ভাগ্যটা আমার ওপর চাপিয়ো না। সইতে পারবো না।’

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না । ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম রহস্য-মানবীর দিকে । বলে ‘বিশ্বাস না হলে মাকে জিজ্ঞাসা করো অথবা মামীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো ।’

পরম-আরাধ্য নীলু, কিন্তু কি শোনালো আমাকে । বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে অনেকদিন ও বাড়ি যাইনি । একদিন নীলু আসে, ‘আমাদের বাড়ি যাওনা কেন’ । আমি বলি, ‘ফুপু তো বড় আপার বাড়ি গেছে’ ।

‘ফুপুই তোমার সব ...’ ঝাঝিয়ে ওঠে নীলু ।

ওর চোখে তাকাই, সরিয়ে নেয় না । ক্রমেই ডুবে যাই ওর চোখে ।

‘দীপু, পারলাম না, শুধু শুধু তোমাকে কষ্ট দিয়েছি । যদি পারো ‘আমি আর কচি কচি দুটো মুখ’ নিয়ে একটা নতুন উপাখ্যান তৈরি করো । না পারো ... মেনে নেবো নিঃশব্দে ... মায়ের মতো ... ।’ কণ্ঠ ভারি হয়ে আসে ।

ভালোবাসার সুখ মাত্র একটি বছর স্থায়ী হয়েছিল । এ এক বছরে নীলুকে বহুবার জড়িয়ে ধরেছি, চুমো খেয়েছি কিন্তু ওর দেহ কামনা করার সুযোগ ছিল না । তাছাড়া, বিষয়টি আমার কাছে মুখ্য মনে হতো না । ওর চাহনি আর স্পর্শেই আমি শরতের মেঘের মতো ভাসতাম ।

শুধু একটা দিন বেসামাল হয়েছিলাম । বর্ষণমুখর বিকাল, বাড়িতে নীলু একা । আমার দেহ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে । চলে যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে জামা খামচে ধরে ‘বৃষ্টি থামলে পরে যাবে ।’ কাছে টানি ওকে, নিঃসঙ্কোচে সপে দেয় নিজেকে । এক যুগের পিপাসায় জড়িয়ে ধরি । পুড়ে যাচ্ছে নীলু, আমাকে ঝলসে দিয়ে । ওর তপ্ত নিঃশ্বাসে আদিম আস্বাদের গন্ধ । বাহুডোর থেকে পিছলে বেরিয়ে গিয়ে বিছানায় ধসে পড়ে । ওর ওপর ঢলে পড়ি, হৃৎপি-ের শব্দ আদিমতাকে আরো বেশি উস্কে দিচ্ছে । ফিতায় একটা টান দিতেই খুলে যায়, সালোয়ারটি একটানে হাটুর নিচে নামিয়ে আনি । হাটুতে হাত দিতেই নীলু হাপাতে হাপাতে বলে, ‘দীপু ... দীপু আমার একটা কথা শোন, ... কিছু বাকি রাখো ...

কোনো রকমে বলি, ‘পারবো না ... আমার আমানত ... আজ দিয়ে দাও ... আমাকে ।’

‘আমার কথাটি শোন ... কিছু বাকি রাখতে হয় । চেয়ে দেখো, আমি তোমার সন্তানের মা হবো । এ কলঙ্কটুকু না-ই বা করলে । এ অন্ধকারটুকু আগামী প্রজন্মের ওপর ছায়া না ফেলুক ... । প্লিজ ... আমাকে সাহায্য করো ।’

আমি মহাপুরুষ নই, কিন্তু ‘আগামী প্রজন্ম’ শব্দটি আমার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, বড় জ্বালা চেপে সংযত হই । সালোয়ারের ফিতাটি বেধে কোলে তুলে নিই ।

এরপর থেকে নীলু আমাকে দেবতা বলতো, আমি ওকে বউ বলতাম । এইচএসসি পাসের পর যেনতেন একটা চাকরি জুটিয়েই বিয়ে করবো । কিন্তু মানুষের সব স্বপ্ন যে পূরণ হওয়ার নয় ।

অর্থকষ্টে নীলুর লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পথে । অগত্যা ওর ফুপুর বাড়ি নাটোরে চলে যায় । দেহ ভরা যৌবন নিয়ে আশ্রিতা হলে যা হওয়ার তাই হলো । প্রথমে ধর্ষিতা তারপর ক্রমেই এক ব্যক্তির অঘোষিত রক্ষিতা । দুই মাসের মধ্যেই পালিয়ে বাড়ি ফিরে । ভালোবাসার পবিত্রতাকে শেষ পুজি মনে করে আমার কাছে সব খুলে বলে ।

‘আগামী প্রজন্ম’ আমার হৃৎপি- চিরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আর সরে গিয়ে হারিয়ে যাই । প্রিয় ফুপুর বোবাকান্নাও সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি আমাকে ।

ওই ধর্ষক আর আমার মধ্যে পার্থক্য কতোটা?

ঢাকা থেকে

তহমিনা

বলেছিলাম তোমায় আমি ছড়িয়ে দেবো আমার মনের আকাশে । বলেছিলাম তোমায় আমি নাড়িয়ে দেবো আমার ভালোবাসার সুরে– কথা রাখতে পারিনি হয়তো । হৃদয়ের তন্ত্রীতে আমার চাওয়া অনুরণন হয়নি হয়তো, তবুও হাল ছাড়িনি ।

পচা মানুষ

ঠিকানা বিহীন

শুভেচ্ছা

আবদুল্লাহ আল মামুন

হাসান, রবিউল, শফিক তোমরা কেমন আছো। মনে হয় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। আমি কিন্তু তোমাদের ভীষণ মিস করছি, তোমরা কি আমাকে...।

ভালোবাসা দিবসে কক্সবাজার সৈকতে ঘুরবো। আমি একা, জানি তোমাদের ছাড়া সৈকতে ভালো লাগবে না। তারপরও তো জীবন...। তোমাদের ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা।

নয়াবাজার, টেকনাফ

শুভেচ্ছা

মনের সবচেয়ে ভালোলাগা অনুভূতি দিয়ে তোমাকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানালাম।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মনি

খোকসা, কুষ্টিয়া

বার্তা

সেকান্দর

হারিয়ে গেছস কখন কোথায় একটু টেরও পাইনি। হারিয়ে যাওয়া প্রহরগুলো তোদের কাছে চাইনি। তোদের খুব মিস করছি আমি।

রুমকি, রেশমা, নিরু ভালো থাকিস সবাই এক টুকরো মেঘ হয়ে।

রাউজান, নোয়াপাড়া

এক দিন হঠাৎ

সুব্রত ব্যানার্জী

সুতপার সঙ্গে আমার কথা বলা বন্ধ বাজে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। সেদিন পদার্থ বিজ্ঞান পড়ছিলাম। পানির প্লবতার সূত্র। চিন্তাগুলো পানির প্লবতার মতোই মন থেকে উপচে পড়ছিল। হঠাৎ মনের গহীনে সৃষ্টি হলো দুটি লাইন :

‘তুমি যেন এক দূর-নীহারিকা,

তোমা বিহনে আমি থাকি একা।’

ঘোরের মধ্যে থেকেই কবিতাটি লেখা শেষ করি। ফিশফিশিয়ে আবৃত্তি করি। পাশের ঘরে আপা আর ডলি। সুতপা ডলির বান্ধবী, শৈশব-সঙ্গী। সুতপা আর ডলি সহপাঠী। কিন্তু ওকে তো এতোদিন বিশেষ কিছুই মনে হয়নি। কবিতাটির ওপরও জন্ম নিয়েছে মায়া। আমি কবিতা লিখি কিন্তু রাখি না, লেখার পরই ছিড়ে ফেলি। কিন্তু এ কবিতাটি ছিড়তে পারছি না। উভচর মানুষের পাতার বিছানায় যত্ন করে শুইয়ে রাখলাম কবিতাটিকে। দুপুরে ঘরে আসে ও! বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কে লিখেছে? ওর হাতে আমার সেই কবিতাটি।

উত্তর দিলাম, ওটা একটা কবিতা!

সুতপা আরো গম্ভীর। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা আমাকে নিয়ে লিখেছো কোন দুঃখে?

কে বললো, তোমাকে নিয়ে লিখেছি? সুতপা উঠে দাড়িয়েছে।

চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দাবানল।

আমি বলছি!

টেবিলের ওপর কবিতাটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও। টেবিল থেকে কবিতাটি তুলে নিয়ে ছিড়ে ফেললাম। একটুও মায়া হলো না। সেই থেকে আজ নিয়ে চৌদ্দ দিন সুতপার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ। এই তো সেদিনও সুতপার বেণি ধরে টান দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছি অথবা রিকশায় করে কোনো কাজে চলেছি দুজন মৌচাক মার্কেটে কিংবা অন্য কোথাও। কখনো তো মনে হয়নি ওকে নিয়ে কিছু লিখবো!

সকালে কলেজে যাচ্ছি। সুতপা দাড়িয়ে আছে ওদের বারান্দায়। কিছু বললো না। সন্ধ্যায় দেখি ছাদের রেলিংয়ে ভর দিয়ে পৃথিবী দেখছে। দেখেও কিছু বললো না, নিস্পৃহভাবে দাড়িয়েই রইলো।

এক দিন সুতপা, ডলি আর আপা পাশের ঘরে গল্প করছে। সুতপাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করলো। ব্যস্ততার ভান করে ওদের ঘুরে ঢুকে বলি, আপা এ ঘরে বোধহয় 'যাও পাখি' বইটি ফেলে গেছি।

এখানে তোর কোনো বই নেই।

আহা, একটু খুজেই দেখো না।

চারদিকে একবার দেখে নিয়ে আপা ধমকে ওঠে, তোর ঘরে খোজ গিয়ে যা।

ড্রয়িং রুমে এসে টেলিভিশন ছাড়ি। ডাইনিং স্পেসে সুতপা পানি খেতে আসে। কোনো কথা না বলে ফিরে যায় গল্পে।

আরেকদিন বাসার সবাই বারান্দায় বসে কথা বলছে। সুতপাও আছে সেখানে। পানি খাওয়ার অজুহাতে সেখানেই যাই। ডলি বলে, একা একা ঘরে বসে কি করছো? এখানে এসো, বাবা সেন্ট্রাল এশিয়া ভ্রমণের গল্প শোনাচ্ছে।

উত্তর দিই, কাজ আছে, বাইরে যাবো।

চা খাওয়া আর আড্ডা মারা ছাড়া আর কি কাজ তোমার?

সবাই হেসে ওঠে। সুতপাও। আমি কি আর সেখানে বসি!

মাঝে মধ্যেই সুতপার মুখোমুখি হই। জিজ্ঞাসা করি,

কি?

যান্ত্রিক উত্তর আসে, ভালো ।

নিজের কাছে নিজে আরো ছোট হয়ে পড়ি । তাহলে কি কবিতাটি লেখার জন্য সুতপার কাছে ক্ষমা চাইবো?

ওর সঙ্গে দেখা হয় খালাতো বোনের জন্মদিনে এবং আলিয়স ফ্রসেজে চিত্র প্রদর্শনীতে । জন্মদিনে কথা না বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া গেল । বিপদে পড়লাম আর্ট একজিবিশনে গিয়ে । ওর সঙ্গে ওর বড় বোন মিঠু । মিঠু আপার অভিযোগ, কয়দিন বাসায় আসছিস না যে?

মুখ দিয়ে যথার্থ উত্তর আসে না । শুধু বলি, কাল যাবো ।

মিঠু আপা হাসতে হাসতে অনুমান প্রকাশ করেন, নাকি সুতপার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিস? তার অনুমানকে অসার প্রতিপন্ন করতে গিয়ে কৌতুকপূর্ণ হাসির সৃষ্টি হয়– এমনকি সুতপার মধ্যেও ।

পহেলা ফাল্গুন বারান্দায় বসে গল্পের বই পড়ছি । কলিং বেল বেজে উঠলো । দরজা খুলে দিতেই দেখি সুতপা! মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকি । সংবিৎ ফিরে পেলাম কঠিন নির্দেশে, পথ ছাড়ো!

দরজা ছেড়ে সরে দাড়ালাম । বললাম, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ।

ওর নিস্পৃহ উত্তর, তাই নাকি?

একটু পরে ও ডলিকে নিয়ে বারান্দায় এসে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বাইরে চলে গেল ।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখি আমার টেবিলে একটি বক্স! মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে আসে একটি শাদা খাম ।

খামের ভেতরে ভাজ করা একটি খয়েরি কাগজ । সুতপা লিখেছে– জ্যোতিকে ফাল্গুনের শুভেচ্ছা । সঙ্গে একটি মাটির কলমদানি, তাতে গেরুয়া রঙের ওপর শাদা রঙ দিয়ে আকা গাছ, পাখি আর ছয়টি ছোট

ছোট শাদা খরগোশ ।

সিদ্ধান্ত নিলাম কবিতাটি লেখার জন্য সুতপার কাছে ক্ষমা চাইবো! রমনা পার্ক থেকে সুতপার জন্য ব্যাগ ভর্তি করে পলাশ ফুল নিলাম । আমি জানি, সুতপা পলাশ ফুলগুলো পেয়ে খুশি হবে । গত ফাল্গুনে তো আমরা একসঙ্গেই রমনা পার্কে পলাশ ফুল কুড়িয়েছিলাম ।

প্যাকেটটি দিতেই ওর চোখ খুশিতে ভরে উঠলো । ফুলগুলো দেখে শুধু বললো, সুন্দর!

তারপর বললো, কি খবর তোমার?

এই তো ভালো, স্বল্প পরিচিতের মতো আমি বললাম, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল ।

সুতপা বললো, বেশ তো বলো!

আসলে জানো, সেদিন আমি ইচ্ছা করে কবিতাটি লিখিনি । আমার মনে হচ্ছে, কাজটি অনুচিত হয়েছে ।

ও বললো, সেসব কথা থাক, তোমার খবর কি বলো ।

সেদিন আমরা অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম ।

আজ সুতপার জন্মদিন । ও আমার কাছে লা মিজারেবল বইটি চেয়েছিল, এবার ওকে তা-ই দেবো । বইটি কিনে নিয়ে ওদের বাসায় চলে গেলাম ।

দরজা খুলে দিলেন ওর মা, বললেন, কি রে, সুতপা তো কলেজে গেছে, তুই যাসনি?

বললাম, গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল না তো তাই যাইনি? আমি বইটি রেখে এলাম সুতপার টেবিলে ।

বিকালে সুতপার গলার আওয়াজ পেয়ে বুক গুড়গুড় করে উঠলো । আবার কোনো অঘটন ঘটালাম না তো! ও ঘরে এসে ঢুকলো । মিষ্টি হেসে বললো, বই যে দিলে, কিছু লিখে দিলে না কেন?

লিখলাম– সুতপাকে দিলাম, কেন দিলাম তা সুতপাই জানে।

জ্যোতি, সেই কবিতাটি কোথায়?

চমকে উঠি! উত্তর দিই, ওটা তো সেদিনই ছিড়ে ফেলেছি।

সুতপা উঠে দাড়ায়, দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাড়ায়, বলে, অমন কবিতা আবারো লিখো।

সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর থেকে

দিবা

জানো কি, আমার স্বপ্নের রাজকন্যা তুমি? অবশ্য না জানারই কথা। কারণ কতো রাজপুত্র তোমার আশপাশে ঘুরঘুর করে কিন্তু তুমি কাউকেই পাত্তা দাও না। আর আমি তো রাজপুত্র না, অতি সাধারণ একজন। আমি সাধারণ হলেও তোমার প্রতি আমার আবেগ, ভালোবাসা অসাধারণ। বছর ঘুরে আবার ভালোবাসা দিবস আসছে। তুমি আমাকে না চিনলেও তোমাকে জানাচ্ছি হ্যাপি ভ্যালেনটাইন্স ডে। অনুরোধ করবো অন্তত একবার এই সাধারণ ছেলেটার অসাধারণ ভালোবাসা পরখ করে দেখার জন্য।

শিমুল

চাপাই নবাবগঞ্জ

ভালো থেকো

ডিগ্রি পরীক্ষার এগারো দিন পর একটা হাই স্কুল থেকে প্রস্তাব এলো খ-কালীন শিক্ষক হিসেবে সময় দেয়ার জন্য। হাতে সময় ছিল রাজি হয়ে গেলাম। আমার জন্য সবচেয়ে উত্তেজনার বিষয় ছিল, আমি নিজেও ওই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। শিক্ষকতায় নতুন নয়, এর আগে একটি বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় সুনামের সঙ্গে অল্প কয়দিন ইংরেজি পড়াতে হয়েছিল। তা ছিল এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর পরই। যা-ই হোক, শুরু হলো শিক্ষকতা।

ছাত্র জীবনে খুব ভালো ছাত্র না হলেও বিতার্কিক ছিলাম বলে শিক্ষকতা করতে স্বাচ্ছন্দ্যই লাগলো। শিক্ষার্থীরাও সন্তুষ্ট। মজা করে কথা বলতে পারার সুনাম ছিল বন্ধু মহলে সেটাও কাজে দিল। মজার মজার গল্প বলতাম বলে বাচ্চারাও পছন্দ করতে লাগলো খুব। জটিল জিনিস সহজে করে বলার অভ্যাস আমার চিরদিনের। ক্লাসের চেয়ারে তেমন বসতাম না। বোর্ড এবং চকের ব্যবহার করে পুরো ক্লাসটা উপভোগ্য করে তুলতাম। সিনিয়র শিক্ষকদের স্নেহ পেতাম।

এভাবে চলতে লাগলো। খুব উপভোগ করছিলাম। ছাত্র জীবন থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা ছিলাম বলে সে দায়িত্বগুলোও আমার ওপর এসে পড়লো। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতাম কখনো বন্ধুর মতো, কখনো ভাইয়ের মতো, আবার শাসনেও ছিলাম কড়া। আর এ জন্য সবচেয়ে জুনিয়র শিক্ষক হয়েও ক্লাস নাইনের ক্লাস টিচার হিসেবে দায়িত্ব বর্তে ছিল আমার ওপর।

খুব রস করে বাংলা পড়াতাম। সহজ করে পড়াতাম ব্যাকরণ। সরল ভাষায় বোঝাতাম সাধারণ বিজ্ঞান। অল্প অল্প করে পড়াতাম ইংরেজি। হাতে-কলমে শিখাতাম হিসাববিজ্ঞান। বিভিন্ন ক্লাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর আবেদন আসতো আমাকে তাদের ক্লাস নেয়ার জন্য। অবশ্য অঙ্কে বরাবরের মতোই দুর্বল ছিলাম। ভালো ছাত্রছাত্রীদের সব সময় স্নেহ করতাম। খুব বেশি দূরত্ব ছিল না। দুর্বলদের সঙ্গেও ওরাও সমান পছন্দ করতো। ছাত্ররা খুটিনাটি বিষয় নিয়ে ক্লাসের বাইরে যখন প্রশ্ন করতে আসতো তখন কাজের জন্য আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতাম।

একটা ঘটনা, শিক্ষকতা করেছিলাম মোট সাড়ে তিন বছর। শেষের দিকে এক দিন অন্য এক ক্লাসে এক ম্যাডাম বাংলা দ্বিতীয়পত্রের টিউটরিয়াল পরীক্ষা নিচ্ছেন। বিষয় ছিল 'প্রিয় শিক্ষক'। প্রায় নব্বই জন ছাত্রের মধ্যে সাত-আটজন ছাড়া বাকি সবাই আমার নাম লিখেছিল। তখন ম্যাডামের কাছে শুনে বিষয়টি খুব হালকাভাবে নিয়েছিলাম। এখন শিক্ষকতা পেশায় নেই। এখন বুঝি একজন শিক্ষকের জন্য সেটা কতোটা আনন্দের।

সব কিছু ঠিকমতো চলছিল। কিন্তু একটা কালো দিবস আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা কখনো ভাবিনি। ভাবার অবকাশও ছিল না। যুবক শিক্ষক বলে এমনিতে সব সময় সতর্ক থাকতাম, তবুও শেষ রক্ষা হলো না। ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যে ও সংস্কৃতির ব্যাপারে উৎসাহ দিতাম বলে অনেককে অনেক সময় গান, কবিতা, রচনা, বক্তৃতা, জারি গান এসব লিখে দিতে হতো। আমার মনে আছে এক ছাত্রীর ছোট ভাই আরেক ছাত্রীর ভাগ্নের নাম রাখার জন্য নাম চাইতে এসেছিল, দিয়েছিলাম এবং রেখেও ছিলাম। দুই-তিন ছাত্রীর বিয়েও দিয়ে দিলাম, এতোটা কাছাকাছি এবং আপনও হয়ে গিয়েছিলাম।

যা-ই হোক, মেয়েটি ক্লাস এইটে পড়তো। গ্রীষ্মের ছুটিতে বৃত্তির কোচিং চলছিল। মেয়েটি একটি গান লিখে নিতে চাইলো। ক্লাসে দিতে চাইনি। অফিসে এলো। দিলামও। কিন্তু সে মেয়ে সেখান থেকে গিয়ে যা

রটালো সে অপ্রিয় শব্দগুলো এবং তার কষ্টের ভাগ পাঠক নাইবা নিলেন।

শুনে স্কুলে যেতে ইচ্ছা হলো না। প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতিকে সব জানালাম। জানিয়ে বললাম, এ অবস্থায় আমার পক্ষে গিয়ে মেয়েদের সামনে দাড়ানো সম্ভব নয়। তখনো বাইরের লোকরা জানে না। এক সপ্তাহের জন্য চলে গেলাম ট্রেইনিংয়ে। দিন দশেক পর স্কুল খুললো। স্কুল খোলার দিন পাচেকের মধ্যে সব চাউর হয়ে গেল। ওই মেয়ে যা বলেছে মানুষের মুখে মুখে তার দশগুণ বেশি রটে গেল। ক্ষোভে ও ঘৃণায় সব অন্তর পুড়ে গেল। এ কেমন বিচার।

হেড স্যার বললেন, কয়দিন অফ থাকো, পরে ক্লাস নিও।

বললাম, কখনোই আর নয় স্যার। সহসভাপতি বললেন আপনি অন্তত এক সপ্তাহ ক্লাস নেন, না হলে এই বদনাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

সেটাও পারলাম না। অতি উৎসাহীরা রসালো আলাপ জমালো। বখাটে ছেলেরা সমালোচনা করলো। কুচক্রীরা ফায়দা লুটতে চাইলো। আত্মীয়-স্বজন সবাই জানলো। জানলো ভাই-বোন এবং আমার দুঃখিনী মাও। লজ্জায় আর দুঃখে আত্মহত্যা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কেনো জানি মনে হলো ওই মেয়ে হয়তো তার ভুল স্বীকার করবে। প্রচ- মানসিক যন্ত্রণায় সারা পৃথিবী অচেনা মনে হলো। এই কঠিন সময়ে সবচেয়ে কাছের বন্ধুরা এগিয়ে এলো। যারা আমার সঙ্গে এক সঙ্গে শোয়া-বসা করেছিল। আমার ভালো-মন্দের সব জানে। তারা বিশ্বাস করেনি এ অপবাদ। যেখানে শুনেছে, যার কাছে শুনেছে, প্রতিবাদ করেছে আর আমাকে দিয়েছে বেচে থাকার সান্ত্বনা।

ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিল, স্কুলে প্রতিবাদ করলো। বাড়িতে এসে আমার মাকে বোঝালো। স্রোতের বিপরীতে কথা বলা সত্যিই কঠিন ছিল। আজ মূলত ওদের স্মরণ করেই এ লেখা। তোমরা সবাই এখন কলেজে পড়ো। তোমাদের এ নগণ্য শিক্ষকটাকে তোমরা সেদিন যে বিশ্বাস দিয়েছিলে তার যে সত্যিই কোনো মূল্য হয় না। আমি সারা জীবন তোমাদের জন্য আশীর্বাদ করে যাবো। তোমরা যেখানেই থাকো। ভালো থাকো।

আজ সাতাশ বছর পেরিয়ে আটাশে পড়ছি। মা-বাবা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু চাপা একটা কষ্ট, একটা আতঙ্ক আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। যদি বিয়ে ঠিক হয়ে ভেঙে যায় এই অপবাদে। যদি বউ সব শুনে সন্দেহ করে। যদি ছেলেমেয়ে বড় হলে লোকরা তাদের খোটা দেয়। তাহলে এই কষ্ট আর আমি সইতে পারবো না। কিন্তু সে কথা কাউকে বলতে পারছি না। শুধু মাকে বলছি মা আর কয়টা দিন যাক।

মনে মনে এই আশা হয়তো এবার বাড়ি গিয়ে শুনবো যে মেয়েটি বলেছে। সে যা বলেছে তা সত্য নয়।

এতোটা কষ্ট নিয়ে তবু বেচে আছি, মানুষের প্রতি আজো বিশ্বাস হারাইনি। কারণ এখনো আরো হাজারো মানুষের ভালোবাসা নিয়ে বেচে আছি। শহরে যেসব ফার্মে চাকরি করেছি সহকর্মীরা ভীষণ পছন্দ করে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা এখনো ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। নারী সহকর্মীদের বিশেষ করে সিনিয়র বোনদের যে স্নেহ আমি সর্বত্র পেয়েছি তাতে বারবার চোখে জল এসে যায় হয়তো এতোসব ভালোবাসার মূল্য দিয়েছি সেই একটা ঘটনায়।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মারজিয়া

তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসবো... অনন্ত জীবন।

ইমরান

ময়মনসিংহ

ভালোবাসি বাংলা মাকে

আসুন না, আজ সবাই শপথ নিই। এই অভাগা বাংলা মাকে অকৃত্রিম ভালোবেসে যাবো এবং সর্বোতভাবে তার দুঃখ-দুর্দশা, অভাব দূর করে তাকে সমৃদ্ধি এনে দিয়ে সত্যিকার দেশপ্রেমিক হবো। এ হোক ভালোবাসা দিবসে আমাদের প্রতীক্ষা এবং একমাত্র লক্ষ্য।

আশেকের রাসুল নোমানী

r_nomani@yahoo.com

লিজা দিদি

তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি লিজা দিদি। আমাকে ভুলে যেও না।

সামিউল ইসলাম

গাইবান্ধা

আগাথা

এম এ মালেক

পাকিস্তানের সীমান্ত শহর পেশোয়ারে কলেজে পড়ার সময় প্রিন্সিপাল স্যারের মেয়ে গ্রেসের সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) আসার পর ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে নির্বাচন হয়। রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে দেশের দুই অংশে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আমার পেশোয়ার যাওয়া হয়নি। লন্ডন হয়ে গ্রেসের চিঠি আসে আমি যেন তাদের কাছে চলে আসি। অভিজাত ক্রিশ্চিয়ান পরিবারটি আমার মতো একজন ভিন্নধর্মী বাঙালি যুবককে কিভাবে গ্রহণ করবে, আমার সংশয় হয়। আমার যাওয়া হয়নি।

এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইচ্ছা ছিল একবার পেশোয়ার যাওয়ার। কয়েক বছর পর সুযোগ ঘটে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটা সেমিনারে অংশগ্রহণ শেষে পেশোয়ার যাই। কলেজে গিয়ে শুনি প্রিন্সিপাল স্যার লোকান্তরিত। ম্যাডাম ছিলেন শিক্ষিকা। স্কুলে গিয়ে জানতে পারি তিনি অসুস্থ ও ছুটিতে। সেখানে তার লিভ ভ্যাকেনসিতে (খবধাব ঠধপধহপু) তার আত্মীয়া কাজ করছেন। ম্যাডামের সঙ্গে দেখা হয়। শুনেছি আমার আসার জন্য পিটিএ পাঠিয়ে ছিলেন, যা ফেরত আসে।

এই মর্মে আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার পর আর কোনো খবর নেই। তারা ধরে নিয়েছিলেন আমি বেচে নেই। গ্রেসের অমতে বিয়ে হয়। একটি কন্যা সন্তান রেখে গ্রেসের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সেই কন্যাটিই বর্তমানে ম্যাডামের লিভ ভ্যাকেনসিতে স্কুলে কাজ করছে। সব শুনে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। আমাকে আপন করে নেয়। গ্রেসের কন্যা আগাথাকে নিয়ে গ্রেসের সমাধিস্থলে যাই। আরো অন্যান্য স্থানে ঘুরি। ফিরে আসার সময় আগাথা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে বলে গ্রান্ডমার মৃত্যু হলে আমি কার কাছে থাকবো, তোমার যাওয়া হবে না। আমার ফেরা হয় না।

আমার ফিরে আসা স্থগিত হওয়ায় পলকে সব মেঘ সরে গিয়ে আকাশ ঝকঝকে। সবাই খুশি। অসুস্থ ম্যাডাম যেন নবজীবন ফিরে পেয়েছেন। ইদানীং ডাইনিং টেবিলে এসে আমাদের সঙ্গে খাবার খেতে শুরু করেছেন। তার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে আগাথা আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে।

আগাথা যথারীতি স্কুলে যায়। ম্যাডাম বিশ্রাম করেন। আমি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই। মেইডও বসে নেই। আমাকে কতোক্ষণ পর পর চা, কফি দিয়ে যায়। সদা ব্যস্ত সে আমার পছন্দের ব্যঞ্জন তৈরিতে। বুঝতে পারি এ সবই হচ্ছে আগাথার নির্দেশে। আমার যেন সময় কাটছে না, আলস্য বাড়ে।

কলেজের সহপাঠীদের কথা মনে পড়ে। একদিন বের হলাম। শহরের কিচ্ছাখানি বাজারে আমার এক পাঠান বন্ধুর বাবার স্টেশনারি দোকানে মাঝে মধ্যে যেতাম। শহরের পরিবর্তন হলেও খুজে পেতে বেগ পাইনি। বন্ধুটিকে (করম এলাহী) পেলাম। ইয়া লম্বা দাড়ি, পরনে মিলিশিয়া রঙের সালোয়ার কামিজ। আমাকে সজোরে চেপে ধরে আলিঙ্গন করলো। পশতু, উর্দু ও ইংরেজিতে যেভাবে খুশি কথা বলতে বলতে অনেক বেলা হলো। পাঠানরা গল্প করতে ওস্তাদ। মেহমানদারিতে আরো একসারি ঊর্ধ্বে। অনেক অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে হলো। বিকালে ফিরলাম। কাউকে দেখলাম না। কোনো খবর না দিয়ে এভাবে এতোক্ষণ বাইরে রয়েছি। অপরাধী অপরাধী ভাব আমার। দেখলাম ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে। বুঝলাম আগাথা খায়নি। আগাথা এলো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বললো, মুখ হাত ধুয়ে এসো, খাবে। আমি থতমত খেয়ে বললাম, আমি মানে...

খেয়ে এসেছি, এই তো?

হ্যা, ওরা এমনভাবে ধরলো যে...

আর ছাড়লো না কেমন! মুচকি হেসে আগাথা আমার জন্য খাবার সাজালো। নিজে খেতে বসলো। আমিও যৎসামান্য খেলাম। মেঘ কেটে গেছে এতোক্ষণে।

একদিন বিকালে বারান্দায় দাড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। মেইড এসে বললো দিদি ছাদে গেছেন, আপনাকে যেতে বললেন। আমি ছাদে গেলাম। ছাদের চারদিকে রেলিংয়ের পাশে টবে নানা জাতের ফুলের সমারোহ। দেখি আগাথা রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে।

মেইড আমাদের জন্য চা নিয়ে এলো। চা খাওয়া শেষ হলে আমার সিগারেট ধরানোর ইচ্ছা জাগে কিন্তু আগাথার খবরদারির ভয়ে (সিগ্রেট পিনা আচ্ছা নেহি হ্যায়) সে ইচ্ছা ত্যাগ করি। দূরে পাহাড়ের সারি। আকাশের গায়ে যেন পাহাড় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। সন্ধ্যা পার হয়ে এবার নামলো আধারের রাত। সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল বাতাস। দূর আকাশে তারার ঝলমল। আমরা তবুও বসে রই।

দেশে ফেরার জন্য কয়েক দিন থেকে মন উসখুশ করছিল। কতো দিন হয়ে গেল আমি আমার মায়ের

ভাষায় কথা বলতে পারছি না। ভাবছি শিগগিরই দেশে ফিরে আসবো।

সেদিন দেখলাম ম্যাডামের গ্রামের বাড়ি থেকে দু-তিনজন নারী-পুরুষ আত্মীয় এলেন। তাদের নিয়ে ম্যাডাম গ্রেসের সমাধিস্থলে গেলেন। আগাথা আমাকে নিয়ে বেরুবে বলে প্রস্তাব দিল। সুবোধ বালকের মতো হ্যা সূচক মাথা নাড়ি। আমরা শহরের কিসসাখানি বাজার ঘুরে ক্যান্টনমেন্টের গোরা বাজারে গেলাম।

আমরা সাদত হোসেন মিন্টোর শ্রেষ্ঠ গল্পের বই, কয়েকটা ম্যাগাজিন, দুটি বাংলা উপন্যাস, খুশবন্দ সিংয়ের এ ট্রেইন টু পাকিস্তান বইটি কিনি। আগাথা জুয়েলারিতে ঢুকে গহনার ক্যাটেলগ দেখতে শুরু করে। আমাকেও দেখায়, পছন্দ করতে বলে। আংটি দেখায়, আমার পছন্দ হয় কি না জানতে চায় এবং টেইলারিং শপে ঢুকে ড্রেসের অর্ডার দেয়। আমার জন্য নেকটাই কিনলো। ফিরতে বেশ দেরি হয়।

ছুটির দিনে সাধারণত সবাই একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটলো। আগাথা আমাকে ডেকে তুললো এবং বললো সিমেট্রিতে যাবে। ধীর পায়ে গ্রেসের সমাধির কাছে আমরা দাড়িয়ে মোমবাতি জ্বালাই। দু-হাত তুলে দু-জনে গ্রেসের আত্মার শান্তি কামনা করি। বাসায় ফিরে মনে হলো কেমন জানি সাজ সাজ ভাব। কিছু বুঝলাম না।

বিকালে আগাথা ওয়ারড্রোব থেকে আমার কমপ্লিট সুট ও টাই পছন্দ করে বের করে দিল। বললো, রেডি হও। দ্রুত চলে গেল সে।

ম্যাডামের ব্যস্ততা দেখে আমি বলি, আমরা কি কোথাও যাচ্ছি? ম্যাডাম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আগাথার রুমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এবারো কিছু বুঝলাম না, যন্ত্রচালিতের মতো সুট-টাই পরে ফিটফাট হয়ে বসলাম। দূর ছাই! একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বারান্দায় দাড়াতেই আগাথার আবির্ভাব।

মৃদু হেসে বললো, সিগ্রেট পিনা আচ্ছা নেহি হ্যায় (সিগারেট খাওয়া ভালো নয়)।

আমরা শহরের ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চে পৌছলাম। এবার দেখছি ম্যাডামের আত্মীয়রা ও মেইড। সঙ্গে বড় দুটি চামড়ার সুটকেস। ম্যাডাম গিয়েই পাদরির সঙ্গে কতোক্ষণ কথাবার্তা বললেন। বেশ লোকজন, কাউকে চিনি না। আগাথাকেও দেখছি না। একা দাড়িয়ে।

একটু পর আগাথার নতুন সাজ দেখে বিস্মিত হলাম। সে ওয়েডিং ড্রেস (ডবফফরহম উৎবংং) পরেছে। ম্যাডাম এলেন, আমার হাত ধরে এসেম্বলি হলের দিকে এগুলেন। কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি

ঘটতে যাচ্ছে। ম্যাডাম আমাকে ও আগাথাকে নিয়ে পাদরির কাছে বসালেন। ওয়েডিং কেক (ডবফফরহম ঈধশব) কাটা হলো।

পাদরি মোমবাতির আবছা আলো-আধারিতে অনুচ্চারিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। আগাথা আমার দিকে এগিয়ে এসে তার ডানহাত বাড়িয়ে দিল ওয়েডিং রিং নিয়ে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আগাথার অনামিকায় ওয়েডিং রিং পরাতে পরাতে বললাম, এ তুই কি করলি?

শ্বেত বসনা আগাথা নতজানু হয়ে আমার পদধূলি নিল। ওর সোনালি চুল ঝর্নার মতো পিঠময় ছড়িয়ে পড়লো। আমার বুকের মধ্যে পায়রার উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার মম তোমাকে মিস করেছে কিন্তু আমি তোমাকে মিস করবো না।

পূর্ব শেওড়াপাড়া

মিরপুর, ঢাকা থেকে

রূপকথার রাক্ষস

মুনীর হাসান

জানালা খুলতেই কন্যাকে মোহিত করে একটি লয়সমৃদ্ধ সুর! কন্যা পায়ের পাতার ওপর উচু হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সুরের উৎস খোজে, কিন্তু তা পাওয়ার আগেই পেছন থেকে আসা এক জোড়া খড়মের শব্দ কন্যাকে টেনে নিয়ে যায় হাড়ি-পাতিল-বাসন-কোসন আর বিভিন্ন ধরনের কৌটা-শিশি-বোয়ামে ভরা রান্নাঘরে।

বাড়ির আব্রুরক্ষী পাটকাঠির বেড়ার ফাক-ফোকর দিয়ে চুইয়ে আসা সুরের মদিরা কন্যাকে ভিজিয়ে দেয়। কন্যা ঝিম ধরে, চিবুকে ডান হাত ঠেকিয়ে কন্যা উতল বসে থাকে আর সুরের মূর্ছনা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার হৃৎপিং- প্রবেশ করে ছড়িয়ে যায় শরীরের শিরা-উপশিরায়। এ সংক্রমণে সে গুনগুনিয়ে ওঠে! আর তার বোধ আচ্ছন্ন করা কুহক সুর ঢিমে লয়ে ক্রমাগত দূরে যেতে যেতে দক্ষিণের বিলের পথে লীন হয়ে যায়...

কন্যা নিজেকে বলে ‘কিডা হতি পারে? ইরাম তো আগে শুনিনি!’

হঠাৎ কন্যার কিছু মনে পড়ে। সে গা-ঝাড়া দেয়। মট মট করে হাতের আঙুল ফোটায়। দরজার বাইরে গলা বাড়িয়ে চোখ কুচকে হাতের আড়ালে সূর্য দেখে আতকে ওঠে। তারপর ঝটপট সে কোলা থেকে কৌটা মেপে হাড়িতে চাল নেয়। কাঠকুটি চুলায় গুজে ফস করে ম্যাচ জ্বালে, কুপি ধরায়, আঙুলে লেগে যাওয়া কুপির তেল-কালি মাথায় মোছে। পাটকাঠি দিয়ে চুলা ধরায়। চুলা ধা-ধা জ্বলে ওঠার ফাকে চাল ধুয়ে হাড়ি চাপায় চুলায়। তারপর বটি পেতে তরকারি কোটে খচ খচ!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না শেষ করে কন্যা এসে দাড়ায় জানালার ধারে। রান্নাঘর থেকে থালা-বাটি নড়াচড়া, ছোট ভাই-বোনের তর্কা-তর্কি, হাসি, কোলাহল ভেসে আসে। কন্যার মা রান্নাঘর থেকে তাকে খেতে ডাকে। কন্যা রান্নাঘরের দিকে নিজেকে ফেরাতেই খোলা জানালা দিয়ে ভূতপূর্ব সুরটা ছুটে এসে কন্যাকে ছোয়! সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা উড়ে এসে জানালায় উকি দেয়! যতোদূর চোখ যায় ফাকা। সুরটাও আর শোনা যায় না। মন খারাপ করা দুপুরটা ঝুলতে থাকে কন্যার চার পাশে...

পরের খুব ভোরে সেই মোহিনী সুর কন্যাকে লেপের তল থেকে টেনে তুলে রাস্তায় এনে দাড় করিয়ে দেয়। কন্যা দেখে গোলাপি চাদর গায়ে ঝাকড়া চুলের এক কুমার হেটে আসছে এবং মায়াবী সুরটা কুমারের ভেতরের থেকেই আসছে। কুমার কন্যার সামনে এসে থামে। নীরব রহস্যময় হাসে, মাথা ঝুকিয়ে কন্যাকে অভিবাদন জানায়, তারপর কুয়াশা হয়ে যায় ...

সারাদিন কন্যার কাজে শুধু ভুল হয়। কন্যা খামোখাই একলা হাসে আর গোলাপি হয়ে ওঠে। সে যে দিকেই তাকায় সব কিছু সজীব-সুন্দর হয়ে ওঠে। পৌষের কড়া শীত হয়ে ওঠে ফুল-ফল কুজনে ভরা প্রাণ মাতানো বসন্তের সুগন্ধী বিকাল!

পরের খুব সকালে কন্যা সেজে-গুজে পথে এসে দাড়ায়! কুমার কুয়াশার ভেতর দিয়ে ভেসে এসে কন্যার সামনে থামে, অভিবাদন জানায়, হাসে, কন্যা শরমে হাস-ফাস করে আর সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে ধুকতে ধুকতে ফিশফিশায় বিষুদবার, তিন গ্রাম পার হয়ে সে এক জায়গায় যাবে, কুমার যেন তার জন্য বসে থাকে, গ্রামের শেষ মাথায় পূর্ব খাল পাড়ে।

কুমার অনেকটা নুয়ে তার কথায় সম্মতি জানায় আর হাসতে হাসতে কুয়াশা হয়ে যায়।

বিষুদবার গ্রামের শেষ মাথায় খাল পাড়ে দাড়িয়ে কুমার দেখে কন্যা আসছে, কন্যার চুলে রেশমি ফিতা, শাদা গোলাপ, ঘাড়ে ঝোলা ব্যাগ, ঠোটে রং, হাতে পালকের নকশি পাখা। কুমারের চোখে রোদ চশমা, গায়ে ডোরাকাটা জামা।

তারা মুখোমুখি হয়। কন্যা হাসে, কুমারও হাসে, কন্যার হাত থেকে পালকের পাখা নিয়ে বাতাস খায়। কন্যা বলে, 'সুমায় আমারে তাগাদা দেচ্ছে। আমার সামনে ম্যালা পথ। সন্ধ্যের আগেই পার হতি হবে তিন বিল, তিন খাল, আর তিন জঙ্গল।'

কুমার অভয় দেয়, আমার পঙ্ক্ষীরাজের পিঠে বসিয়ে পার করে দেবো তোমার সব পথ। কুমার কন্যার হাত ধরে নিজের হাতে। কন্যা কাপে ঝির ঝির যে রকম বৃষ্টিতে দীঘির জল।

কুমার ডান হাত আকাশে তুলে তুড়ি বাজায়। আকাশ থেকে নেমে আসে এক পঙ্ক্ষীরাজ।

কন্যা অপ্রস্তুত বোকা হাসে। দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে চাদ্দিক! কুমার বলে 'উঠে এসো'।

কন্যা বলে 'আমার ভয় করতিছে'।

কুমার ভরসা দেয়, 'ভয় নেই। আমার পঙ্ক্ষীরাজ খুব ভদ্র'।

কন্যা কাপা কাপা হাতে কুমারের বাড়ানো হাত ধরে।

কুমার তাকে টেনে তোলে পঙ্খীরাজের পিঠে। পঙ্ক্ষীরাজ উড়তে শুরু করতেই কন্যার ভয় কেটে যায়, তারা উড়তে থাকে। তাদের অনেক নিচে নিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, ভাগাভাগি, খেয়োখেয়ি, যুদ্ধ মারি মড়কের দুনিয়া। বাতাসের উজান টানে তারা ভেসে যায়, যেতে থাকে। তাদের চারপাশে গানের পাখি, গান গায়, মেঘে মেঘে রঙের কারুকাজ, আলো-ছায়া, মায়া রহস্য অপার! কুমার একটা গান ধরে ভরাট দরদি সুর প্রসারিত হয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। তারা অনেকক্ষণ প্রবাহিত হতে থাকে। এক সময় তারা মাটির টানে নিচে নেমে আসে। তাদের সামনে নিজেল জলের সুন্দর এক ছোট্ট নদী। চার পাশে বন নির্জনতা, কন্যাকে কুমার পঙ্ক্ষীরাজের পিঠ থেকে হাত ধরে মাটিতে নামায় আর বলে 'কন্যা আমি ক্ষুধার্ত, তোমার কাছে কি খাবার আছে?'

কন্যা বলে, 'মনে হতিছে আমারও খিদে লাগিছে।'

'তাহলে তো কোনো কথাই থাকতে পারে না' বলেই কন্যাকে কুমার জড়িয়ে ধরে।

কন্যা ভয়ে কেপে ওঠে আর অনুনয় করে ‘এসব কি হতিছে? তুমার পঙ্ক্ষীরাজ কুথায়?

তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল, সন্ধে হয়ে আসতিছে, মা আমারে কসপেনে রামকসা ।’

কুমার ভরসা দেয়, ‘ভয় কি আমি আছি না?’

কন্যা ভরসা পায় না, চার পাশে রূপকথা খুজে পায় না, সে দেখে বাশঝাড়ের মধ্যে কুমার তাকে জব্দ করে জড়িয়ে ধরে পিষছে । কন্যা ফুপায়, হাসফাস করে, কুমার ফিশফিশায় কন্যার কানে, ‘ভয় পেও না, আমাকে বিশ্বাস করো, আমরা দুজন ক্ষুধার্ত মানুষ একই সঙ্গে অন্য এক ক্ষুধার্তের খাদ্য । রূপকথার পঙ্ক্ষীরাজে যারা উড়ে বেড়ায় এক সময় না এক সময় রূপকথার রাক্ষসের সঙ্গে তাদের দেখা হবেই । এখন আমরা দুজনেই সেই রূপকথার রাক্ষসের খাদ্য । সে আমাদের খাবেই ...

খুলনা থেকে

সুধা

আমাদের সেই দিনগুলোর কথা কি এখনো মনে আছে, নাকি ভুলে গেছো? এখন কেমন আছো, কোথায় আছো জানতে খুব ইচ্ছা করছে । পৃথিবীর যেখানেই থাকো ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে এ প্রত্যাশা রাখছি । তোমার ছোটবোনকে আমার আদর দিও । ভ্যালেনটাইনস ডে-তে তোমার জন্য রইলো লাল গোলাপ শুভেচ্ছা ও হৃদয়ের অ-নে-ক ভালোবাসা ।

মামুন

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মিনি বার্তা

মসিউর রহমান

‘পড়ন্ত বেলায় খুব করে তারে মনে পড়ে ।’

ঠিকানাবিহীন

ময়না মিনজী

রনজু তিরকী

মনের শৈত্যপ্রবাহটা কমছে না; বরং বেড়েই চলছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসেই অনুভব করছি তোমাকে। তোমাকে ভালোবাসি কথাটা নতুন নয়। পাচ বছর আগেও তোমাকে ভালোবাসতাম। এখনো তোমাকে ভালোবাসি এবং সারা জীবন ভালোবেসে যাবো।

পীরগঞ্জ, রংপুর

মিস ফার্স্ট ইয়ার

আবদুল্লাহ আল-ইমরান

সকাল আটটা থেকে নতুন তৈরি হওয়া কলেজ গেটের সামনে কৌতূহল নিয়ে দাড়িয়ে আছে ওয়ালিদ। কাধে একটা সবুজ রঙের ব্যাগ। এ ব্যাগটা ছোট মামা আমেরিকা থেকে ভালো রেজাল্ট করা উপলক্ষে প্রেজেন্ট করেছে। সঙ্গে একটা দামি ঘড়ি। আজই প্রথম ব্যাগটা কলেজে আনলো ওয়ালিদ। অবশ্য এর একটা কারণও আছে। এ ব্যাগটা কাধে না থাকলে তিষা তাকে চিনবে না। কারণ তিষার সঙ্গে ওয়ালিদের কখনো দেখা হয়নি।

শান্ত স্বভাবের ছেলে ওয়ালিদের অস্বস্তি লাগছে খুব। প্রথমবারের মতো তিষার সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথা। সকাল সোয়া আটটার কথা থাকলেও অলরেডি আটটা চল্লিশ...! তিষার কোনো খোজ নেই। তবে তিষা ইতিমধ্যে কলেজে এসেছে কি না ওয়ালিদ বুঝতে পারছে না। কারণ তিষাকে সরাসরি কখনো দেখেনি ওয়ালিদ। মোবাইলে কথা হয়েছে শুধু। অসম্ভব সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ মেয়েটির। একবার কথা বলা শুরু করলে আর থামতে ইচ্ছা করে না।

প্রথম যখন ওয়ালিদ মোবাইল কেনে তখন ও খুব এক্সাইটেড ছিল। তবে ওর এক্সাইটমেন্ট অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসার পর। অচেনা নাম্বারটা অল্প দিনেই ওয়ালিদের খুব চেনা হয়ে যায়।

ঘটনাটা এক দিন ঝলমলে বিকালের। টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল

ওয়ালিদ। কিন্তু ঘড়িটা কোথাও খুজে পাচ্ছিল না। টেবিলে না, বিছানায় না, ওয়ারড্রবে না, এমনকি প্যান্টের পকেটেও না। সাধারণত টেবিলের ওপরই ঘড়িটার থাকার কথা। খোজার জন্য ড্রয়ারে হাত দিতেই শব্দ করে বেজে ওঠে মোবাইল। খুশি মনে সেটটা হাতে নিয়ে ও দেখলো, ফোন বুকে সেভ করা কোনো নাম্বার নয়, অচেনা একটা নাম্বার। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে একটা শীতল মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওয়ালিদ।

ভালো আছেন?

জি ভালো আছি। কিন্তু আপনি কে?

আমি তিষা।

তিষা! এ নামের কাউকে তো আমি চিনি না।

আহ! চিনবেন কি করে, আজই তো আপনার সঙ্গে আমার প্রথম কথা হচ্ছে।

মানে?

মানে খুব সোজা। আমি সম্পূর্ণ না জেনেই এ নাম্বারে ফোন করেছি এবং তার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা যার নাম্বারই হোক না কেন, আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো। এখন সোজা সোজা বলুন তো আপনি আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করবেন কি না?

প্রথমেই মেয়েটির এমন উদ্ভট কথায় ওয়ালিদ খানিকটা অবাক হলেও খুব ধীরে ধীরে এ অবাক হওয়া মুগ্ধতায় রূপ নেয়।

ওয়ালিদের আনন্দের বাউন্ডারি ওভার হয়ে যায় যখন শোনে মেয়েটি অর্থাৎ তিষা খুলনার। তার শহরেই থাকে এবং ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তিষাও আনন্দের সাগরে ডুবে সাতার কেটেছিল কি না জানা না গেলেও ওপাশ থেকে তার আগ্রহের সীমাটা বেড়েছিল বোঝা যায়।

ঝড়ের মতো বয়ে যাওয়া তিন মাসে অনেক আনন্দ ভাগাভাগি করেছে ওয়ালিদ আর তিষা। তবে

সরাসরি নয়; সেলফোনে। মাঝে মধ্যে কারণে-অকারণে রাগারাগি হয়েছে। আবার সরি, সরি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়েছে দুজনারই।

সেই অদেখা, পর্দার অন্তরালের মেয়েই গতকাল ওয়ালিদকে শুনিয়েছে এক টাসকি খাওয়ার মতো কথা। সে দেখা করতে চায়। যদিও ওদের দুজনেরই শর্ত ছিল, কখনো দেখা করবে না। কিন্তু হঠাৎ যে কি হলো...। দেখা করার জন্য নেচে উঠলো উভয়েরই মন।

তিষাই ওয়ালিদকে জানিয়েছে, আগামীকাল দেখা হচ্ছে আমাদের। আনন্দের আতিশয্যে ওয়ালিদ বলেছে, কোথায়, কখন?

আগামীকাল সকাল সোয়া আটটায়, সিটি কলেজ গেটে। ওয়ালিদ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

ওমা। তুমি সিটি কলেজে? আমিও তো সিটি কলেজে পড়ি।

বলো কি? এ তো দেখছি অদ্ভুত কানেকশন...।

তাই তো দেখছি। যাই হোক তোমায় চিনবো কি করে?

আমার হাতে নীল ফাইল থাকবে।

আর আমার কাধে সবুজ ব্যাগ।

উত্তেজনায় ওয়ালিদের একবারও মনে হয়নি, নীল ফাইল তো আরো অনেকেই নিয়ে আসতে পারে। এখন দেখা যাচ্ছে ঘটনা ঘটলো তাই। এ চল্লিশ মিনিটে ওয়ালিদ কম করে হলেও দশটা নীল ফাইল হাতে মেয়েকে দেখেছে। কিন্তু এদের কাউকেই তিষা বলে মনে হয়নি। কারণ হলো চোখের দৃষ্টি। কারো চোখেই অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছিল না। যেটা তিষার চোখে থাকার কথা।

ওয়ালিদের প্রচ- রাগ হচ্ছে। এতো এতো মেয়ের মাঝে কোনটা যে তিষা এটা খুজে বের করা আর এক ডুবে পাতালপুরী থেকে দৈত্যের প্রাণভোমরা তুলে আনা প্রায় সমপর্যায়ের দুঃসাধ্যের কাজ। কিন্তু তিষাও তো সবুজ ব্যাগ খুজতে পারে, না কি?

জিন্সের পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটা বের করতে যাবে ঠিক তখনই একটা মেয়ের দিকে দৃষ্টি আটকে গেল ওয়ালিদের। মেয়েটার হাতে নীল ফাইল। মেয়েটা ওয়ালিদের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। গোলাপি রঙের আটসাট কামিজ পরা মেয়েটাকে এই প্রথম ওয়ালিদের তিষা বলে মনে হলো। কারণ তার চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি। মেয়েটা খুব কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওয়ালিদের দিকে তাকাচ্ছে।

ওয়ালিদ এক অদৃশ্য ভালো লাগার শিহরণে পুলকিত হলো। ও দেখে তিষার ভালো ফিগার, সুন্দরীও বটে। টাইট ফিটিং ড্রেস পরায় শরীরের উচু-নিচু ভাজগুলো স্পষ্ট। তবে অবর্ণনীয় কোনো স্নিগ্ধতা চোখে পড়লো না। আটপৌরে ওয়ালিদও আর দশটা ছেলের মতো দারুণ স্মার্ট নয়। তবে বন্ধুদের মধ্যে ব্যক্তিত্ববান ছেলে হিসেবে বেশ পরিচিতি আছে। ওয়ালিদের চল্লিশ মিনিটের পুঞ্জীভূত অভিমান বরফ হয়ে গলতে শুরু করলো তিষাকে দেখার আনন্দে। কিন্তু একি! তিষা চলে যাচ্ছে কেন? ওকি তাকে চিনতে পারেনি। এমন তো হওয়ার কথা নয়...। এখনো ওয়ালিদের পিঠে সবুজ ব্যাগটা সীমান্ত রক্ষীদের পতাকার মতো জ্বলজ্বল করছে।

তিষা শোনো বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলে ওয়ালিদ।

তুমি কি তিষা?

পেছন ফিরতে ফিরতে মেয়েটার চিকন ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হয় খানিকটা। তারপর মিষ্টি স্বরে বলে–

হ্যা।

এতো দেরি করলে কেন?

কেন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে নাকি...?

প্রচ- এক ধাক্কা খায় ওয়ালিদ। বলে–

আমি ওয়ালিদ। আমাকে চিনতে পারছ না?

মেয়েটা কিছুটা সময় নেয়। ওয়ালিদকে ভালোভাবে দেখে বলে–

কতো ছেলেকে মনে রাখবো বলো...? তবে কলেজ ক্যাম্পাসে তোমাকে দু-একবার দেখেছি হয়তো।

ওয়ালিদ ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়। মেয়েটি হাসতে হাসতে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকে। ওয়ালিদ চুপচাপ বিধ্বস্ত মূর্তির মতো দাড়িয়ে থেকে নতুন তৈরি হওয়া গেটের দিকে তাকায়। তামার পাতে খুব সুন্দর করে লেখা ‘সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ’। কেন যেন নামটাকে ওয়ালিদের খুব অপরিচিত মনে হয়। ঠিক তখন এক ঝাপটা লিলুয়া বাতাস রোদেলা সকালের ব্যস্ততা ডিঙিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ওয়ালিদের মুখের ওপর আছড়ে পড়ে।

মুনাদের বাড়িতে যাওয়া মাত্র তিষাকে ঘিরে ধরে কেয়া, বীথিকা, মুনা ও লাবণী।

কি রে খবর কি? দেখা হয়েছিল?

সবাই যেন এক সঙ্গে প্রশ্ন করে। তিষা বিরক্তি ফুটিয়ে তোলে চোখে-মুখে।

আরে বাদ দে তো। একটা আনস্মার্ট, ভ্যাগাবন্ড। দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। পরিচয়ই দেইনি। বলে কি না তুমি কি তিষা? তিষার বলার এমন ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। কেয়া বলে, আগেই বলেছিলাম তোর ভাগ্যে জুটবে এমন একটা রামছাগল। কেয়ার এ কথায় সবাই আরেক রাউন্ড হেসে উঠলো। পরিস্থিতি খানিকটা ঠা-া হলে মুনা বলে–

এখন কি করবি?

কি করবো মানে? ওকে তো বুঝতেই দেইনি যে আমি ওকে চিনেছি। এমন ভাব করেছি যে, ওয়ালিদ নামের কাউকে চিনিই না। নামও শুনিনি কোনো দিন।

লাবণী ও বীথিকা বললো, শাবাশ।

তারপর লাবণী আগ বাড়িয়ে বললো, এই নে শিল্প ব্যাংকের ম্যানেজারের ছেলের নাম্বার। দেখ, ভাব করতে পারিস কি না। দারুণ স্মার্ট আর সুদর্শন– বুঝলি।

খুশিতে লাবণীকে জড়িয়ে ধরে তিষা। থ্যাংক ইউ লাবণী, থ্যাংক ইউ। নতুন অ্যাসাইনমেন্টের জন্য সবাই তিষাকে উইশ করতে লাগলো। গুড লাক তিষা। গুড লাক। কমপিউটার বক্সে তখন মাঝারি শব্দে বাজছে জেনিফার লোপেজের গান– ওয়েটিং ফর টু নাইট... ইউ আর ইন হেয়ার মাই আর্মস... ওয়েটিং ফর টু নাইট...।

সেদিনের ঘটনার পর থেকে ওয়ালিদ বহুবার তিষার নাম্বারে ফোন করেছে। কিন্তু একবারও পায়নি। প্রতিবারই একটা নারী কণ্ঠ খুব সুন্দরভাবে বলেছে, ‘দুঃখিত। এ মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে একটু পরে আবার ডায়াল করুন।’

ওয়ালিদের জীবনে নারী কণ্ঠের সেই একটু পর আর কখনো শেষ হয়নি।

ওদিকে সেদিনের সেই তিষাকে ওয়ালিদ প্রায়ই একটা সুদর্শন ছেলের সঙ্গে বৈশাখী হাওয়ার মতো মোটরবাইকে ঘুরতে দেখে। আর দেখে কারণে-অকারণে ছেলেটির শরীর ঘেষে খিলখিল করে হাসতে।

jeloj2007@yahoo.com

খুলনা থেকে

অ্যাডভান্স

চঞ্চল শাহরিয়ার

বালিকারা বড় হয়। খুব দ্রুত বড় হয়। এ কথা বুঝতে বুঝতে হাতছাড়া হয়ে গেল সব। হাতছাড়া হয়ে গেল অদিতির বোন, শারমিন সুলতানা...।

ওরা কারো সঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছে, রিকশায় ঘুরছে। মোবাইলে কথা বলে পার করে দিচ্ছে রাতকে রাত।

আমি বোকার হদ্দ। গল্প, কবিতা লিখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি। ভাবছি, এভাবে হোক না দেশ হিরণ্ময়ী।

মিষ্টি মিষ্টি বালিকারা কেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করার মতো কাউকে পাচ্ছি না। যাকেই জিজ্ঞাসা করবো তার কাছেই বকা খাবো। মানু ভাই, শিলু আপা, সাদিয়া আফরিন, রাতুল, সামিন কারো ওপর ভরসা রাখতে পারছি না।

এদিকে সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। অদিতির বোনকে ফোন দিলে আমার কণ্ঠস্বর শুনে লাইন কেটে দেয়। শিলু আপা হ্যা-হু, আচ্ছা, ঠিক আছে বলে ফোন রাখার জন্য ব্যস্ত হয়। শহরের সবচেয়ে অসুন্দর মেয়ে ঝরনা যে আমাকে এক রাতে মোবাইলে 'সোনা পাখি' বলে ডেকেছিল, সে-ও আজকাল আমার ফোন পেয়ে বিরক্ত হয়। আমি কথা শুরু করতেই হাই তোলে। বলে ঘুম আসছে।

সন্দীপন কোচিং সেন্টার থেকে ফেরার পথে মিতুকে ধরলাম। ওকে বললাম, তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

মিতু সাই করে চোখ মেরে বলে, প্রেম করছিস?

না।

শালা।

শালা বললি কেন?

মিথ্যা কথা বললি, তাই।

আমি মিতুর গা ঘেষে দাড়িয়ে বললাম, আমি পৃথিবীতে দুইজন মানুষের কাছে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। একজন তুই। আর একজন...।

মিতু চোখ নাচিয়ে বলে, কে আর একজন?

মুশকিলে পড়ে গেলাম। এ মুহূর্তে তেমন কারো নামও মনে করতে পারছি না। ফট করে বললাম, চৈতী।

চুল খুলে বাধতে বাধতে মিতু বলে, এতোক্ষণ ভেবে এই নাম বের করলি? বাবার জন্মেও আমি তোর মুখে এই নাম শুনিনি।

আমি অধৈর্য হয়ে বলি, এতো জেরা করিস না তো। আমার জরুরি কথাটা শোন...।

চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে মিতু বলে, আমাকে আইসক্রিম খাওয়া।

সাউথ সেন্ট্রাল রোডে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে মিতুর জন্য আইসক্রিম কিনি। রিকশায় ওর পাশে বসে ওকে নিরালায় ওদের বাসায় পৌছে দিতে যাই।

যাওয়ার পথে মিতু বলে, এই আমাদের বাসায় গিয়ে আমাকে কমপিউটার শেখাবি?

আমি বলি, অন্য কারো কাছে তো শিখতে পারিস।

তুই শিখাবি কি না বল। মাস গেলে বেতন দেবো।

ফাজিল।

আমি ফাজিল বলার সঙ্গে সঙ্গে মিতু আমার গালে টুক করে চুমু খেয়ে দিল।

আমি বললাম, এটা কি হলো?

মিতু হাসতে হাসতে বলে, কমপিউটারের টিচার হিসেবে তোর বেতনটা অ্যাডভান্স দিয়ে দিলাম।

কোটচাদপুর, ঝিনাইদহ থেকে

মি. স্যাকামাইসিন

হাসান জামিল

ভাবি বউকে নিয়ে আমার কিছু রোমান্টিক ফ্যান্টাসি আছে। যা অনেকটা এ রকম :

ফাগুন মাসে শিমুল ও পলাশ ফুল ফোটে। লাল লাল ফুল দেখতে বেশ চমৎকার। মনে রোমান্টিকতা জাগায়। মৌ মৌ ফুলের সৌরভে চারদিক সুবাসিত হয়ে যায় ঋতুরাজ বসন্তকালে। ঠিক তেমনি এক পড়ন্ত বিকালে বউকে নিয়ে ঘুরতে যাবো এ রকম একটি জায়গায়। যেখানে শিমুল-পলাশ ফুটে আছে অজস্র। তার পরনে থাকবে রক্তজবা শাড়ি। ঠোটে লাল গাঢ় লিপস্টিক। হাতে রেশমি চুড়ি। চুড়ির রঙও লাল। কপালে লাল টিপ। পড়ন্ত বিকালের সোনাঝরা রোদ তার মুখে উপচে পড়বে। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তা তাকিয়ে দেখবো।

আমি সোহেল। একটি বিদেশি সংস্থার জুনিয়র অফিসার। বয়স ত্রিশ। আমার জন্য পাত্রী দেখা হচ্ছে। বেশ কয়েকজনের মধ্যে এক পাত্রীকে পরিবারের সবার পছন্দ হলো। পাত্রীর জীবন বৃত্তান্ত মোটামুটি এ রকম। তসলিমা খান কণা। জন্ম তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি। বি.এ পাস। বাবা-মা আছেন। দুই ভাই এক বোন। পাত্রী ভাইদের ছোট। পাত্রীর একটি ৩জ ছবিও দেখলাম। তার পরনে সবুজ রঙের সালোয়ার-কামিজ। রেশমি চুল। গভীর কালো চোখ। বেশ টানা টানা। ঠোটে লাল লিপস্টিক। দেখে মুগ্ধ হলাম। সবুজ পোশাক ও ঠোটের লাল লিপস্টিকে পাত্রীকে টিয়ে পাখি, টিয়ে পাখি মনে হচ্ছে।

এ কন্যাটি মনে হয় টিয়ে প্রজন্ম থেকে মানব প্রজন্মে রূপান্তর ঘটেছে। মুহূর্তে ভালো লাগলো তাকে। ভাবীকে আমার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলাম।

যথাসময়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পাত্রীর বাসভবনে চলে গেলাম। সামনা-সামনি দেখলাম। কথা হলো। বিয়ের তারিখও নির্ধারণ হলো দুই পক্ষের আন্তরিক সম্মতিতে।

একেকজন মেয়ে থাকে ভারি স্বপ্নিল। তাদের চোখ কথা বলে। চোখে ময়ূরকণ্ঠী নাও অবিরত ভাসিয়ে বেড়ায়। মনে হয় স্বর্গসুখের চাবিখানি তারই কাছে আছে। মুনা সে গোত্রের মেয়ে।

নিশিদিন তার কথা ভাবি। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে। মুনার সঙ্গে আমার মাত্র গুটিকয়েক কথা হয়েছে।

তাতেই আমার মনে হয় সে আমার জন্ম-জন্মান্তর থেকে পরিচিত।

এর মাঝে ভাবী মুনার আরেকখানি শাড়ি পরা ছবি নিয়ে এসে দেখালো। এ

ছবিটিতে তাকে লক্ষ্মী লক্ষ্মী লাগলেও টিয়ে টিয়ে ভাবখানি নেই। তাতে একটু আহত হলাম।

ভাবী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। সে এক জ্যোতিষকে দিয়ে মুনার কোষ্ঠি-ঠিকুজি বের করেছে। জানা গেল মুনা মীন রাশির মেয়ে। মীন রাশির মেয়েরা খুব সংসারী হয়। স্বামীর অনুগত থাকে। মুনা মীন না হয়ে অন্য রাশির হলেও আমার আপত্তি থাকতো না।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন। ঠিক বিয়ের দুদিন আগে খবর এলো মুনা একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে। তার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

মুহূর্তেই সবাই হতবাক। বিষাদে ছেয়ে গেল আমার হৃদয়। স্বপ্নগুলো ভেঙে গেল খান খান হয়ে। ঘটনাটি বিশ্বাস হচ্ছিল না। না এ রকম হতেই পারে না। আমাদের পরিবারে একটা মোটামুটি শোকের ছায়া নেমে এলো। আমি দেখেছি– ভাগ্যদেবী আমার প্রতি খুব অপ্রসন্ন। তার সঙ্গে আমার চিরকালের বৈরিতা। আমি বড়ই কপালপোড়া।

ভাবী খুব আহত হলো এ ঘটনায়। আমাকে বললো– সবাই প্রেম করে ‘স্যাকা’ খায়। তুমি বিয়ে করতে গিয়ে ‘স্যাকা’ খেলে। এখন থেকে তোমার নাম স্যাকামাইসিন। মি. স্যাকামাইসিন। নামটা কেমন হলো, বলো তো।

ভাবীর কথা শুনে দুঃখেও হাসি পেল। তবে ভাবীর খেতাবটি ভাল লাগলো। বিরহের সঙ্গে ‘স্যাকামাইসিন’ শব্দটির একটি যোগসূত্র আছে। সেটা ভেবে অবাক হলাম।

রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুমহীন চোখে মুনাকে নিয়ে ভাবি। আহা মুনা। তুমি ওমন করলে কেন? আমি তো তোমাকে নিয়ে বড্ড বেশি স্বপ্ন দেখেছিলাম। জানো, বাড়ির সবাই তোমাকে ভারি পছন্দ করেছিল। ভীষণ। এবং আমিও। মুনাকে নিয়ে একটি বিরহের কবিতা লিখতে হবে। যা থাকবে বিষাদে ভরা। খুবই করুণ।

মাঝে মধ্যে গভীর রাতে মুনার কাছে মনে মনে টেলিফোনে কথা বলি- হ্যালো মুনা- হ্যালো- আমি

এখনও তোমাকে ভালোবাসি। হ্যালো- তুমি কি শুনছ? হ্যালো। হ্যালো মুনা- শুনছো।

দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে। হাহাকার করে হৃদয়। আমার দুঃখগুলো জমাট বেধে পাথর হয়ে যায়। স্বপ্ন দেখি মুনাকে নিয়ে। সেই মৃদু লাজুক মুখ, গভীর কালো চোখ, টানা ভ্রূর অধিকারিণী মুনা নামের সেই মেয়েটি আমার জীবনে আর ফিরে আসবে না। সে আমার জীবনে মরীচিকার মতোই থাকবে।

দোহার, ঢাকা থেকে

jamil99@cellmail.net

বৈশাখী

সঞ্জয় মজুমদার

বৈশাখী নামটা বেশ সুন্দর, প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। প্রথমে তার অভিভাবককে ধন্যবাদ দিই তার এ সুন্দর নাম রাখার জন্য। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে আমতলায়।

সে এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। তাকে ছাড়া আমার একদিনও ইউনিভার্সিটিতে আসতে মন চায় না। শুক্রবার ছাড়া আর প্রতিদিন আমি তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে আসি। প্রতিদিন আটটায় আমি মিরপুর-১০ নাম্বারে তার জন্য অপেক্ষা করি। একটু দেরি হলে সে আমার ওপর অভিমান করে চলে যায়। কিন্তু আসার সময় ঠিকই আমি তার সঙ্গে আসি।

বৈশাখীকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি। কারণ তাকে ছাড়া আমার একদমই ইউনিভার্সিটিতে যেতে মন চায় না।

বৈশাখীর বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে চৈতালী। বৈশাখীর মাধ্যমে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। চৈতালী দেখতে বৈশাখীর চেয়ে হালকা-পাতলা। কখনো বৈশাখীর সঙ্গে না যেতে পারলে চৈতালীর সঙ্গে যাই। তবুও বৈশাখীর সঙ্গে আসার মজাটাই আলাদা। অবহেলা করার মতো সেরকম দেহ তার নয়। তার শরীরের গঠন দেখতে বেশ লাগে।

সে এলে হাসিমুখে আমাকে তুলে নেয়, আমিও ফুরফুরে মন নিয়ে তার সঙ্গে আসি। আমি যখন তার

সঙ্গে যাই রাস্তা দিয়ে, অনেক মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবাক করা দৃশ্যে মন তখন আনন্দে ভরে ওঠে। ছেলেমেয়েরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় তখন তারা লাল-নীল স্বপ্নে বিভোর থাকে। রোমান্টিক নামের একটা শব্দ তাদের হাতছানি দেয়, তেমনি আমারও হয়ে ছিল, সেটা হচ্ছে প্রেম।

যেটা আমি পেয়েছিলাম বৈশাখীর মধ্যে, এক মাস সামার ভেকেশন উপলক্ষে। তাহলে এক মাস কি বৈশাখীর সঙ্গে আমার দেখা হবে না? আর এ এক মাস আমি আমার গ্রামের বাড়ি যাবো। ৩১ তারিখ বৃহস্পতিবার বৈশাখীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। সে আমাকে ১০ নাম্বার নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর আমি তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। আর বুঝি দেখা হবে না এক মাস।

আসলে এ বৈশাখীটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটির বাস।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

হায় চিল

মহি মুহাম্মদ

মেঘের পর্দার ফাকে উকি দেয় ম্লান রোদ।

এমন দুপুরকে মন খারাপ করা দুপুর বললে যথার্থ হয়। অরণ্য আরো জোরে পা চালায়। ইরা, আজ তার স্বপ্নকন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। কী অদ্ভূত। ইন্টারনেটের যুগে ছ' মাস প্রেম হয়েছে না দেখে। সত্যিই তো অবিশ্বাস্য। শুধু রু-র গল্প শুনে রুকে ভালোবেসেছে। চোখে দেখেনি। দেখতে কালো, ফর্শা, বেটে কি লম্বা কোনো কিছুই জানে না সে। তবে মনের গহীনে রু-র আদল নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছে। সেখানে রু হাসে যেন অবিরল ধারায় বর্ষা ঝরে, সেখানে রু হাওয়ায় আচল উড়ায় যেন বা মেঘের মেয়ে।

সেদিনের কথা মনে পড়ে যায়।

ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে বন্ধুরা বিলটি ইরাকে ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়ে। ইরার ব্যাগে টাকা ছিল না। উশখুশ করছিল, উঠতেও পারছিল না। অরণ্য এগিয়ে যায়, কিছু মনে না করলে টাকাটা আমার কাছ থেকে নাও।

ইরা, তখনও অচেনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ক্যাম্পাসে দেখেছে কিন্তু কোনোদিন পরিচয় হয়নি। টাকা দিয়ে বেরিয়ে আসে, ধন্যবাদ জানায় ইরা।

আমার নাম অরণ্য।

আমি ইরা।

এই ছিল শুরু। তারপর অরণ্যের একজন প্রিয় বন্ধু হলো ইরা।

রু-র স্বপ্ন অরণ্য দেখছে ইরার মাধ্যমে। পরিচয় হওয়ার পর থেকে ইরার মুখে রু-র গল্প শুনতে শুনতে ওর প্রতি এক অন্ধ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। ইরা রু-র গল্প অরণ্যকে, অরণ্যর কথা রুকে বলে দুজনের সেতুবন্ধন গড়ে দিয়েছে। তবে কোনোদিন রু-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। এই শহরের কোন প্রান্তে রু-র আবাস সে সম্পর্কে কোনো হদিস দেয়নি। ইরার সাফ কথা সময় হলে পরিচয় করিয়ে দেব।

একদিন পাবলিক লাইব্রেরির সিড়িতে। পাশাপাশি দুজন। বাদামের খোসা ম্লান চোখ বুজে ছিল ইরার জামার কোলে। অরণ্য বলল, জারুল আমার প্রিয়। নদীর কূলে বাশি বাজানো প্রিয় দুপুর। নৌকার পাটাতনে শুয়ে আকাশ দেখা, ধান ক্ষেতের আল ধরে ছুটে যাওয়া। খোলা মাঠে ঘুড়ি ওড়ানো বিকেল, এসব প্রিয় মুহূর্ত সারাক্ষণ বুকে রাখি।

আমারও খুব ইচ্ছা করে কাউকে কিছু না বলে একদিন সবুজ একটা গায়ে হারিয়ে যাই।

অদ্ভুত!

কেন, অদ্ভুত কেন?

অদ্ভুত না, তুমি জন্ম নিয়েছ শহরে, বড় হয়েছ শহরে, তারপরেও না দেখা গ্রাম তোমাকে এতো টানে? অবশ্য কথিতভাবে গ্রাম কাউকে কাউকে এভাবে টানে।

কথিত নয়, অরণ্য আমি যাকে ভালোবাসি তার চোখে গ্রামের সবুজ, সরলতা খেলা করে। নগরের চাতুরি কূটকৌশল তাকে ছুতে পারে না– এটাই আমাকে খুব ছুয়ে যায়।

তোমার মানুষটাকে তো দেখালে না?

যেদিন তোমার রু-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, সেদিন আমার মানুষটির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবো।

ইরার সব কিছুতেই চমক।

এরপর আজিজ সুপার মার্কেট ঘুরেফিরে কিছু বইপত্র কেনা। ইরার হাতে তুলে দিয়ে অরণ্য বললো, এগুলো দিতে আপত্তি নেই তো? ইরার হাসি। তারপর নার্সারিতে নাম না জানা কতো গাছকে যে ইরা আদর করে। এক গাদা চারা কিনে রিকশায় উঠে।

পাচ মাস পর। ইরার মনটা খুব বিষণ্ন। একটা সেল ফোনের নম্বর দিল অরণ্যকে। রাত নটায় পাচ মিনিটের জন্য কথা বলতে পারো।

তারপর অস্থির পায়চারি। রাত নটা কিছুতেই আসে না। কে যেন ঘড়িটার টুটি চেপে ধরেছে। বেটা আস্তে আস্তে টিক টিক আওয়াজ তুলে এগুচ্ছে তো এগুচ্ছে।

নগরের কোলাহল পেরিয়ে যখন রাত নটা হয় তখন শহরের বুকে লাফিয়ে পড়ে লোড শেডিং-এর মস্ত বড় কালো বিড়াল।

ওপাশে রিং বাজার পরিবর্তে গান শোনা যায়। তুমি কি কেবলি ছবি/শুধু পটে লিখা, ওই যে সুদূর নীহারিকা...। মিষ্টি একটা কণ্ঠ হ্যালো বলে। অরণ্য বিবশ হয়ে পড়ে। কথা বলতে ভুলে যায়। ওপাশে হ্যালো কে বলছেন?

এ পাশ থেকে সে বলে, আমি অরণ্য। তখন ওপাশে নীরবতা। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ।

অরণ্য বলে বইগুলো পছন্দ হয়েছে?

হ্যা, জীবনানন্দ আপনার প্রিয়?

হ্যা, তোমার?

আমারও ।

আমাদের কবে দেখা হবে?

ইরা যেদিন বলবে ।

তার আগে কি কখনোই সম্ভব নয়?

না, ইরা আমার খুব কাছের বন্ধু । তাছাড়া ওকে কষ্ট দিতে চাই না । ওর মাধ্যমে আপনাকে পেয়েছি তাই ওর কথা রাখতে চাই ।

যেদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে তোমার পরনে থাকবে একটা কলাপাতা রঙের শাড়ি, কপালে বড় একটা চাদের মতো টিপ ।

এই যা! কেটে গেল । তারপর অনবরত চেষ্টা । কিন্তু একবারের জন্য সেই কাঙ্ক্ষিত সংযোগ পাওয়া গেল না । যতোবারই কল করে ততোবারই বলে, দুঃখিত এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া সম্ভব নয় ।

পরের দিন ক্যাম্পাসে, ইরা এটা অমানবিক ।

কোনটা?

এই যে আমাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া ।

আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমি কিভাবে বুঝবে? তুমি তো এ দহন বুঝবে না।

ইরার দু চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। যে আগুনে আমি পুড়ি তুমি তার ভস্মের পরশ পাও মাত্র।

ইরার কোথায় যেন গভীর একটা দুঃখ আছে। কাউকে কখনো বলে না। মা নেই। বাবা ফুফুর সঙ্গে থাকে।

অরণ্য বলে, তোমার আবার কষ্ট কিসের? ইরা উত্তর দেয় না। দীর্ঘশ্বাস চেপে হাটতে থাকে। ওর পথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অরণ্য।

তারপর অনেকদিন ইরার দেখা নেই।

শিল্পকলায় এক বিকালে। আর্ট এক্সিবিশনে একা একা ছবি দেখছিল অরণ্য। ওখানেই পেয়ে গেল ইরাকে।

কি ব্যাপার। অনেকদিন তোমার দেখা নেই।

গ্রামে গিয়েছিলাম।

তাই নাকি!

ইরা মাথা দোলায়। তোমার খবর আছে।

উৎসুক দৃষ্টি তুলে ধরে অরণ্য। বাইরে বেরিয়ে আসে ওরা। ইরা চোখ তুলে বলে, আগামী সোমবার সকাল এগারোটায় আমাদের পাড়ার রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করো। আমি রুকে নিয়ে আসবো।

অরণ্য একটা খুশির চিৎকার দিয়ে ওঠে।

চলো আজকে তোমাকে খাওয়াই ।

ইরার চোখে সম্মতি । অরণ্যের জীবনে সুন্দর একটা রাত আসে । ঘুমের ভেতর স্বপ্ন আসে । তারপর আর কিছুতেই অরণ্যের সময় যেতে চায় না । কারণ সোমবার আসতে আরো দুটো দিন কাটাতে হবে ।

দিনের পর রাত, সকাল, দুপুর আবার রাত । এরপর স্বপ্নমাখা ভোর । অপেক্ষার ঘরে এখন শেষ দৃশ্য । অরণ্য পায়ে হেটেই পথটুকু পার হয় । এখানেই একদিন ইরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল । ও আঙুল তুলে বলেছিল এদিকেই থাকে । ইরার মোবাইলে সংযোগ পাওয়া যায় না । অপেক্ষার যেন শেষ নেই । ইরা আসে না । শেষ বেলা পর্যন্ত অরণ্য অস্থির পায়চারি করতে থাকে ।

গোধূলি সন্ধ্যায় পাড়ায় একটি মৃতদেহ আসে । ধর্ষিত এক তরুণী । পরনে কলাপাতা রঙের শাড়ি । অরণ্য মরা মাছের চোখ দিয়ে চিনতে পারে ইরাকে ।

সেই থেকে এই পথে উন্মাদ এক তরুণকে প্রায় ছুটোছুটি করতে দেখা যায় ।

চান্দগাও আবাসিক, চট্টগ্রাম থেকে

পুনর্জন্ম অচেনা সেই জন

এক দম্পতি তাদের হানিমুনের উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এক সময় তারা আফ্রিকা মহাদেশের ছবির মতো দেশে গিয়ে পৌছে । ভালোই কাটছিল সেখানে তাদের দিনগুলো । এক সময় তারা আবিষ্কার করে তাদের মধ্যে আর একজনের অস্তিত্ব । যেহেতু তাদের দিনগুলো সেখানে বেশ ভালোই কাটছিল তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় সেখানেই থেকে যাবে আজীবন ।

এক পূর্ণিমা রাতে তাদের কোল আলো করে আসে একটি ছেলে সন্তান । যদিও তাদের শখ ছিল মেয়ে সন্তানের এবং এ নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ খুনসুটিও চলতো । এক দিন বিকালে প্রতিদিনকার মতো ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার সময় কার অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় দম্পতিটি । অলৌকিকভাবে বেচে যায় তাদের ছোট্ট শিশুটি । সে দেশের নিয়ম অনুযায়ী শিশুটির দায়িত্ব নেয় একটি অনাথ আশ্রম । এভাবে চলতে থাকে অনাথ শিশুটির বেড়ে চলা ।

এদিকে মৃত্যুর পর দম্পতি সোজা হাজির হয় বিধাতার দরবারে এবং ফরিয়াদ জানায় তিনি যেন তাদের মর্ত্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। কারণ হিসেবে তারা তাদের ছোট্ট শিশুটির অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করেন।

বিধাতা শর্ত দেন ফিরে যেতে হলে কখনোই আর তোমাদের মিলন হবে না।

ছোট্ট শিশুটির অসহায়ত্বের কথা ভেবে শর্ত মেনে নেয় দুজনই। বিধাতা অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয় পৃথিবীতে। কিন্তু শর্ত থাকে তিনজনের একজনকে আর দুজন কখনোই চিনতে পারবে না।

বাংলাদেশের দুটি ভিন্ন শহরে তাদের পাঠানো হয়। পুনর্জন্ম নেয়া বাবাকে ঢাকায় এবং পুনর্জন্ম নেয়া মাকে ঢাকা থেকে বহুদূরের শহর খুলনা যেখানে আবেগ ও ভালোবাসার মূল্য সবচেয়ে বেশি সেখানে পাঠানো হয়।

বড় হতে থাকে তিনজন তিনটি ভিন্ন শহরে। এক সময় তারা বড় হয়। পুনর্জন্ম নেয়া মা উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকামুখী হয়। মা উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে। বিপত্তি ঘটে এখানেই। এক দিন কালের প্রবাহে সামাজিক নিয়মে মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। করার কিছুই থাকে না মেয়েটির। কারণ এ দেশে মেয়েদের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু মেয়েটি ছিল স্বাধীনচেতা। সে তার স্বামীর কাছ থেকে ঠিকই বাইরে কাজ করার অনুমতি আদায় করে নেয় আর শুরু হয় তার কর্মজীবন।

এদিকে কয়েক বছর পর পুনর্জন্ম নেয়া বাবাটিও যোগ দেয় সেই প্রতিষ্ঠানে। দেখা হয়ে যায় দুজনার কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে না। ছেলেটির কাছে মেয়েটিকে খুব চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু কোথায় তাদের দেখা হয়েছে তা মনে করতে পারে না। এর এক বছর পর তাদের সেই সন্তানটিও কোনো এক সমস্যা সমাধানে উড়ে আসে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের ডাকে সুদূর আফ্রিকা থেকে। দেখা হয়ে যায় মায়ের সঙ্গে। সন্তানটি প্রথম দেখাতেই চিনতে পারে তার মাকে আর মা-ও চিনতে পারে তার সন্তানকে। কিন্তু তারা বাবাকে চিনতে পারে না সে।

পুনর্জন্ম নেয়া বাবা আড়ালেই থেকে যায় আজীবন। এভাবেই একই ছাদের নিচে চলে তাদের এক অদৃশ্য মিলন। আর এ অদৃশ্য মিলনের কারণেই নিজেদের ভেতর এক চরম সুখ অনুভব করে তিনজনই। এখানেই জয় হয় ভালোবাসার, জয় হয় মাতৃত্বের।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

রকমফের ব্যথা

এক.

জলিল ও মৌরি যুগলের সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যায় গত বছর । একই ডিপার্টমেন্টে একই সঙ্গে চাকরি হয় এবং ট্রেইনিংয়ে আসে একত্রে । একাডেমির কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও রিলাক্সের সময় হিসেবে বেছে নেয় সন্ধ্যাকাল । ৩ নাম্বার ব্যারাকের নিচে সিড়ির মধ্যে আবছা অন্ধকারে কিস দেয়ার সময় দেখে ফেলে জাহিদ । সুতরাং সুযোগের সদ্ব্যবহার । ট্রেইনিং অফিসারকে জানাতে উদ্যত হলে মৌরি চট করে জাহিদকে জড়িয়ে ধরে ঠোটে কিস বসিয়ে দেয় । ব্যস জাহিদের বাহাদুরি শেষ । এক চুমুতে কুপোকাত ।

মৌরির উপস্থিত ভালোবাসা জাহিদকে শুধু কুপোকাতই করেনি বরং জলিল ও নিজের চাকরিটা রক্ষা করতে সমর্থ হয় ।

দুই.

মিস বীণা পুলিশ বাহিনীর সদ্য ট্রেইনিং শেষ করা এক অফিসার । ডাকাতদের উৎপাত বন্ধের লক্ষ্যে টিমের সঙ্গে রওনা দেয় রাতে । মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী, ঘর সামলানোই তাদের ধর্ম কিন্তু বীণার ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ । মেয়েরা অবলা, দুর্বল হলেও বীণা সে দলের নয়, সে খুব সাহসী ও শক্তিশালী, আসামিকে নখদর্পণে আনা ওয়ান টু-এর ব্যাপার । কেনই বা হবে না সে যে পুলিশ অফিসার । লোকে বলে পুলিশরা মানুষ নয় ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– কোনো দুর্ঘটনায় পুলিশসহ আরো অনেক সাধারণ মানুষ মারা গেলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় এভাবে– ‘সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে গিয়ে ৪ জন মানুষ ও ১ জন পুলিশ নিহত হয়েছে’ । সুতরাং বুঝুন ব্যাপারটি ।

পরিকল্পনা অনুসারে ডাকাতরা অপরাধ সংঘটন করতে পারে এমন সন্দেহময় স্থানে ওত পেতে থাকে মিস বীণা । একদিকে ঘন কুয়াশাময় কনকনে শীতের রাত, অন্যদিকে ডাকাতদের হিংস্র আক্রমণের ভয় সত্ত্বেও বীণার বুক একটুও দুরু দুরু করে না । ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার প্রহর গুনছে কখন আসে শিকার । নিশ্চুপ

আর নীরবতার মধ্যে পেরিয়ে যাচ্ছে রাতের প্রহর । দ্বিপ্রহর রাতের ঘন কুয়াশার ঘনচ্ছটা ভেদ করে ৭-৮ জন মানুষের মূর্তির আগমন ঘটে । বীণা যে বাশঝাড়ে লুকিয়ে আছে তার পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল ডাকাত দল । মশার কামড়, মলমূত্রের দুর্গন্ধ সত্ত্বেও বীণা নড়াচড়া না করলেও একটি বিষাক্ত সাপের ফণা এবং হিংস্র শব্দে তার সহকর্মী ভয়ে চিৎকার করে ওঠে । ডাকাতরা পরিস্থিতি আচ করতে পেরে দে দৌড় । পুলিশ টিম যখন হতভম্ভ এটা কি হলো ভেবে, ঠিক তখনি বীণা ডাকাতদের অনুসরণ করে দৌড়াতে থাকে । অনেকক্ষণ ধরে পুলিশদের একজন কর্মী নেই দেখে সিনিয়র অফিসার মিস বীণা বলে ডাকতে থাকে ।

পার্শ্ববর্তী আমবাগান থেকে বীণা উচ্চকণ্ঠে বলে– 'স্যার একজনকে ধরেছি । তাড়াতাড়ি এখানে আসেন ।

ডাকাতরা গুলি করতে পারে ভেবে সিনিয়র অফিসার বলে– ঝুকি নেয়ার দরকার নেই, চলে আসুন ।

বীণা চিৎকার দিয়ে বলে আমি তো ছাড়তে চাই কিন্তু আসামি আমাকে ছাড়ে না, জোর করে জড়িয়ে ধরেছে ।

বুঝুন ব্যাপারটি । পুলিশ-ডাকাত দা-কুমড়া সম্পর্ক এবং মুহূর্তটি কতো ঝুকিপূর্ণ । একজন নারীর কোমল শরীরের ছোয়া গ্রহণ করতে বিপদ মুহূর্তেও ডাকাত কার্পণ্য বোধ করেনি । হয়তো বা দৈহিক আকর্ষণ ভালোবাসার একটি অপরিহার্য নিয়ামক কিংবা অন্য কিছু ... ঠিক বুঝি না!

তিন.

২৮তম ব্যাচের সুন্দরী নাজ । দৈহিক গঠন, টোল পড়া গাল, পদ্মার ইলিশের মতো রুপালি চোখ, পালঙ্কের মতো পিঠ আর উচু বুক উন্মাদ বানিয়েছে ৩০তম ব্যাচের মামুনকে । নারায়ণগঞ্জের ছেলে মামুন জীবনে বহু মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েছে ঠিকই কিন্তু নাজের মতো কোনো মেয়ে তার হৃদয় মন্দিরে ঢং ঢং শব্দ বাজাতে পারেনি । সেই নাজের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টায় সারাক্ষণ মত্ত থাকে সে । কিন্তু একাডেমির শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নিয়মের কারণে তার পক্ষে সম্ভব হয় না প্রোপোজ করতে । কতো রাত স্বপ্নের রানীকে নিয়ে স্বপ্নে সহবাস করেছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই । সকাল হলেই তার দুর্দশার দৃশ্য আমাদের দেখাতো । দুঃখ হয় মামুনের জন্য । পত্রিকায় ছাপালে নিশ্চিতভাবে নাজ জানতে পারবে মামুনের আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছার কথা । এ জানা তাদের চোখে চোখ রাখা পর্যায় থেকে হয়তোবা হাতে হাত রাখতে সমর্থ হবে ।

মুদিপাড়া, দিনাজপুর থেকে

নানী

জাহিদুল আলম জয়

‘সাইকেলে গরু দেখা’ শিরোনামে একটি লেখা একদিন প্রকাশ হওয়ার পর অনেক ফোনের ভিড়ে একটি ফোন আমাকে স্তব্ধ করে ফেললো। এমন চমৎকার মায়াবি কণ্ঠ আমি কখনোই শুনিনি। মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনলাম। বিস্ময়টা অপেক্ষা করছিলও আরো। একে একে বাসার প্রতিটি সদস্যই আমার সঙ্গে কথা বললো। এর মধ্যে পাচ বছরের মিষ্টি একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আমি যেন স্বর্গরাজ্যে চলে গেলাম। প্রাথমিক কথা শেষে আমি যেন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। একি ছোয়া পেলাম আমি! ভালো লাগার আবেশে আমার মনটা ভরে উঠলো। চারদিকে সবকিছুই আমার কাছে সুন্দর মনে হতে থাকলো।

এ ঘটনাটা একটি ঈদের দু’দিন আগের। ঈদ উপলক্ষে তারা সবাই একত্র হয়েছে। পত্রিকা পড়তে পড়তে হঠাৎ তারা আমার লেখাটা পড়ে এবং ব্যতিক্রমধর্মী লেখাটা ভালো লাগার কারণে আমাকে ফোন করে। প্রথমে ফোন করে পরমা। সে এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। এরপর তার ছোট খালামণি, মা, বাবা, বড় মামা, ছোট মামা এবং মামী। সবার শেষে কথা বলে সবার মধ্যমণি অহনা সোনামণি এবং পরমার নানী। অহনা ছোট খালামণি অর্থাৎ ডলার খালামণির একমাত্র বুকের ধন। মূলত পরমার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরেই সবাইকে আমি সম্বোধন করতে থাকি। জমে ওঠে আমার আড্ডা। প্রায় প্রতিদিন তাদের সঙ্গে আমার কথা হতে থাকে। একদিন কথা না হলে আমার মনটা চিন চিন করে উঠতো।

পরমা খালামণির সঙ্গে রংপুরে থাকে। ওখানে পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ও পড়াশোনা করে। ওর সঙ্গে আমার ফ্রেন্ডশিপটা দারুণ জমে উঠলো। তবে ওকে ছাপিয়ে নানীর সঙ্গে সম্পর্কটা জোরদার হলো আরো। নানী তার নাতিদের তালিকায় আমাকেও ঠাই দিয়েছেন। তার নাতিদের জন্য যা বরাদ্দ থাকে আমার জন্যও তাই থাকে। যে কোনো মুহূর্তে যা করে তার ভাগটা আমি পেয়ে যাই। সম্পর্ক গড়ার পর তিনটি ঈদ পেয়েছি। প্রতিটি ঈদেই নানী অন্যদের মতো আমাকেও ঈদের পোশাক এবং নগদ অর্থ দিয়েছেন।

নানী থাকেন সুদূর গাইবান্ধায়, আর আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে। তারপরও আমাদের যোগাযোগটা নিরবচ্ছিন্ন। অন্যদের সঙ্গে যাই হোক নানীর সঙ্গে সম্পর্কটা এখন আমার আত্মিক। আমি দাদিকে হারিয়েছি দু’বছর বয়সে আর নানীকে পনের বছর বয়সে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের আদর-স্নেহটা তেমন বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এই নানীকে পেয়ে আমি সব না পাওয়ার বেদনা ভুলে গিয়েছি। আমার কেন জানি মনে হয়, এত পাওয়া আমার প্রাপ্য নয়। নানীর ভালোবাসা আমাকে তার প্রতি পাগলপ্রায় করে তুলেছে।

এদিকে নানীর বড় মেয়ের ছেলে মিরাজ রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র। সে আবার পরমাকে জীবনসঙ্গী

হিসেবে পেতে চায়। এতে মা রাজি। পরমার মায়ের সঙ্গে মিরাজের দারুণ খাতির। পরমা কিন্তু মিরাজকে একেবারেই পছন্দ করে না। ও স্পষ্ট বলে দিয়েছে মিরাজের সঙ্গে বিয়ে দিলে সে আত্মহত্যা করবে। এসব কথাবার্তায় তার মা এবং মিরাজ মনে করে আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক রয়েছে। হ্যা রয়েছে, কিন্তু তা শুধুই নির্মল বন্ধুত্বের। আমরা কখনোই অন্য কিছু ভাবিনি, ভাববো না।

এরপরও আমাদের ওপর অবিশ্বাসটা রয়েই গেল। এর মাঝে নানী একদিন আমাকে জানালো তিনি এবং পরমার মা রাজশাহী আসছেন। কথা মতো তারা এলেনও। প্রথমবারের মতো সরাসরি দেখা হলো নানী এবং পরমার মায়ের সঙ্গে। কেন জানি ওখানে আমাকে অবজ্ঞা করা হলো। মিরাজরা এমনভাবে সবকিছু করছে যাতে আমি বিব্রত হই। আদতে হলামও তাই।

নানীর সঙ্গে পরিচয় পর্ব এবং কথোপকথন আমার সুখকর হলো না। ব্যথিত এবং তিক্ত অনুভূতি নিয়ে বিদায় নিলাম। নানীকে ফোন করার আর সাহস পেলাম না। কিছুদিন পর নানীই আমাকে ফোন করলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছেন আমাকে ওখানে ঠকানো এবং বঞ্চিত করা হয়েছে। সবকিছু ভুলে নানী আমাকে স্বাভাবিক হতে বললেন। নানীর কথা ফেলতে পারিনি, এখন তার সঙ্গে আমার হৃদয়ের লেনদেন। কিন্তু ঘাটতি এক জায়গায় থেকেই গেছে।

ওই ঘটনার পর থেকে পরমার সঙ্গে আমি স্বাভাবিক হতে পারিনি। রাজশাহীতে মিরাজের সঙ্গে দেখা করা নিয়ে সে আমাকে ভীষণ ভুল বোঝে। সেই ভুলটা ভাঙাতে আমি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। সেই থেকে দূরেও। কিন্তু পরমা এমনই এক মেয়ে যাকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। ওর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং উচু মানসিকতা আমার ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে দারুণভাবে। ওর অসাধারণ গুণ আমার চলার পথের পাথেয়। এমন চমৎকার ও অতুলনীয় মেয়েকে যে কোনো ছেলেই ভালবাসতে চাইবে, একান্তভাবে কাছে চাইবে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই! ইচ্ছে করে ওকে ভালবাসি প্রাণভরে। কিন্তু বাস্তবতা আমি জানি। ওর পাশে আমি যোগ্য নই। ওকে পাওয়ার চিন্তা করাটাই আমার পাপ। তাইতো বুকের ভালোবাসাটা মনেই গেথে রেখেছি। ওকে কোনোদিন বলবো না, আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। তার চেয়ে বরং বন্ধু হয়েই ও থাক আমার পাশে আজীবন। ওর মতো মেয়ের বন্ধু হওয়াটাই কি কম সৌভাগ্যের!

তবে আমি জানি পরমা কেন আমাকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছে। আসলে সে এমনটি করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা আমাকে আর ওকে নিয়ে যে সন্দেহের বীজ জন্মেছিল তাতে ওর নির্মল মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। পরিবারের কয়েকজন, বিশেষ করে ওর মাকে স্বস্তি দিতেই আমার সঙ্গে সম্পর্কটা শিথিল করে পরমা। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আমিও পরমাকে মনে মনে সাপোর্ট করেছি। আমি কখনোই চাইনি আমার জন্য ওদের সুন্দর গোছানো বাগান তছনছ হয়ে যাক। এজন্য নীরবে সরে এসেছি আমি। তবে পরমা আমার জীবনে যে আলোকবর্তিকা জ্বেলেছে তা সব সময় আমাকে গতিময় রাখতে সহায়তা করছে। আর নানীর অকৃত্রিম আদর, স্নেহ, ভালোবাসা আমাকে যে কোনো কাজে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাচ্ছে সারাক্ষণ।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

শুভেচ্ছা

আম্মা, বড়ভাই, ভাবী, আপা, শামীম, লাভলী, খোরশেদ, লিলি, এলিচ, রিফা, সাজিদ, নিশাত, তাশমির ও যায়েদ সবাইকে হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে; সে সঙ্গে হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

মোরশেদ চৌধুরী

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

ম্যাড ম্যান

মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে

কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালি ভেসে গেছে।

তবে তুমি আছ আমার এই মনে, হেই ম্যাড ম্যান।

ভালো থেকো।

খঁপশু-৭

খুলশী, চট্টগ্রাম

ফারজানা

তোমার জীবন চলার মাঝপথে যদি কখনো ঝড় আসে তবে তোমার বন্ধুটিকে জানিও, দেখবে শত বাধার দেয়াল ডিঙিয়ে তোমার এ বন্ধুটি তোমার দুয়ারে এসে হাজির হবে। ভালোবাসা দিবসে তোমাকে বন্ধুর ভালোবাসা রইলো। ভালো থেকো।

এমএবি মাসুম

সিলেট

ঝুমা

তোমায় প্রথম দেখেছিলাম ঝুম বর্ষায়

তারপর বিভোর কোনো এক শান্তিতে

বলতে পারো তোমায় পাওয়ার জন্য

আমি কি না করিনি!

অদ্ভুত সেই দিনগুলো

যেই আমি এখনো সেই আছি।

গভীর জলের মাছ

সবুজবাগ, বগুড়া

কাপুরুষ

মহিউদ্দীন জুয়েল

আমি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে পড়ি। মেয়েটি ইংলিশে। প্রতিদিনই দেখা হয় আমাদের। কথা হয়। চলে ভাব বিনিময়। তবে আগের মতো নয়। অথচ সে আমার নায়িকা। জীবনের বনলতা। রোজ রাতে যার কণ্ঠস্বর শুনবো বলে জেগে থাকি। দু'চোখ দেখবো বলে বৃহস্পতিবার ক্লাস না থাকা সত্ত্বেও চলে যাই ফ্যাকাল্টিতে। পায়ের আওয়াজ শুনবো বলে দাড়িয়ে থাকি কলা ভবনের সিড়িতে। তবে কেন এত বাধা? মেয়েটির মনটাকে ছুতে পারিনি এখনো?

আমার একপেশে ভালোবাসা। একাই বেসে যাই। হয় না আর তার হাত ধরা। ঘেষে বসে কবিতা শোনানো কিংবা সবুজ জারুল চত্বরের বুকে শুয়ে তার কোলে মাথা রাখা। আমি হেসে যাই। ডায়েরির পাতাগুলো সফেদ থাকে। তারিখের পর আর যেন কিছুই বসে না।

২৪ বসন্তে এসে এই মেয়েটির জন্য অসম্ভব একটা টান অনুভব করছি আমি। এই বুঝি পাশে আছো তুমি। আলতো স্পর্শে ভেঙে দিয়েছো সব জড়তা। সেশনজটের সূত্র ধরেই তার সঙ্গে পরিচয়। দুটো ডিপার্টমেন্ট পাশাপাশি। আলাপটা জমে উঠে অজান্তেই। হঠাৎ একদিন ম্যাসেজ সেল ফোনে। তারপর ইতিহাস।

০১৭২... দাপিয়ে বেড়ায় সিডরের মতো। সেশনজটের আলাপ দু'মাসে চলে গেছে ভবিষ্যৎ স্বপ্নে। সুবোধ বালকের কেটে যাওয়া দিন। মাঝে মধ্যে বোকা বনে যেতাম। এখনো যাই। স্কুলের ডানপিটে এই ছেলেটি কিভাবে প্রেম সাগরে পড়ে গেলাম! যে আমি একটি মেয়েকে তিন মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারি না সে আমি 'আমি' নেই।

তার হেটে যাওয়া আমাকে অস্থির করে তোলে। কথায় হৃদয়ে বয়ে যায় বসন্তের বাতাস। ছেড়ে দেয়া খোপার চুলে আমি উড়ে যাই। তার ঢঙ, খুনসুটি কোনো কিছুই চোখ এড়ায় না। সবই ভালো লাগে। বন্ধুরা খ্যাপায়, শালা প্রেমে পড়েছে এবার।

আমি হাসি। উড়িয়ে দিই আরে না, কি যে বলিস। কিন্তু মন জানে আর আমি জানি।

ভালোবাসার লুকোচুরিতে তাকে না পেলে দুঃখ ভর করে। সে জানাতো তার সব কথা। খুলে দিত জানালা। ঝুম বৃষ্টিতে রিকশার হুক ফেলে ঘুরতে যাওয়া, প্রিয় মানুষের হাত ধরে ঝরনা দেখা কিংবা আমার বৃষ্টিতে কান্না চলে আসা, তার অনুভূতি আমার সুখ কাব্য।

হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ পরে যেদিন তুমি ইউনিভার্সিটিতে আসো, সেদিন দ্যুতি ছড়ায় চারপাশে। মেয়ে তুমি কি জান, তোমায় আমি কতো ভালোবাসি। বন্ধুদের আড্ডাচ্ছলে ঝুপড়িতে তোমাকে দেখি আড়চোখে। তোমার বলায় কেন এতো দেরি। মাঝে মধ্যে নিজেকে কাপুরুষ মনে হয়। একা একা কাটাপাহাড়ের রাস্তায় বসে থাকি। দেখি লোকজনের আসা যাওয়া। উদাস হয়ে যাই। আজো তুমি বলোনি ভালোবাসি।

আমার নীরবতা আমাকেই কষ্ট দেয়। আয়নায় দেখি নিজের মুখ। কাল বলবো, আজ দুপুরে, কিন্তু আর বলা হয় না। বলি বলিতেই আটকে গেছে ভালোবাসার শাটল ট্রেন।

গত বছরের মাঝামাঝি সময়। বৃষ্টির দিনে তোমার ছাতা ছিল না। দাড়িয়ে ছিলে চারুকলা বিভাগের সামনে। দশ হাত পথ অতিক্রম করেছিল ১০ মাইল। একই ছাতার নিচে পাশাপাশি।

তোমার অসংকোচ। আমার পাগলামো। সব কিছুই নিয়ে গিয়েছিল কিশোর-কিশোরীতে। তুমি এখন কেন এড়িয়ে চলো আমাকে বুঝি না। হয়ত আমার কাপুরুষতাই তোমার সীমানার বেড়া হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু, তোমাকে আমি ...

মাঝে মধ্যে তোমাকে মন খারাপ করতে দেখি। সেল ফোনের আলাপে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাও। কিসের এতো কষ্ট তোমার? বিষণ্নে হেটে যাও শহীদ মিনার ধরে। আনমনে কথা বলো। মনে আছে তোমার, আমাদের সেই দিনগুলো। তুমি আমাকে শোনাতে তোমার সব মজার কথা। ফ্রেঞ্চ ভাষায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ব্ল্যাক হোলে বগিতে আড্ডা দেয়া, কনসার্টে মেতে ওঠা, পূজাতে কুমিল্লায় যাওয়া, বিল্লাহ স্যারের আস্তে আস্তে কথা বলা কোনো কিছুই বাদ যেতো না তোমার ঝুড়ি থেকে। জে এম সেন হলের পূজাতে আমাকে না পেয়ে তোমার সে কি রাগ। মনে আছে? মেয়ে তোমার জন্য এখনো আমি প্রতীক্ষার প্রহর গুনছি।

সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হতেই তুমি কেমন পালাতে চাইলে। সমাজ বিজ্ঞানের ক্যাফেতে তোমাকে জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি আগের মতো উচ্ছ্বল জবাব। আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ। নাকি মজা পাচ্ছ। আমি একাকি ঢিল ছুড়ি। দাড়িয়ে থাকি স্টেশন চত্বরে। ঘড়িতে বার বার দেখি। এই বুঝি দুটা বাজলো। ট্রেন ছাড়বে। নায়িকা আসবে। যাবে এই পথ দিয়ে। জানালার পাশে বসাব। তাকিয়ে থাকবে কেবল আমারই দিকে। আমি বসে থাকি। সে বসবে। আমারই পাশে। বলবে ভালোবাসি। বিদ্রূপ করবে কাপুরুষতাকে নিয়ে। শাসন করবে তোমার কবে সাহস হবে বলো তো!

আমি এবারও হাসি। স্বপ্ন দেখছি না তো?

চিটাগং ইউনিভার্সিটি থেকে

বিয়ে খেলা

নিলয় ফারুক

ছোট ফুটফুটে মেয়েটা খুব সুন্দর করে সেজেছে। মাপমতো শাড়ি জোগাড় করতে পারেনি বলে বড় বোনের একটা ওড়না এনে শাড়ির মতো পেচিয়ে পরেছে। বড় বোনের ব্লাউজটাও খুব বড় হয়ে গেছে। সেফটিপিন দিয়ে কোনো রকমে আটকে রেখেছে। গাঢ় লাল রঙ লাগিয়েছে পাতলা ঠোট জোড়াতে। লাল টিপ পরেছে কপালের ঠিক মাঝখানটায়। ঘোমটা টেনেছে খুব বড় করে। যেন বিয়ের পিড়িতে বসা লাজুক বধূটি।

আর পিচ্চি ছেলেটিও সেজেছে খাটি বাঙালি বরের মতো। কোত্থেকে যেন বরের পাগড়ি জোগাড় করে যুৎ মতো মাথায় এটেছে। শাদা শার্ট আর শাদা প্যান্ট পরেছে। মুখে ধরে রেখেছে এক টুকরো কাপড় (রুমালের পরিবর্তে)। পিচ্চি ছেলেটার চোখ জোড়া আনন্দ আর খুশিতে চিকচিক করছে। আটকে রাখতে পারছে না তার হাসি। আজ তাদের বিয়ে হবে। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই দারুণ ব্যস্ত। বিয়ের আয়োজনে ছোটাছুটি করছে।

আমি দূরে দাড়িয়ে তাদের বিয়ে বিয়ে খেলা দেখছি।

তাদের বিয়ে হয়। দোকান থেকে সন্দেশ আনা হয়েছিল। হাতের কাছেই ছিল এক গ্লাস দুধ। ছোট্ট একটা গ্লাসে করে একজন আরেকজনকে দুধ খাইয়ে দিল। মিষ্টি নেই। তাই সন্দেশটা দুজনে ভাগাভাগি করে খেলো। কাগুজে ফুলের মালা বদল করলো বর-কনে দুজনে। ছোট্ট মেয়েটা পিটপিট করে তাকাচ্ছিল বর ছেলেটার চোখের দিকে।

হঠাৎ একটা ছোট্ট মেয়ে ছুটে এসে বউ মেয়েটার কানে কানে ফিশফিশ করে কি যেন বললো। কিছুক্ষণ পর বউ

মেয়েটা বর ছেলেটার কানে সে কথাটা বললো। বলেই খিলখিল করে হাসতে লাগলো। হাসিটা ছড়িয়ে পড়লো সবার মাঝে।

বউ মেয়েটা কি বলেছিল জানো?

বলেছিল ভালোবাসি। ভালোবাসি!

আজ হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি!

কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা থেকে

সে ছিল এই গায়ে

আল আমিন আহমেদ

নাজনীন আঙিনার এক প্রান্তে আমার দিকে মোড়া এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটি মোড়া পেতে বসে পড়লো। তখন ফাল্গুন আসি আসি করছে। অথচ মাঘের শীতের ভাবটা তখনো বিদায় নেয়নি। তাই এ পড়ন্ত দুপুরে গাছের ছায়ায় বসাটা আমার কাছে ভালো লাগছিল না।

তার দ্বিতীয়বারের আহ্বানে শীত শীত অনুভব নিয়েই সেখানে বসে পড়ি। আমি ওকে নাজু বলে ডাকি। এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাড়ি জমাই সিঙ্গাপুর, চাকরির উদ্দেশে। ফ্লাইটের আগে বিদায় নিতে যাই নাজুর কাছে।

দেখলাম নাজু শাড়ি পরেছে। খুব সুন্দর লাগছে ওকে। আকাশি রঙের শাড়ি। চোখে কাজল, কপালে টিপ, মাথার চুল সুন্দর করে পেছনে খোপা বাধা। গ্রামের মেয়েরা সাজসজ্জা করে সাধারণত বিকাল গড়িয়ে পড়লে। এখনো তো দুপুরই পড়েনি। কিন্তু নাজনীনের এতো অতিরিক্ত সাজ কেন? তবে কি সে আগে থেকেই জানতো এ সময়টাতে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবো?

আমার জন্য এতো সাজ ভেবে মনে মনে খুশি হলাম। আমাকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই যে সাজবে এমন তো কোনো কথা নেই। পরের কথাটি ভেবে মনটা খারাপও লাগলো। যে কোনো ব্যাপারেই এমন আগ বাড়িয়ে ভাবা আমার একটি বদ অভ্যাস। বলতে ইচ্ছা হলো, চুলগুলো খোলা রাখলে তোকে আরো সুন্দর লাগতো নাজু।

মুখ ফসকে বলেও ফেললাম কথাটা। মাঝে মধ্যে এতো সাহস আমি কোত্থেকে যে পাই! সাহস বললাম, কারণ এর আগে একদিন বিকালে ওকে দেখে বলেছিলাম, ‘নাজু তোরে আজ খুব সুন্দর লাগছে।’

প্রত্যুত্তরে সে কি বলেছিল তা প্রকাশ করতে লজ্জা লাগছে। তবুও বলি। বলেছিল, ‘কোনো মেয়ের রূপের প্রশংসা করার আগে নিশ্চিত হবি তোর প্রশংসা শুনে সে খুশি হবে কি না। তুই আমাকে সুন্দর বলে সনদপত্র দিলেই আমি আহ্লাদে গদগদ হমু এইডা তুই কেমনে ভাবলি?’

নাজু বরাবরই এমন চটাং চটাং কথা শোনাতো আমাকে। কিন্তু এ মুহূর্তে ওর খই ফোটানো হাসি দেখে আমি আনন্দ পেলাম। আমার কথা শুনে নাজু তো হেসে কুটি কুটি। ঠিক কথা শুনে নয়, আমার কথা বলার ধরন দেখে।

কথাটা বলার সময় আমি এতোটাই তোতলাচ্ছিলাম যে, ও না হেসে পারলো না। মেয়েদের সামনা সামনি হলেই রাজ্যের সব দুর্বলতা আমার ওপর এসে ভর করে। আর নাজুর মুখোমুখি হওয়াতে যে আমার দুর্বলতা থাকবেই। কেন থাকবে তা তো বললামই।

ও খুব জেদি মেয়ে। নারীর কোমলতা বেশির ভাগ পুরুষের পছন্দের বিষয়। অথচ আমার কাছে ওর জেদি মনোভাবটা ভালো লাগে। এ ভালো লাগার কারণ অন্য কিছুও হতে পারে। হতে পারে ওর জেদি, কঠিন আচরণের আড়ালে ঢাকা প্রকৃত কোমলতাটা আমার অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই হয়তো ওর প্রতি আমার দুর্বলতা সামান্য উপভোগের, আরো গভীর।

মনে পড়ে এক দিনের ঘটনা। তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী। নাজু তখন ক্লাস নাইনে। আমি ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই স্কুলে যেতাম। ও যেতো মেয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দল বেধে। সেখান থেকেই সে আমাকে দেখে মুচকি হাসলো। মেয়েরা এমনিতেই একত্র হলে ওদের ঠোটে হাসি লেগে থাকে। কিন্তু সেদিনের ওর ওই হাসিটা ছিল অন্য রকম। নাজু এমন করে হাসলো আর জলদি মাথা ঘুরিয়ে এমন ভান করলো– যেন এ হাসি আমাকে দেখে নয়, এ হাসি তার পাশাপাশি হেটে চলা বান্ধবীর কোনো কথা শুনে। এমনই ছল করা চাহনি আর কায়দা করা হাসি ওর। ওই মুহূর্তে আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসি দিয়েছিলাম। অথচ ওর দিকে তাকিয়ে আমি কেন হাসলাম তা কিঞ্চিত রাগের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে বসলো– যখন ও আমাকে একা পেল।

‘আচ্ছা আমিন তুই সেদিন আমারে দেইখা হাসলি কেন?’

জবাবে বললাম, তুই না এর আগে একদিন আমারে কইলি যে আমি যখন হাসি আমার বাম গালে টোল পড়ে। আর সেটা দেখতে তোর ভালো লাগে। আমার এই গালে হাসি তোর ভালো লাগে তাই না। তোরে আমার ভালো লাগছে। তাই তোরে দেখলেই আমার হাসি পায়।

আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে সেদিন নাজু বলেছিল, শুনেছি যেই ছেলেদের গালে হাসি দেয় তাদের বউ মরে যায়।

আমি বলে ফেললাম, কিন্তু তুই আমার বউ হইলে মরবি না, আমার বউ হবি? সেদিনের পর থেকে সে আমার সঙ্গে অনেক দিন ধরে কথা বলেনি।

একদিন রাস্তায় একা পেয়ে ওর হাতে আমার একটি চিঠি ধরিয়ে দিলাম। চিঠিতে লিখেছিলাম, আমি তোকে ভালোবাসি নাজু।

ওর কোনো উত্তর পাইনি, তবে আমার প্রতি ওর আচরণে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি।

নাজুর মাকে আমি খালা ডাকতাম। খালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় নাজু অনেকটা পথ আমার সঙ্গে এসেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর চোখে বলেছিল, চিঠি দিস।

সিঙ্গাপুর আসার পর ওর সঙ্গে চিঠি বিনিময় হতো। আমার ছোট বোন ইতি বিশেষ সতর্কতায় ওর চিঠিগুলো আমার ঠিকানায় পোস্ট করতে ওকে সহযোগিতা করতো। তখন প্রত্যন্ত এলাকায় মোবাইল যোগাযোগ ততোটা হয়ে ওঠেনি। তাই আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি।

প্রায় বছরখানেকের মাথায় এক দিন খবর পেলাম নাজুর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে ইটালি চলে গেছে।

কয়েক মাস পর অবকাশ যাপনে দেশে এলাম। সম্ভবত একজন প্রবাসীর জন্য দেশে ফেরা তার প্রবাস জীবনে পাওয়া আনন্দের সবচেয়ে বড় উপলক্ষ। কিন্তু এ ফেরত আসা আমার জন্য আনন্দের নয়। এক দিন সকালের নাশতা সেরে ঘরের শো-কেসের ড্রয়ার থেকে আমাদের জমির দলিলপত্র দেখছিলাম। পুরনো কাগজপত্রের ভেতর থেকে আবিষ্কার করলাম একটি চিঠি। নাজুর লেখা।

আমিন, কেমন আছো? আমি ভালো নেই। বাড়িতে আমার জন্য পাত্র দেখছে। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারি না। এ মুহূর্তে তোমাকে জলদি দেশে আসতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, অন্তত চিঠির মাধ্যমে আমাকে তোমার অভিমত জানাবে। তিন মাসের মধ্যে যদি তোমার কোনো চিঠি না পাই ... তোমার অপারগতা আমি বুঝে নেবো। ভালো থেকো।

ইতি

নাজু

ছোট বোন ইতিকে এ চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই সে তার এ দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালো, চিঠিটি ওই সময় সে ভুলেই গিয়েছিল কোথায় রেখেছে।

অবশ্য নাজনীন আপা একদিন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল চিঠিটি পোস্ট করেছি কি না। আমি আমার অপরাধ চেপে রাখার উদ্দেশ্যেই তখন তাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়েছি যে, চিঠিটি পোস্ট করা হয়েছে। সরি ভাইয়া।

আমি নাজুকে খুজি দল বেধে চলা স্কুলযাত্রী বালিকাদের মধ্যে। ধলেশ্বরী নদীর নারীদের ঘাটলায়। যেখানে দেখা হলে নাজু কলস থেকে এক আজলা পানি নিয়ে আমার মুখে ছিটকে দিত। ওর পরিজনদের কাছে ওর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে যতোটুকু জানি তাতে তৃপ্ত হতে পারি না। ওর মধুময় স্মৃতির তপ্ত দহনে আমার হৃদয় ভূমি প্রতিনিয়ত শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির আঙিনায় গ্রাম্য কিশোরীদের আড্ডাখানায়, গায়ের আকা-বাকা পথে ওর কণ্ঠস্বর শুনি আর পদচিহ্ন দেখতে পাই।

সিঙ্গাপুর থেকে

স্বপ্নের বাসর

স্বপ্ন

ছোটবেলা থেকেই ওর সঙ্গে অর্থাৎ বৃষ্টির সঙ্গে অনেক খেলাধুলা করতাম। বয়সে বৃষ্টি আমার থেকে পাচ-ছয় বছরের ছোট। তাই ও আমাকে ডালিম ভাইয়া বলে ডাকতো। সম্পর্কে আমার খালাতো বোন হওয়ায় প্রায়ই আমাদের বাসায় বেড়াতে আসতো। আমার ছোট ভাইবোন না থাকায় ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব ভালোভাবেই গড়ে উঠতে লাগলো। একদিন খেলার ছলে ওকে বকা দেয়ায় একেবারে কেদে ফেললো। কাদো কাদো গলায় বললো, ‘ডালিম ভাই, তুমি আমাকে বকা দিলে কেন?’

তুই আমার বউ হবি তো তাই তোকে বকা দিয়েছি, একটু শাসন করলাম।

বউদের বুঝি সবাই বকা দেয়।

দূর বোকা, যার বউ শুধু সেই বকা দেয়। তাই তো আব্বু মাঝে মধ্যে আম্মুকে বকা দেয়, আবার পরে অনেক ঝগড়া করে।

না ভাই আমি কারো বউ হবো না।

সেদিন অনেক কিছু না বুঝেই পিচ্চি মেয়েটার সঙ্গে অনেক কথাই বললাম। এভাবে দিন যেতে লাগলো। ও আমার চোখের সামনেই বড় হতে লাগলো। দিন দিন তাকে আরো আকর্ষণীয় লাগছিল। আমার ভালোবাসা তার প্রতি গভীর হতে লাগলো। পরে বুঝতে পারলাম বৃষ্টিও আমাকে পছন্দ করে। ও একটু লাজুক ছিল, তাই কাউকে বুঝতে দিতে চাইতো না। আমার বিয়ের জন্য পাত্রী খুজতে গিয়ে কথা উঠলো মেয়ে তো আমাদের ঘরেই আছে, আর তা হলো বৃষ্টি। মনে মনে ভাবলাম, সেদিনের সেই ছোট্ট পিচ্চি মেয়েটার সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাসর হবে?

এভাবে আরো কিছুদিন যাওয়ার পর উভয় পরিবারের মতামতের ভিত্তিতে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের কেনাকাটায় প্রয়োজনীয় আইটেমের মধ্যে আমি বৃষ্টির কাছ থেকে একটি নাম্বার জানতে চাইলে সে মুচকি হেসে কিছু না বলে চলে গেল। আমিও ইচ্ছা করে প্রয়োজনের তুলনায় কম নাম্বার কিনলাম।

এক সময় কাঙ্ক্ষিত বিয়ের দিন অর্থাৎ স্বপ্নের বাসর রাত এলো। সারা দিন পরিশ্রম শেষে স্বপ্নের সেই বাসর রাতে তার কাছাকাছি যেতে চাইলেই বলে উঠলো, ডালিম ভাই প্লিজ, আজ কিছু করবেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করার পরও সেদিন ডালিম ভাই থেকে তুমি বলায় ক্ষমা করে পরের দিনের অপেক্ষা করতে হলো আমার সেই স্বপ্নের বাসরের।

যথারীতি পরের দিন বউ-ভাতে সবাইকে বিদায় করে আমি রুমে চলে এলাম আমার স্বপ্নের বাসরের অপেক্ষায়। কিন্তু তার আসার খবর নেই। সে সবাইকে বিদায় করতে ব্যস্ত। একে একে সবাই চলে গেলে অবশেষে রাত বারোটার দিকে তার আগমন ঘটে আমার রুমে। মনে মনে ভাবলাম আজ তাকে শাস্তি দেবো। স্বপ্নের বাসর শুরু করার আগেই তার হাজার নিয়ম-কানুন বলা শুরু হলো। এটা-ওটা করা যাবে না, এভাবে না, ওভাবে ইত্যাদি। সবকিছু মেনে নেয়ার পর এবার লাইট অফ করতে বললো। তাই

করতে হলো। তার খুব কাছে গিয়ে ঠোটে, গালে একটু আদর করলাম। এবার ব্লাউজের হুক খুলে পরের অংশ খুলতে অনেক কষ্ট হলো আমারই কারণে। আমার শরীর থরথর করে কাপতে লাগলো। একটু হাত বোলাতেই লুঙ্গি ভিজে গেল। লাইট অফ ছিল তাই টয়লেটের কথা বলে নিজেকে সামলে নিই।

তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো। স্বপ্নের বাসর এক সময় মনে হলো সার্থক হয়েছে।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

ফিরিয়ে দাও

ছাকিনা

আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা আমার স্বামী। সে আমার কাছে দেবতার মতো পূজনীয়। আমাকে সে নিজ পছন্দেই বিয়ে করেছিল।

যখন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল বুকে অনেক আশা ছিল, মনে ছিল স্বপ্ন। বিবাহ-পূর্ব তার কথোপকথনে তাকে সাধারণ থেকে ভিন্ন পুরুষ ভেবেছিলাম। বিয়ের পর তার প্রেরণাতেই আমি ডাক্তার হয়েছি। বিয়ে-পরবর্তী তিনটি বছর আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। অতঃপর কি যে হলো জানি না। তার ভেতরে পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করলাম।

আমার সঙ্গে তার আচরণ চেঞ্জ হতে শুরু করলো। এখন সে সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। সব সময় সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। আমাকে অথবা সন্তানদের সময় দিতে চায় না। আমাদের প্রয়োজন/চাহিদাগুলোও মেটাতে চায় না। সাংসারিক ব্যাপারে কোনো শেয়ার নিতে চায় না। আমি একজন ডাক্তার হওয়ায় আমাকে বাইরে অনেকটা সময় দিতে হয়, অতঃপর ঘরে ফিরে সংসারের সবকিছু আমাকেই সামলাতে হয়। তাকে বললেও সে বুঝতে চায় না।

অসহ্য মানসিক চাপ নিয়ে আমার প্রতিটি দিন কেটে যায়। অনেকবার চেয়েছি চাকরি ছেড়ে দিতে, ছাড়তে দেয়নি। জানি না কি অপরাধে আমি এ শাস্তি পাচ্ছি। আমাকে সে বলেছিল, আমাদের সম্পর্ককে আমরা এমনভাবে লালন করবো যে, আমাদের বংশধররা তা স্মরণ করবে। আমরা হবো এভারগ্রিন কাপল। হায় ভালোবাসা!

সে আজ মুকুলেই বিবর্ণ। এবারের ভালোবাসা দিবসে তাকে বলছি, ‘এভাবে মোরে দিও না যাতনা, ফিরিয়ে দাও ভালোবাসা।’

কক্সবাজার থেকে

সুইটি

তোমার জন্য কি না করতে পারি। মরিতে পারি, মারতে পারি কিংবা রাতদুপুরে মাইলকে মাইল হাটতে পারি। তুমি আমার ২১টি বসন্তের হৃদয় রানী, তুমি আমার সাহস। নম্রতা, শৃঙ্খলাবোধ, সুখ ও বিশ্বাস। তুমি ভুল বোঝো না কোনোদিন। কারণ তুমিই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম।

নজরুল ইসলাম

জামালপুর

লাকি

আমার অন্ধকার তিক্ততার জীবনে তুমি এসেছ আলো হয়ে। তোমার মঙ্গল আলো আমার জীবনকে করেছে উদ্ভাসিত। জয় করে নিয়েছে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে।

লিটন

চট্টগ্রাম

কি করে বলি যে তোমাকে

যখন আমি কোনো কিছু ভাবি, তখন তোমার কথা ভাবতে পারি না। অনুভূতিগুলো কখনো বহমান নদীর মতো, কখনো সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো। কখনো বনলতার খোজে, কখনো নন্দিনীর খোজে শিহরণ তোলে।

শওকত রহমান

ধানমন্ডি, ঢাকা

রানী তোমার জন্য

প্রেয়সী তোমার জন্য

হৃদয় কাদে

দূর প্রবাসে আমি যে

মরুর ফাদে ।

রাজা

ঠিকানাবিহীন

ক্ষমা

সোয়াস-সিলভি, শায়লা-জোনাস, ছোয়া-ফুয়াদ, বর্ষা-লম্বু, তন্নী-শুভ, তাসমিন তোমাদের না বলে বাড়ি চলে এলাম মায়ের চিঠি পেয়ে । মা খুব অসুস্থ । কিছুদিন আগে বাবাকে হারালাম । তাই তো কাউকে না বলে পাগলের মতো ছুটলাম । এ লেখার মাধ্যমে তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । মা সুস্থ হলে দ্রুত ফিরে আসবো । ভালোবাসা দিবসে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ।

অপু

চাদপুর

অতৃপ্তি

মিম

আমার নাম মিম । বয়স প্রায় ত্রিশ । স্বামী আছে, দুটি সন্তান আছে । বড়টি মেয়ে । বয়স সাত । ছোটটি ছেলে । বয়স চার । আমার স্বামী বিদেশে থাকে । আমাদের বিয়ে হয়েছে দশ বছর । স্বামী প্রতি দুই বছর অন্তর দেশে আসে, চার-পাচ মাস থেকে আবার চলে যায় বিদেশে । টাকা পয়সার তেমন অভাব নেই । স্বামী বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় ভালোই । দোকানপাট, জায়গা জমি, গহনা সবই আছে আমার । স্বামীও সুপুরুষ । তাহলে বলা যায় যে খুবই ভাগ্যবতী মেয়ে আমি । সুখের আমার অভাব নেই । আসলেই কি তাই? না আমার জীবনে সুখ হচ্ছে মরিচিকার মতো । এই আছে এই নেই । কেন? কারণ বলছি ।

আমার বয়স যখন বার-তের তখন আমার বাবার মানসিক সমস্যা দেখা দেয় । ফলে আমার মাকে জমি বিক্রি করে সংসার চালাতে হতো । এক সময় জমি কমতে থাকলে মা দিশেহারা হয়ে গেলেন । আমরা অনেক বোন ছিলাম আর ছোট তিনটি ভাই । আমার চেহারা একটু ভালো হওয়ায় সবাই বললো একে পয়সাওয়ালা কারো কাছে বিয়ে দিয়ে দাও দেখবে ওরও গতি হবে, তোমাদেরও অভাব ঘুচবে ।

সেভাবেই আমার বিয়ে ঠিক করা হলো । আমি বরকে দেখিনি । বিয়ের পর লঞ্চে করে বরের বাড়ি গেলাম । সেখানে সবাই আমাকে দেখে কানাঘুষা করতে লাগলো । এতো ছোট মেয়ে এ ছেলের ঘর করবে তো । বাসর ঘরে আমি আমার স্বামীকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম কারণ আমার বাবার বয়সী একটি লোক । আমি কি করবো বুঝতে পারলাম না । ভয়ে জ্ঞান হারালাম ।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম আমি খাটের এক কোণে পড়ে আছি । শরীরে কোনো কাপড় নেই । বুঝলাম জ্ঞান হারানোর পর লোকটি তার কামনা মিটিয়েছে । প্রচ- ব্যথা নিয়ে উঠে দাড়ালাম, আর নিজের ভাগ্যকে মেনে নিতে চাইলাম । পারলাম না । প্রতিদিনই তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে জ্ঞান হারাতাম আর জ্ঞান ফিরে দেখতাম খাটের কোণে বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছি । তাকে ভালোবাসা তো দূরের কথা, ঘৃণা করতে লাগলাম ।

একদিন বাবার বাড়ি আসার সুযোগ পেলাম আমি । বাড়িতে এই যে ঢুকলাম আর ওই লোকের বাড়িতে যাবো না বলে ঠিক করলাম ।

এর মধ্যে আমাদের এলাকার এক মাস্তান ছেলে আমাকে পছন্দ করতো । তার মাস্তানি বন্ধ করতে তাকে বিদেশে পাঠানো হলো । সে আমাকে নিয়মিত চিঠি দিতো । তাই ভাবলাম ওই বুড়োর হাত থেকে বাচতে হলে আমাকে এর সাহায্য দরকার । তাই ওকে চিঠিতে ও ফোনে সব জানালাম । এড়িয়ে গেলাম লোকটির সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্কের কথা । কারণ তাতে যদি ওর মন ফিরে যায় । যেহেতু সে আমাকে পছন্দ করে

তাই ও আমাকে কথা দিল বিয়ে করবে দেশে এসে। ছয় বছর পর দেশে এসে সে আমাকে বিয়ে করলো।

বিয়ের দুই মাসের মাথায় বিদেশে চলে গেল। এ দুই মাস যেহেতু আমি মোটামুটি তাকে পছন্দ করি আর যেহেতু সে আমার উপকার করেছে তাই তার সঙ্গে মন খুলে শারীরিক সম্পর্ক করলাম। কিন্তু দুই মাসের মাথায় বিদেশ গিয়ে সে ফিরলো দুই বছর পর। এ দুই বছর একটি মেয়ে কিভাবে থাকে তা সে বোঝে না।

আমার দিন যায় কাজে কিন্তু রাত আর কাটে না। অনেক কষ্টে নিজেকে আটকে পার করলাম দুটি বছর। এরপর সে এসেই বাচ্চা নিতে চাইলো। কারণ বিদেশে থাকা স্বামীর-স্ত্রীরা একা থাকলে তাদের চাহিদা মেটাতে অন্য পুরুষ ধরতে পারে। সন্তান নিলে সে সন্তান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন আর চাহিদা নিয়ে ভাববে না।

বছর ঘুরতেই কোল জুড়ে আমার প্রথম সন্তান মেয়ে এলো। তাকে নিয়ে কেটে গেল বছর। স্বামী আসে দুই বছর পর। এসেই তার ভালোবাসা, বেড়ানো কোনো কিছুই নেই। যে কটি মাস থাকে শুধু আমার দেহটি ভোগ করে। এভাবেই বছরের পর বছর কাটে। আমার দ্বিতীয় সন্তান ছেলে হলো। কিন্তু আমার মনে ভালোবাসার ক্ষিধে রয়েই গেল।

এর মধ্যেই বাসা পাল্টিয়ে নতুন বাসায় উঠলাম। আমার সামনের বাসায় একটি ছেলেকে দেখতাম আমার দিকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকে। খুব রাগ হতো। ছেলেটি এভাবে তাকায় কেন? একদিন ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছেন? আমি কি ভেবে বললাম ভালো। এর দুদিন পর ছেলেটা আমার মোবাইল নাম্বার চাইলো। আমি তাকে না করতে পারলাম না, আমার মেয়েকে দিয়ে মোবাইল নাম্বার পাঠালাম। ছেলেটি ফোন করলো আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, দেখা করতে চায়, বন্ধুত্ব করতে চায়। আমি ভাবলাম এ জীবনে তো কোনো বন্ধুই পেলাম না। না হয় এর সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব হলো। হয়তো কথা বলে একটু একাকিত্ব দূর করা যাবে। পরদিন সকালে দেখা করবো জানালাম।

পরদিন সকালে আমরা ধানমন্ডি ৩২নং লেকের পাড়ে গেলাম। আমার খুব ভয় করছিল। চিনি না। জানি না এর সঙ্গে এক রিকশায় এলাম আবার এর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলছি। তবে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। খুব ভদ্র ছেলে। আর তার কথা কেমন যেন জাদুমাখা, একবার শুনলে বারবার শুনতে মন চায়। ফেরার পথে ছেলেটি রিকশায় আমার হাত ধরতে চাইলো। আমি তার কথায় না করতে পারলাম না। সে আমার হাতটি আলতো করে ধরে রাখলো। আমার সমস্ত শরীরে তখন বিদ্যুৎ ছুয়ে গেল। সে এক সময় আমার কাধে হাত রাখতে চাইলো। আমি নিষেধ করতে পারলাম না। সে আমার কাধ ছুয়ে বুক স্পর্শ করলো। আমার মনে হলো যেন জাদুর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ আমার শরীরে। এরপর ছেলেটির সঙ্গে আরো পাচবার দেখা করতে গেলাম। প্রতিবারই তার মুখের কথা আর তার হাতের জাদুর স্পর্শ আমাকে মাতাল করতে থাকে।

এর মধ্যে আমার স্বামী দেশে আসে। সে আসায় ছেলেটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ফোন সবই বন্ধ করতে হলো। ছয় মাস আমার স্বামী ছিল। সে সুপুরুষ তার কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু আমি ছেলেটির সে জাদু হাতের স্পর্শ ভুলতে পারিনি। স্বামীর এতো আদর সোহাগ আমাকে ওই স্পর্শ ভোলাতে পারে না।

ছয় মাস পর স্বামী চলে গেল বিদেশে। ছেলেটি আবার যোগাযোগ করলো কিন্তু আমার ভয় হতে লাগলো, যে ছেলে তার স্পর্শে স্বামীকে ভুলিয়ে দিতে পারে সে তো ভয়ঙ্কর ছেলে, সে আমার সব লুটে নেবে। তবুও মনকে মানাতে পারলাম না। তার ডাকে সাড়া দিয়ে আবারো তার সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। আবারো তার কথা ও তার হাতের স্পর্শ আমাকে মাতাল করে তুললো। আমি তখন তার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতেই পারি না।

রোজায় আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার প্রেশার, কাধ ও মাথায় প্রচ- চাপ। এসব কারণে আমাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হলো। কোনো অবস্থাতেই আমার মাথার চাপ কমছে না, আমি পাগলের মতো করছি। ছেলেটি খবর পেয়ে আমাকে দিনে ও রাতে একবার করে সবার অলক্ষ্যে দেখে যেতে লাগলো। আর মনে হতে লাগলো যখন ছেলেটি আসে আর মাথায় হাত রাখে তখন আমার সব যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে যায়। ও চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর আবার যন্ত্রণা শুরু হতো।

এক সময় ছেলেটি জানালো সে আমাকে ভালোবাসে। মনে হলো আমার সমস্ত যন্ত্রণা ভালো হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার আগের দিন সন্ধ্যায় ছেলেটি দেখা করতে গেলে ওর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কথা বললাম। আমার সব ব্যথা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। যাওয়ার আগে ছেলেটি আমাকে হসপিটালের নির্জন বারান্দায় নিয়ে দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে বুকের মাঝে নিয়ে আমার দুই ঠোটের মাঝে চুমু একে দিল। সারারাত ঘুমাতে পারিনি সে রাতে। মনে হলো আমার দুই বিয়ে, আমার দশ বছরের সংসার, দুটি সন্তান, স্বামী সবই আমার কাছে অর্থহীন। আমার জীবনে যে ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল তার দেখা আমি পেয়েছি।

এরপর থেকে ওকে ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারি না, ওকে নিয়ে বাজার করি, মার্কেটে যাই, নিজে ডাক্তার দেখাই, বাচ্চাদের ডাক্তার দেখাই অর্থাৎ আমার সব কাজই ওর সাহায্য ছাড়া আমি করতে পারি না। ও আমার সব কাজ করে দিতে লাগলো। আমাকে ছোট বাচ্চার মতো শাসন করতে থাকে ও। আমার খুব ভালো লাগে ওর শাসন।

ঈদের দিন জিয়ার মাজারে গেলাম। সন্ধ্যায় ওকে আমার বাসায় নিয়ে গেলাম নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবো বলে। ঘরে গিয়ে ওকে হাতে তুলে খাওয়ালাম। খাওয়ার পর ও আমাকে ওর বাহুতে জড়িয়ে নিল। আমি তার স্পর্শে মাতাল হলাম।

তার এক সপ্তাহ পর আমাদের প্রথম মিলন। আমার মনে হলো আমার স্বামী সুপুরুষ তবে এমন ভালোবেসে আর এত সময় নিয়ে মিলন আমি আগে কখনো পাইনি। এরপর থেকে আমাদের প্রতিদিন মিলন হতো।

আমার মনে হলো পৃথিবীর সব সুখ আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে।

ছেলেটির সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্কের জন্য যে তাকে আমার ভালো লাগে তা কিন্তু নয়। তার সব কিছুই ভালো। আমার বাচ্চাদের যে কোনো কাজে সে এমনভাবে ছুটে আসে যেন এ দুটি তার নিজের সন্তান। আমার ও আমার বাচ্চাদের সব কাজে সে আমার স্বামীর চেয়ে হাজার গুণ মমতা নিয়ে কাজ করে যা আমাকে তার প্রতি আরো আকৃষ্ট করে তোলে। আমার স্বামী দেশে থাকলেও বাচ্চাদের প্রতি বেশ উদাসীন। আর আমার স্বামীর খারাপ অভ্যাস সে কথায় কথায় আমার গায়ে হাত তোলে, বাচ্চাদেরও যখন তখন গায়ে হাত তোলে যা আমার একদম সহ্য হয় না। আর এজন্য আমার বাচ্চারা তার বাবার কাছে কম ভিড়ে। অথচ এ ছেলের কাছে তারা তাদের সব আবদার করে। তাদের কাছে এ ছেলেই অলিখিত বাবা হয়ে ওঠে।

যেহেতু আমার স্বামী, সন্তান রয়েছে তাই ওকে বললাম তুমি বিয়ে কর। ও জানতে চাইলো, আমি বিয়ে করলে তুমি তা সহ্য করতে পারবে?

আমার মনে হলো আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে তবুও আমার বাচ্চা দুটির কথা ভেবে সমাজের ভয়ে ওকে বললাম পারবো, তুমি বিয়ে কর। ও আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। তবুও সবার কল্যাণে ও তার অভিভাবকদের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করতে মত দিল।

ওর বিয়ের সপ্তাহখানেক আগে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগলো আমার বুক থেকে ওকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সতীন নিয়ে আসছে ও। আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল, খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ও আমাকে বোঝাতে লাগলো তুমি তো বলেছ বিয়ে করতে, আমরা বন্ধু হয়ে থাকবো। কিন্তু আমার মন মানতে চাইলো না। আমার অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। ছেলেটা আমার জান হয়ে গেছে। আমি খেতাম না দেখে প্রতিদিন এসে নিজ হাতে আমাকে খাওয়াত। যতোই ওর বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততোই আমার অবস্থা খারাপ হতে লাগলো।

ওর বিয়ের দিন আমি সারাদিন কিছু খেলাম না, গোসল করা, চুল আচড়ানো ভুলে গেলাম। ঘুমালাম না সারাক্ষণ। আমার জানালা দিয়ে ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগলাম। যদিও প্রতি আধঘণ্টা পরপর ও ফোন করে আমার খবর নিচ্ছে তবুও আমার মনে হতে লাগলো ও আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমার চিন্তায় ও বাসর রাত করলো না নতুন বউয়ের সঙ্গে। সকালে ভোরে অফিসে চলে গেল। সারাদিন আমার সঙ্গে ফোনে কথা বললো। বিকালে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে চলে এলো সবার চোখ ফাকি দিয়ে আমার কাছে। এসে আমাকে নিজ হাতে খাওয়ালো। বুকে জড়িয়ে বললো, তুমি এমন করবে আমি জানতাম তাইতো বলেছিলাম বিয়ে করবো না, চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি। আমি ওকে উজাড় করে আমার সবকিছু দিয়ে দিলাম যাতে ও বউয়ের কাছে গিয়ে তার শরীর না ছোয়। ও বললো, বলো তুমি কি চাও।

আমি বললাম, তোমার বউকে তুমি ছুতে পারবে না আমাকে কথা দাও।

ও বললো, সেটা কি কেউ মানবে।

আমি অনড় দেখে ও কথা দিল। আমি ওকে শর্ত দিলাম যে তিন চার দিন পর একদিন বউয়ের সঙ্গে একবার মিলিত হতে পারবে। বউকে আদর করা যাবে না, তার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া যাবে না। যত কম সময় তাকে দেয়া যায়। প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ও তাতেও রাজি হলো। আসলে ও আমাকে কষ্ট দিতে চায় না। আমার কোনো কষ্ট ওর সহ্য হবে না।

এরপর প্রতিদিন ও অফিস থেকে তাড়াতাড়ি এসে আমার এখানে তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে যেত। এ সময় আমি ওর পছন্দের আসিদ্ধ আটার রুটি বানিয়ে মাংসের ভুনা দিয়ে নিজ হাতে ওকে খাওয়াতাম। এরপর আমার সবকিছু বিলিয়ে ওর দেহের মাঝে লুটিয়ে পরতাম। প্রায়ই আমি হার মেনে নিতাম ওর কাছে। ও এতো সময় নিত যে আমরা তিন ঘণ্টা একত্রে থাকলেও একবারের বেশি মিলনের সময় পেতাম না। কিন্তু তবুও ওকে বলতাম তুমি ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে যতো ইচ্ছা কর কিন্তু তোমার বউকে ধরবে না। ও আমার কথা রাখতো।

কিন্তু আমি বেশি দিন এভাবে থাকতে পারলাম না। আবারো আমার আগের মতো অবস্থা হলো। খাওয়া বন্ধ, ঘুম নেই। আমার অবস্থা দেখে ও আর ঠিক থাকতে পারলো না। আমরা দুজন শুধু দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাদতে থাকি আর আমাদের কি হবে তা ভাবি।

ও বুঝতে পারলো ওর বিয়ে করাটা মস্ত বড় বোকামি হয়েছে। ও কামনা করতে লাগলো ওর বউয়ের একটা দোষ পেলেই বউকে ছেড়ে দেবে। আর আল্লাহর কি মেহেরবানী ওর বউয়ের সঙ্গে এক ছেলের বিয়ের পর যোগাযোগ ওর হাতে ধরা পড়লো। সে ওর বউকে বিদায়ের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। এখন শুধু ওর বউয়ের সঙ্গে তার কাগজপত্রে বিদায় বাকি।

এর মধ্যে ঈদের আগের দিন আমার স্বামী দেশে এলো। আমার স্বামী আসার পর আমি নিজেকে একটু সামলে নিলাম কিন্তু ও আমার স্বামীকে দেখে আমার মতো অবস্থা হলো ওর। ও আমার স্বামীকে সহ্য করতে পারলো না। আমার মতো ও আমাকে শর্ত দিল যেন আমার স্বামী আমাকে ছুতে না পারে। সপ্তাহে একদিন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবো। স্বামীকে আদর সোহাগ করা যাবে না। আমি ওর দেয়া শর্ত মেনে চলতে লাগলাম। স্বামী সন্দেহ করতে লাগলো। এর মধ্যে কে যেন আমার স্বামীর কাছে আমাদের সম্পর্কের কথা বলে দিল। সে আমার ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিল এমনকি বারান্দায় যাওয়া, ওকে একবার দেখা সব বন্ধ করে দিল। আমার মোবাইলটাও ছিনিয়ে নিল।

আমাদের দুজনের মাঝের সম্পর্ক জানতে চাইলো কিন্তু আমরা আমাদের মাঝে সম্পর্ক জান গেলেও বলবো না । বলতাম কিন্তু বাচ্চা দুটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমাজ আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবে না এজন্য আমরা চুপ হয়ে গেলাম । আমার স্বামী ছেলেটিকে নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগলো তার গু-াপা-া দিয়ে । আমি জানি ও ভয় পায় না শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে । আর আমি আমার স্বামী যখন আমাকে স্পর্শ করে তখন মনে হয় যেন একজন অচেনা পুরুষ আমাকে জোর করে ধর্ষণ করছে । আগে বাধা দিতাম এখন বাধা দিলে সে প্রচ- মারধোর করে । তাই তার কামনার সময় নিজেকে জিন্দা লাশের মতো করে দিই । তা-না হলে সে আমাকে মারে, আমার বাচ্চাগুলোকে মারে আর ভয় দেখায় আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় আমার ভালোবাসাকে গু-া দিয়ে হত্যার । আমি ভয়ে সিটিয়ে থাকি । আমি ওকে দেয়া কথা রাখতে পারছি না ।

আমার স্বামী নামের জন্তুটি আমাকে প্রতি রাতে তার হিংস্রতা দিয়ে ভোগ করে । তাতে নেই কোনো আনন্দ, নেই কোনো ভালোবাসা, থাকে শুধুই ঘৃণা । জানি এ পৃথিবীতে আমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভালোবাসার কাছে যেতে পারবো না । তবে যদি খোদা আবার আমাদের পুনর্জন্ম ঘটায় তবে সে জনমে আমি শুধু আমার ভালোবাসার প্রেমিক, ওর

ঘরের বউ হয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে চাই । জানি এই জনমের অতৃপ্তি পরের জনমে হয়তো মিটবে ।

পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

উৎস

শেখ মোহাম্মদ সেলিম

এক অর্থবিহীন স্বার্থসহ অসংজ্ঞায়িত মনোবাসনার নামই যেন ভালোবাসা । অসীম, অস্পষ্ট চাওয়া ও না পাওয়ার বরফাবৃত অনল থেকেই তার সূচনা । শাসনের দুর্ভেদ্য দেয়াল ভাঙা যেন তার নিত্য দিনের ক্রীড়াচর্চা । এ যেন স্রোতস্বিনী নদীতে বাশের বেড়ার বৃথা প্রচেষ্টা । ভালোবাসা তবু বাসা বাধতে চায় অগ্নি চূড়ায় । সে সদ্য ভূমিষ্ঠ নর শিশুর অবাধ কান্না, অর্থযোগ্য খোজা যেখানে নেহাত বোকামি ।

ভালোবাসা তুমি প্রথম সৃষ্টির একাকিত্বের ফসল । ভালোবাসা নিঃষ্পাপ পুষ্পের সরল হাসির পরম সুভাষ ।

সে যেন শত তাজমহলের বুকের কষ্ট। ভালোবাসা যেন শত বিলাসীর রুগ্ন মৃত্যুঞ্জয়। সে যেন থাকে বোরখাপরা মেয়েটির চোখে। সে যেন থাকে জরিনার বাপের রগফাটা লাফালাফিতে জরিনার কান্নায়। তুমি থাকো কি কলেজ বালিকার ত্রিমুখী প্রেম চর্চায়? থাকো কি তুমি পালকিতে বসা নব বধূর কান্নায়?

ভালোবাসা জানে হিরের দামে কাচ কিনতে। আপনি থেকে তুমি হওয়ার দাওয়াইয়ের নাম ভালোবাসা। রাস্তা চলার ফাকে সুন্দরীকে দেখে গোটা তিনবার পেছন ফেরার মূলেও তো সেই...। 'এই শোনো না তোমার সঙ্গে কথা আছে', এটিও কি?... নতুন জামাটি পরে, নতুন পারফিউম মেখে ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে বার কয়েক পায়চারিও তো এমনিতে নয়! খড়াব লেখা সেই ঝগঝ-টাও এমনিতে নয়।

আমার প্রাণের প্রিন্সেস রোকসানা মনের কথা বুঝলো না। আর তাই তো আমার হাতে সিগারেটটা জ্বলে এবং তারই কথা বলে। কেন তুমি ঝুলে পড়লে মনির সাহেবের গলে? তবু ভালোবাসি-ভালোবাসি-ভালোবাসি আমি আজো তোমায়। তোমার দেয়া প্রথম পত্র ফুল ও ছবি আজো আছে যথাসম্ভব সম্মানে।

এ প্রাণের কথাগুলো সবই বৈশিষ্ট্য সেই নির্বোধ পাগলামির।

যতোই বলি পাগলামি আর বোকামি, ওই বস্তুটা ছাড়া মিথ্যা ঘর-সংসার ও দুনিয়াদারী। ভালোবাসা থাকে শাসনের পরে মায়ের চুম্বনে, বাবার আদরে। ধরা যায় না, যায় না ছোয়া তবু দাম যেন তার আকাশ ছোয়া। এ কারণেই বুঝি তুমি অমূল্য ও অক্ষত এবং চির অম্লান ধরণীতে। শক্তিতে তুমি ঈশ্বরের পরে আকারে বৃহৎ ধরার চেয়েও।

জয় হয়েছে ভালোবাসারই শত-সহস্রাব্দে-যুগান্তরে। ভালোবাসা দিবসে সব বন্ধুর জন্য ভালোবাসা।

করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে

দেবী

শাহরুখ

নিরুপমা,

মনে আছে! যেদিন প্রথম ফুল ফুটলো সেদিন তোমার হাত ধরে ক্যাম্পাসের সবুজ ঘাসে বসেছিলাম ।

কৃষ্ণচূড়ার লাল আর সোনালুর হলুদ রঙে প্রকৃতি কেমন মাখামাখি হয়েছিল! তুমি প্রকৃতি খুব ভালোবাসো । আমিও এখন সবুজ রঙ ভীষণ ভালোবাসি ।

মনে আছে! যেদিন প্রথম তোমার দুই চোখ জলে ভিজেছিল, তা আমি মুছে দিয়েছিলাম ।

মনে আছে! যেদিন প্রথম তোমার চায়ের কাপে আমার কাপ থেকে চা ঢেলে দিয়েছিলাম আর তুমি হাসতে হাসতে তা পান করেছিলে!

এ সবই যেন তোমার ভালোবাসায় ভরা এক একটা ঝরা ফুল ।

কতোটা পথ তোমার হাত ধরে অতিক্রম করেছি; তুমি আমার আধার জীবনে প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছ, আমার জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছ, অথচ তোমার হিসাবের খাতা শূন্যই রয়ে গেল ।

নিয়তির বাধা ছকে তোমার আমার নাম কেন এলো না?

নিরুপমা, কেন তোমায় আমি ঘরণী করতে পারিনি?

যেদিন সানাই বাজলো, কি অন্তহীন বেদনা বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে অন্য লোকের বাসিন্দা হয়ে গেলে তুমি ।

জানি– কতোটা কষ্টে কাটে তোমার প্রতিটি প্রহর । তারপরও তোমার কোনো অভিযোগ নেই কারণ তুমি সেই ঔবহহরভবৎ (উৎরপয ঝবমধষ-এর খড়াব ঃড়ৎু ছবির নায়িকা)-এর মতোই বিশ্বাস করো– লাভ মিনস নেভার হ্যাভিং টু সে ইউ আর সরি ।

নিরুপমা,

সত্যি তুমি অনন্যা, তুমি অসাধারণ, তুমি ‘দেবী’ ।

তোমাকে হারিয়ে বুঝলাম, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে হতদরিদ্র মানুষটি হলাম আমি ।

তোমার জন্য আমার অনন্ত ভালোবাসা... ।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

দেবী

শাহরুখ

নিরুপমা,

মনে আছে! যেদিন প্রথম ফুল ফুটলো সেদিন তোমার হাত ধরে ক্যাম্পাসের সবুজ ঘাসে বসেছিলাম ।

কৃষ্ণচূড়ার লাল আর সোনালুর হলুদ রঙে প্রকৃতি কেমন মাখামাখি হয়েছিল! তুমি প্রকৃতি খুব ভালোবাসো । আমিও এখন সবুজ রঙ ভীষণ ভালোবাসি ।

মনে আছে! যেদিন প্রথম তোমার দুই চোখ জলে ভিজেছিল, তা আমি মুছে দিয়েছিলাম ।

মনে আছে! যেদিন প্রথম তোমার চায়ের কাপে আমার কাপ থেকে চা ঢেলে দিয়েছিলাম আর তুমি হাসতে হাসতে তা পান করেছিলে!

এ সবই যেন তোমার ভালোবাসায় ভরা এক একটা ঝরা ফুল ।

কতোটা পথ তোমার হাত ধরে অতিক্রম করেছি; তুমি আমার আধার জীবনে প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছ, আমার জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছ, অথচ তোমার হিসাবের খাতা শূন্যই রয়ে গেল ।

নিয়তির বাধা ছকে তোমার আমার নাম কেন এলো না?

নিরুপমা, কেন তোমায় আমি ঘরণী করতে পারিনি?

যেদিন সানাই বাজলো, কি অন্তহীন বেদনা বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে অন্য লোকের বাসিন্দা হয়ে গেলে তুমি।

জানি– কতোটা কষ্টে কাটে তোমার প্রতিটি প্রহর। তারপরও তোমার কোনো অভিযোগ নেই কারণ তুমি সেই ঔবহহরভবৎ (উৎরপয ঝবমধষ-এর খড়াব ৎঃড়ৎু ছবির নায়িকা)-এর মতোই বিশ্বাস করো– লাভ মিনস নেভার হ্যাভিং টু সে ইউ আর সরি।

নিরুপমা,

সত্যি তুমি অনন্যা, তুমি অসাধারণ, তুমি 'দেবী'।

তোমাকে হারিয়ে বুঝলাম, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে হতদরিদ্র মানুষটি হলাম আমি।

তোমার জন্য আমার অনন্ত ভালোবাসা...।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

একটু আশ্রয়

মোজাম্মেল হক মোল্লা

জীবনের একটা সময় আসে যখন মানুষের মন নিজেকে বিকাশ করতে চায়। চায় আপন ভুবনের সীমানা পেরিয়ে অন্য কোনো ভুবনের সীমানায় প্রবেশের অধিকার। তখন সে একটা আশ্রয় খোজে। সে আশ্রয় তাকে অবলম্বন দেবে। কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু বিকাশকে ব্যাহত করবে না। জীবনের এমন সুবর্ণ সময়ে একটা আশ্রয়ের খোজে হয়েছি আমি ভ্রমণকারী। পৃথিবীতে এতো অগণিত দ্বার, কোনো দ্বারে করাঘাত

করবো– কোথায় মিলবে একটু আশ্রয় । রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, জ্যোৎস্না রাতের উজ্জ্বলতায় চির দুঃখী মানুষের মতো জীর্ণ বাসে, জীর্ণ দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছি দ্বার থেকে দ্বারে । কিন্তু কেউ দ্বার খোলে না । চোখ তুলে তাকায় না । সময়ই বা কোথায় চোখ তুলে তাকানোর । রঙিন রোদে এ জ্বালাতন সহ্য করার আশ্রয়হীন পাখির মতো শুধু ডানায় ভর করে দিগন্তের পর দিগন্ত পাড়ি দিয়ে এক সময় হয়ে পড়লাম পথহীন দিগভ্রান্ত এক পথিক । পায়ের তলায় এসে মাথা কুটতে লাগলো পথেরা । ক্লান্ত জীবনে নিঃশব্দের মতো সন্ধ্যা নামে, রাত আসে । জ্যোৎস্না রাতের উজ্জ্বলতায় চেয়ে দেখি বৃষ্টি ভেজা চতুর্দশীর মতো তারায় তারায় সেজে আছে আকাশ । শুধু ভাবি সুবিস্তৃত অসীম আকাশের কোনো এক কোণে কি একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে না?

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ থেকে

মধু

আজ আমার মনের আকাশে মেঘ জমেছে শুধু তোমার জন্য । আকাশের সব নীল কেড়ে নিয়ে তুমি কালো মেঘে ঢেকে দিলে আমার জীবনে । নিজের গল্পটা তো ঠিক নিজের মতো করেই সাজিয়ে নিলে । রাস্তার জলের মতো জমে আছে আমার যতো দুঃখ, যতো কষ্ট ।

সুমন

নিচাবাজার, নাটোর

হারানো প্রিয়তমা সজনী

পৃথিবীর কাছে আর নেই কোনো দাবি, মুছে যাক হৃদয়ের আকা যতো ছবি । আমার চলার পথ থাক না ঢাকা, স্বার্থপর এ পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ বুকে আজ আমি একা, বড় একা । নেই আমার আর কোনো স্বপ্ন আশা, সবকিছু ঢেকেছে আজ শুধুই হতাশা । কালো কেশের দু'অঞ্চলের মধ্যে লাল সিদুরসহ তোমার সুন্দর রূপ দেখার একটা দারুণ বাসনা আমার । সাহস করছি এই সূত্রে, যেহেতু পৃথিবী গোল তাই এক দিন না এক দিন অবশ্যই তোমার দেখা পাবো । ভালো থেকো, অনেক ভালো আর... ।

আইনাল হক শোভন

রাজশাহী

ধ্রুব তারা

প্রতিটি তারা ভরা রাতের আকাশে

খুজে বেড়াচ্ছি সেই ধ্রুব তারাকে

যাকে মনের কথা বলবো ।

সাজু

দিঘলীবাজার, লক্ষ্মীপুর

ন্যাচারাল শুভেচ্ছা

বইকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি ভালোবাসি আমি পৃথিবীর সব মানুষকে । পাশাপাশি ওদের যারা আমার বন্ধু, আমার সহধর্মিণী আর প্রিয় সন্তানদের । ভালোবাসা দিবসে সবাইকে বই ও ফুলের ন্যাচারাল শুভেচ্ছা ।

শফিকুর রহমান খান

ফরিদগঞ্জ, চাদপুর

চিরন্তন নয়

লাবণ্য প্রভা

তার সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর আমি আমার স্বতন্ত্র শব্দগুলো সচেতনভাবে পরিহার করেছিলাম । পরিবর্তে আমরা , আমাদের শব্দগুলো সযত্নে লালন করেছি ।

প্রেমের বৈতরণী নায়ে পাক্কা সাতটি বছর পার করে আমরা যুগল পথচলার স্বপ্নে আকুল হয়ে বিয়ে করলাম ।

ধরা যাক নাম তার অমিত আনন্দ । আর আমি লাবণ্য প্রভা । কবিগুরুর অমিত, লাবণ্যর মতো কাব্যময় প্রেম না হলেও আমাদের প্রেম নিছক হেলাফেলার ছিল না ।

আমরা যেমন তেমনি পরিচিতজন, শুভাকাঙ্ক্ষিরা আমাদের মজবুত প্রেমময় সম্পর্ক উপভোগ করতেন কিংবা অনেকের ঈর্ষার কারণও যে আমরা হতাম তা না বললেও অনুমান করা চলে ।

আমার অমিত আনন্দ বামধারার তুখোড় ছাত্রনেতা ।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিন-মাও সে তুং-হো চি মিন প্রমুখ মহামানবদের বিপ্লবী তত্ত্ব নিয়ে সে মুখোর আলোচনা করতো । আমি বিমুগ্ধ এক শ্রোতা । তার পরম উদ্দীপনায়, উত্তেজনায় তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও রাজপথে হেটেছি, স্লোগানে গলা মিলিয়েছি বহুবার ।

হাটতে হাটতে গলা মিলাতে মিলাতে অবশেষে প্রাণ ও প্রাণে মিলিয়ে নিয়েছিলাম ।

সমাজ বাস্তবতা, সামাজিক চাহিদা, লৌকিকতা বৈষয়িক স্বার্থকে বাতিল চিন্তা হিসেবে তার মতো করে ভাবতে শিখেছিলাম । শোষিত-বঞ্চিত, দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ উন্নয়নে উভয়ে নিঃস্বার্থ শ্রম দেবো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমিও করি । বিত্ত-বৈভব, বিলাস, সৌখিন জীবনের স্বপ্ন নয়, নিজেদের সাধারণ জনগণের কাতারে সামিল করাই লক্ষ্য ছিল । তাই ইউনিভার্সিটির পাঠ চুকিয়েও আমরা এনজিও তো বটে সরকারি কর্ম কমিশনের জন্যও চেষ্টা করা থেকে নিবৃত্ত ছিলাম । খাওয়ার জন্য বাচা নাকি বাচার জন্য খাদ্য - এর মতো তত্ত্ব ধারণ করে কৃচ্ছসাধন বসন, ভূষণসহ সব ক্ষেত্রে অভ্যাসের চেষ্টা করছিলাম ।

এভাবে দিন যায়, মাস যায় ।

পার্টির ন্যূনতম প্রতীকী ভাতায় সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে দাড়ায় । চাল থাকে তো তেল থাকে না, নুন-পেয়াজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে ঘাটতি পড়ে । চায়ের নেশা উভয়ের । অথচ চিনি, চা পাতা হরহামেশায় থাকে না ।

চালের দাম ৪০, তেলের দাম লিটারে ১০২ টাকা । জিনিসের দাম বেড়েছে, আয়তো বাড়েনি! কপালে কু-ন তার মতো আমারও । অকারণ কথা বলা এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছে সে । কি যেন ভাবে আর সস্তা

সিগারেট পোড়ায়।

রাত জেগে ধার করা বই পড়ে কিংবা লিখেই ছিড়ে ফেলে। এমনও হয় সন্ধ্যাবেলায় রেডিওতে বিবিসি শুনতে শুনতে অবেলায় ঘুম। ঘুম ভাঙালে কটমট করে ঘুম ভাঙা রক্ত লাল চোখে তাকাবে কিংবা ঘুম ভাঙানোর জন্য ভয়ঙ্কর চেচামেচি করবে। কখনো রাতে বিছানায় পরম সোহাগে হাত বাড়াতে গেলে বলবে, প্লিজ ঘুমাও।

আমাদের বিয়ের বছর ঘোরেনি। এরই মধ্যে নৈব্যর্ক্তিক সম্পর্ক শুরু হয়ে গেছে। আমার হৃদয় পোড়ে। আহত হৃদয়ে প্রশ্ন উকি দেয় - এমন হওয়ার কথা ছিল কি? আমি অভিমান করি। এতে তার দৃষ্টি থাকে বলে মনে হয় না। তার মনের গহীন তলের খবর যেন দীর্ঘকাল পাই না। আমার চিন্তা বাড়ে। আমাদের কিংবা তার হিসাবে কোথাও ভুল হলো কি? তার এ পরিবর্তন কি সংসারের টানাটানি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নাকি অন্য কিছু?

শাহবাগ, ঢাকা থেকে

সভ্য

আজ বাড়িতে কেউ নেই। আব্বু-আম্মু, ছোট ভাই-বোন দুটোই বেড়াতে গেছে। আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি, বৃষ্টির শব্দ শুনছি। কেন জানি ক্ষণিকের জন্য বৃষ্টিরা আমাকে একজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি তাকেই নিয়ে ভাবতে লাগলাম। মনে হলো আজ এই মেঘলা দিনে তাকে কাছে পেলে আমি ধন্য হবো।

কেন জানি কিছুই ভালো লাগছে না। তাই আমার ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি। আর মেহেদির ছবিটা দেখছি। দেখতে দেখতে কেন জানি পিঠের ওপর কারো হাতের স্পর্শ পেয়ে আমি চমকে উঠলাম। ঘুরে তাকাতেই দেখি মেহেদি ওর হাতে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল আমার হাতে দিয়ে বললো, আই লাভ ইউ।

আমি তো প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ওকি সত্যিই এসেছে, নাকি স্বপ্ন দেখছি। ওকে বললাম, আমি কি তোমার হাতটা ছোবো?

কেন?

যদি স্বপ্ন হয় এসব ।

বলে, না সত্যিই আমি এসেছি ।

ও ওর হাতটা আমার হাতে রাখলো এবং সুন্দর করে হাতে একটা কিস করলো । তারপর আমার এলোমেলো চুলগুলোতে সুন্দর করে হাত বুলিয়ে দিলো ।

তোমার হাতে কি?

বললাম, কিছু না ।

নিশ্চয়ই কিছু তুমি লুকাচ্ছো কেন? না দেখালে চলে যাবো ।

ওর হাত টেনে ধরলাম । বললাম, তোমার ছবি । ও আচ্ছা, আমি মনে করেছিলাম অন্য কারো হবে হয়তো ।

আমি রেগে উঠে যেতে ও আমাকে চেপে ধরলো এবং দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল । আমি তো ভয়ে কাপছি ও আমার ঠোট দুটিকে নিজের লাল ঠোট দুটি দিয়ে চুষতে লাগলো । আমার কেমন জানি অনুভূতি মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল । আমি শক্ত করে ওকে চেপে ধরলাম । ও আবারো আমার ঠোট দুটিকে আদর করছে । আমি চোখ বন্ধ করতে ও আমার গালে, গলায় সুন্দর করে কিস করছে । তারপর ও আমাকে ওর কোলে বসায় । আবার আদর করতে লাগলো । এক সময় আমি লজ্জা পেয়ে দৌড়ে অন্য ঘরে চলে গেলাম ।

পেছনে তাকাতে দেখি মেহেদি । বললাম– তুমি যাও, আমার ভীষণ লজ্জা করছে ।

ও বললো, আরেকটু থাকলে লজ্জা ভেঙে যাবে । ও আবার আমার পিঠে কিস করলো । তারপর বলছে, শোনো ভয় পেও না, আমি ওই রকম খারাপ ছেলে না যে তোমার সর্বনাশ করবো । সেগুলো কখনো হবে না । কিন্তু হ্যা, পরীক্ষা শেষে যখন তোমাকে বউ করে নিয়ে যাবো তখন বুঝতে পারবে । তখন তুমি শুধু আমার । পাশা খেলবো সারা রাত জেগে । তোমার বৃষ্টির বনে ভেজে হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাবো ।

বললাম, অসভ্য কোথাকার।

সে বললো, হ্যা এখন অসভ্য। বিয়ের পরে নিজেই বলবে সভ্য।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর থেকে

প্রার্থনা

এইচএম আবু হাসানাত

তন্ত্রীতে যে সুর বাজছে তা কখনো বেসুর হবে না। আমি তোমার নিত্যদিনের সঙ্গী না হলেও তোমার জীবনে আমার ক্ষুদ্র স্পর্শ আছে। জানি আমার এ স্পর্শ তোমাকে স্পন্দিত করে, যা আমি অনুভব করি। তুমি যেভাবে যা চাও তা যেন সেভাবেই পাও, এ প্রার্থনা করি সর্বসময়। আমি চিরকাল তোমার অপেক্ষায় থাকবো। ভালো থেকো, ভালো।

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি থেকে

নীড়হারা

মোহাম্মদ শিবলী নোমান

গোধূলির যতো রূপ এনে দিতাম

নীড়হারা পাখি হয়ে চেয়ে দেখতাম

যদি বলতে ভালোবাসি।

গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকে

শিউলি

হিরা

যে ভালোবাসা অনন্তকালে ফুরাবার নয়

সেই ভালোবাসা শুধু শিউলীকে... ।

বনানী, ঢাকা থেকে

কাম নভেম্বর

এস এম মোর্সেদ চিশতী সুমন

হাই মিসটেরিয়াস গার্ল

আমার কেবলই মনে হয়, তোমার এই রিমঝিমে কণ্ঠটা অতি পরিচিত । বুকের ভেতর লাগা এমন অস্ফুট উচ্চারণ আমি কোথায় যেন শুনেছি, কিন্তু সেই নিরেট কণ্ঠটি কার তা উদ্ধার করতে পারছি না । কে, কোথায়, কবে, আমার কর্ণকুহরে ঢেলে দিয়েছিল ভীষণ মাদকতায় ওই শব্দের উৎস, জানি না । ভয়াবহ কণ্ঠজটের ঘুরপাক লেগে গেছে আমার নিউরনে, একটা সীমাহীন অস্বস্তির ভেতর দিয়ে পার করছি প্রতিটি দিন । অথচ তুমি কিচ্ছুটি বুঝতে পারছো না?

ডিয়ার সানশাইন

প্রতি রাতে মোবাইলের কল্যাণে তোমার বিশেষ নাম্বারে ফোন ঘোরাই নিয়ম করে, তোমার বুক জ্বালা করা রিনিঝিনি কণ্ঠের সঙ্গে দু-চার মিনিট এলোমেলো কথোপকথন, নিতান্তই ভদ্রতা আর শিষ্ঠতায় মতবিনিময় । ওপারে তোমার কথা জানি না, কিন্তু আমি পুড়তে থাকি নিদারুণ কণ্ঠের তাপে, অথচ আমি তোমার নাম জানি না, ধাম জানি না, শুধু জানি দিনের ব্যস্ততা কমে রাত নেমে এলে তোমার মোহময় কণ্ঠ শুনতে পাবো, যা শোনার জন্য আমি একটা গোটা দিন অসহ্য অপেক্ষায় কাটাই । তুমিও কাটাও কি না জানি না? জানতে ইচ্ছাও করে না, এতোদিন যখন তোমার শুভ নামখানাই জানা হলো না? কি আশ্চর্য অপদার্থ আমি ।

ডিয়ার মিসটিক

তুমি প্রায়ই এটা সেটা জানতে চাও, এসএসসি কোন সালে, পড়াশোনার দৌড় কতো দূর, কী করছি, দেশের বাড়ি কোথায়, বাবা কি করেন? আমি জানি, তুমি আমায় পরখ করছো, কিংবা আমার অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করছো! আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই চোখ বন্ধ করে, চেষ্টা করি তোমার কণ্ঠের সঙ্গে কোন মুখ মানায় বা তোমার এতো কিসের লুকোছাপা এসব হাবিজাবির উত্তর বের করতে, কিন্তু প্রতিবারই আমি অপ্রস্তুত হই, তুমি লাইন কেটে দাও।

ডিয়ার এনিগম্যাটিক

তুমি নিতান্তই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার পূর্ণাঙ্গ সিভি থেকে একটা তথ্য অবশ্য আমায় দিয়েছো, তোমার জন্মদিন '২৯ নভেম্বর'। আমি কৃতার্থ। ওইদিন আমি আমার জন্য সারেজাহানে স্বেচ্ছা ছুটি ঘোষণা করছি, ওইদিন আমি কোনো কাজ করবো না, অন্য কোনো কিছুতে ব্যস্ত হবো না, রাত ১২টা থেকে একক কর্মসূচি পালন করবো। তুমি যদি বিফোর ২৯ সেপ্টেম্বর তোমার বসতবাটির ঠিকানাটা দয়াপরবশ হয়ে জানাও, তবে দেড়টনি ট্রাকের এক ট্রাক বোঝাই গোলাপ, রজনীগন্ধা আর শিউলি, বকুলে ভর্তি উপহার পাঠাবো, তোমার বাড়ির সামনের লেম্প পোস্টে টানিয়ে দেবো 'শুভ জন্মদিন' লেখা বিশাল বিলবোর্ড। পত্রিকার প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন দেবো চার ইঞ্চি চার কলাম। বিজয় সরণির মোড়ে টানিয়ে দেবো নিয়ন সাইনে লেখা 'শুভ জন্মদিন- অদেখা বন্ধু আমার, দেখা দাও, উন্মোচিত হও।'

ডিয়ার ইনডিসক্রিট

২৯ সেপ্টেম্বর এখনো অনেক দেরি, আমি অপেক্ষা করছি অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার। যদি তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখো সাত সমুদ্দুরের ওপারে, তাহলেও আমি অপেক্ষা করতে থাকবো প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন, মাস, বছর। 'তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি পরে, সে কেন পাঠাবো তারে সরল অন্তরে!'

ডিয়ার ভেইলড লেডি

আমি কক্ষনোই আমার পুড়ে খাক হওয়ার কথা, কষ্টস্নাত অপেক্ষার কথা, অহর্নিশ যন্ত্রণার কথা তোমায় বলবো না। ২৯ নভেম্বর বছরের শেষের দিকে, এখনো দীর্ঘ দিবস-রজনী রয়েছে, অপার সমক্ষে। প্রতিদিন তোমার কণ্ঠে হই অবগাহিত, প্রতিদিন একবার করে জন্ম আর মৃত্যু। এবং তারপরও আমি তাকিয়ে থাকবো অনন্ত নভেম্বরের দিকে।

ডিয়ার অনন্যা অজানা

জানি না সুদূর অপেক্ষার পথ পাড়ি দিয়ে কেউ কখনো আসবে কি না? না এলেই বা ক্ষতি কি? অপেক্ষার পাল তুলে আমি বাইতে থাকবো সময়ের সাম্পান । না হয় ২৯ নভেম্বরের সঙ্গেই আমার প্রণয়ের শুরু । আর কেউ কি ইচ্ছা করলেই লুকিয়ে থাকতে পারে? যে সুন্দর সে সামনে আসবেই, নির্ঘুম গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো তো সুকণ্ঠী, কোনো অসুন্দর খুজে পাও কি না? জানো নাতো অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকে তার সৌন্দর্য, যা অন্ধকার কেটে গেলেই চোখে পড়ে অপূর্ব স্নিগ্ধতায়, কণ্ঠসুন্দরী, তুমি ভালো থেকো, খুউব ভালো, সুন্দর থেকো, খুউব সুন্দর, কামনা করি ভালোবাসার প্লাবন বয়ে যাক তোমার অবগুণ্ঠনের দুর্গ ভেদ করে ।

বি. দ্র.

সেই সুন্দর অপেক্ষার কঠিন কঠোর পথ পাড়ি দিয়ে আমার স্বপ্নবালিকা আমার লক্ষ্মী বউ হয়ে এসেছে ২৯ নভেম্বরের আগেই । এটি একটি ডেইলি ডায়েরি নোট ছিল । প্রেমিকা পাঠকদের উদ্দেশ্যে এতোটুকু প্রাইভেসি না হয় ভাঙলামইবা । আর ভালোবাসার বিজয় কেতন কেইবা না ওড়াতে চায়, না জানতে চায়, ভালোবেসে সবাই কি দুঃখ পায়, দুঃখ লিখে । সুখীও আছে লাখো কোটি । আমি তাদেরই একজন । আমরা ভালোবেসে জয় করেছি অপমান, দুঃখ জাগানিয়া প্রতিকূলতা, শত প্রতিবন্ধকতা । সেটা ছিল গত ২৩ জুলাই ২০০৪ ।

এবং ভালোবাসার আর এক দারুণ, মহা দারুণ উপহার আমার প্রিয়তমা বউ আমাকে দিয়েছে, ২৯ জুলাই ২০০৭, সেদিন আমাদের ফুটফুটে একটি কন্যাসন্তান পৃথিবীতে এসেছে ঘর আলো করে, তার নাম রেখেছি ফ্রেয়া ।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

সুখী মুহূর্ত

ফাহিম তখন স্টাফ কলেজের পড়াশোনা নিয়ে রাত-দিন ব্যস্ত । আর আমি দিন গুনছিলাম আমার দ্বিতীয় সন্তানের চাদমুখ দেখার জন্য । যেদিন ভ্যালেনটাইনস ডে, সেদিন আবার ফাহিমদের রাত পর্যন্ত ব্যস্ততা ছিল । ভাবীরা কেউ বলছিল তার হাজব্যান্ড ফোন করেছে । কেউ হাজব্যান্ডকে ফোন করে গিফট চেয়েছে । আমি ছিলাম নীরব । কারণটা তো প্রথমেই লিখলাম । ঘুমিয়ে গেলে দরজা খুলতে সমস্যা হবে

ভেবে জেগেই ছিলাম ওর জন্য । রাত প্রায় এগারোটায় ও এলো । ইউনিফর্ম পরা ফাহিম স্টাডি রুমে না ঢুকে আমার সামনে এসে একটা তাজা গাদা ফুল দিয়ে বললো, 'হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে' । আমার মনে হলো, সেই ভ্যালেনটাইনস ডের সবচেয়ে আনন্দময়, সুখী মুহূর্তটাই ছিল আমার ।

তৌফিকা আক্তার নিপু

কচুক্ষেত, ঢাকা

প্রতীক্ষা

হয়তোবা সে সব ভুলে গেছে । কিন্তু আমি তো এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না । পৃথিবীতে এমন কিছু সুখ আছে, যা কোনোদিন পাওয়া যায় না । আবার এমন কিছু দুঃখ আছে, যা কোনোদিন দূর হয় না । কার বেশি ভুল ছিল সে প্রশ্নটা না হয় থাক । শুধু এটুকু জেনে রেখো, এখনো অনেক রাত অনিদ্রায় কাটে । দূর আকাশের তারাদের সঙ্গে মিতালি হয় । চাদের দিকে তাকাই না, কারণ চাদকে আমি ভয় পাই । এখন জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র আমাকে আনন্দ দেয় । কালবৈশাখীর ঝড় আমাকে সঙ্গ দেয় । অমিত লাবণ্যের প্রেম আমায় উচ্ছ্বসিত করে । অচলার প্রেম মনে সন্দেহ জাগায় । তার পরও প্রতীক্ষা তুমি আবার আসবে ।

ফয়সাল মাহমুদ

লক্ষ্মীপুর

প্রকারভেদ

ফুজেল আহমদ

আসলে ভালোবাসাও এক প্রকার খেলা । এ খেলায় কেবল এক পক্ষকেই প্রতারিত হতে হয় । শোনা যায় ভালোবাসায় আছে নিকোটিন, আছে অ্যালকোহল । তাইতো মানুষ মরে মাতাল হয় । বলা হয়ে থাকে– কথায় ভাত, কথায় জাত, কথায় মাৎ, কথায় কাৎ আর ইদানীং বোধহয় যোগ হবে কথায় প্রেম, কথায় ভালোবাসা ।

বিজ্ঞাপনের ভাষায়, ‘কতো কথা বলেরে’ । আর বলবেই না কেন– একেকজনের পকেটে কতোটা যে সিম কার্ড তা এখন গণনার বিষয় । চ-ীদাস বলেছিলেন, প্রেম কর আত্মার সঙ্গে, দেহের সঙ্গে নয় । আর আজকাল প্রেম হয় মোবাইলের মাধ্যমে, এমনকি না দেখেই শুরু হয়ে যায় প্রেম-ভালোবাসা । আশা করি একাধিক সিম কার্ডধারীরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছেন । যাদের একাধিক সিম কার্ড নেই এবং ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেননি তারা যোগাযোগ করুন আপনার পাশের সেই বিখ্যাতজনের সঙ্গে । সফলতা নিশ্চিত । কারণ আমিও জেনেছি এ প্রক্রিয়ায় ।

ভেজাল প্রেমের ভিড়ে আসল প্রেমের সন্ধান লাভ এখন বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার মতোই এ কঠিন সাধনা আর অধ্যবসায়ের ফল । আর এরই মধ্যে আছেন অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা, যারা সব সময় নিজেদের সৎ হিসেবে দাবি করেন । তাদের জন্য রয়েছে কবি নির্মলেন্দুগুণের দেয়া বিশেষণ– ‘প্লেটোনিক লাভ’ যার অর্থ– সুযোগের অভাবে চরিত্রবান আর চরিত্রবতীদের মানসিক ক্রিয়া কা-ের ফসল ।

প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে বর্তমান সময়ে লিখে বোঝানো বেশ কষ্টকর । আগের দিনের মতো চিঠির আদান-প্রদান যেমন নেই বললেই চলে, তেমনি বর্তমান সময়ে ই-মেইলও প্রায় অচল । চালু আছে একটাই মাধ্যম– তাহলো মুঠোফোন । আর সুবিধার জন্য চালু আছে- পিক, অফ পিক, ফ্রি-টকটাইম, বোনাস টাইম আর একাধিক ঋ্ ঋ ।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের মনের গভীরে যে একাকীত্বের ভয় লুকিয়ে আছে তা থেকেই জন্ম নেয় প্রেম বা প্রেম-নির্ভরতা । যা নিয়ে চর্চা হয় তাই এক সময় প্রকাশিত আর প্রচারিত হয় । তেমনি ইন্টারনেটে প্রচারিত হচ্ছে দেখে তুলে দিলাম আপনাদের জন্য : পড়ুন আর ভাবুন । এগিয়ে যান যদি মন চায়–

মনোবিজ্ঞানী স্টার্নবার্গের ঞৎরধহমঁষধৎ ঞযবড়ৎু ড়ভ খড়াব-এর তিনটি কোনে প্যাশন-ঘনিষ্ঠতা এবং দায়বদ্ধতার অবস্থান । এগুলোর কম্বিনেশনে জন্ম নেয় নানা রকম ভালোবাসা ।

পছন্দ– যেখানে ঘনিষ্ঠতা বা ওহঃরসধপু থাকে কিন্তু কোনো মোহগ্রস্ততা কিংবা প্যাশন ও কমিটমেন্ট থাকে না । অর্থাৎ বন্ধুত্ব ।

মোহময় প্রেম– যেখানে প্যাশন থাকে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কিংবা দায়বদ্ধতা থাকে না । প্রেমের পরিভাষায় একে বলা হয় চধঢ়ঢ়ু খড়াব ।

রোমান্টিক ভালোবাসা– যেখানে প্যাশন এবং ঘনিষ্ঠতা থাকে কিন্তু কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। যেমন পরকীয়া।

কমপ্যাশনেট ভালোবাসা– যেখানে ঘনিষ্ঠতা এবং দায়বদ্ধতা থাকে কিন্তু প্যাশন থাকে না। যেমন বেশির ভাগ দীর্ঘ সুখী দাম্পত্য জীবন।

শূন্য প্রেম– যেখানে শুধু কমিটমেন্ট বা দায়বদ্ধতা থাকে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ও প্যাশন থাকে না। যেমন ঝুলন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক।

ফেচুয়াস প্রেম– যেখানে প্যাশন এবং কমিটমেন্ট থাকে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা থাকে না। যেমন প্রথম দর্শনে প্রেম।

কনজিউমেট ভালোবাসা– যেখানে ঘনিষ্ঠতা, কমিটমেন্ট, দায়বদ্ধতা ও প্যাশন সহাবস্থান করে। খুব কম সৌভাগ্যবান ও সোভাগ্যবতী এ প্রেমের অভিজ্ঞতা আস্বাদন করেন।

রাজনীতিতে যেমন শেষ কথা বলে কিছু নেই, তেমনি প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রেও বোধহয় কথাটা অনেকাংশে সত্যি। তা না হলে ছ্যাকা খাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকরা সাইকিলিকভাবে কেন বারবার প্রেমে পড়বে। জানি না প্রেম নামের এ গর্তে পড়া কবে নাগাদ বন্ধ হবে।

প্রেম-ভালোবাসার এ দিবসে বলছি, যারা এখন পর্যন্ত প্রেমে পড়েননি বা পড়তে পারেননি তারা হতাশ হবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন, কারণ পরাজয় মানেই সমাপ্তি নয়– যাত্রাটুকু একটু দীর্ঘ হওয়া মাত্র।

বিয়ানীবাজার, সিলেট থেকে

অস্বাভাবিক

আজাদি প্রধান

প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার এক ভাগ্নি ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। নাম তার রূপা। দূর থেকে তাকে দেখে আমার ভালো লেগে যায়। এই ভালোলাগা কখন যে ভালোবাসায় পরিণত হয় আমরা দুজনের কেউ বুঝতে পারিনি।

পরিচয় সূত্রে সে আমাকে মামা সম্বোধন করতে থাকে। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি সে এবার এসএসসি দেবে তার শরীরের ভাষা আমাকে কি যেন শেখাতে চায় আর আমিও যেন ওর শরীরের বর্ণমালা শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠি। কথার ছলনায় আমি ওর গাল টিপে দিই। সেই রূপা ইচ্ছা অনিচ্ছার দোটানায় দুলতে থাকে। সম্ভবত আমার স্পর্শ তার শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করে। আমি প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক, আমার স্পর্শ দিয়ে আমার ট্রান্সফরমার থেকে ২২০ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ তার শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটাই।

এক পর্যায়ে তাকে আদরের ছলনায় তার ঠোটের ভাজে আমার ঠোট লুকাই। রূপা লজ্জাবতীর মতো চুপসে যায় এবং বলে মামা এসব কি?

আমি বলি তোমাকে দূর থেকে দেখেছি, এখন কাছ থেকে দেখতে চাই। এভাবেই আমার ভালোলাগার রূপান্তর ঘটছে ক্রমশ। তারপর প্রায়ই সে মামা বলে কাছে আসতে চায় আর আমিও তাকে কাছে পেতে যেন আগ্রহী হয়ে উঠি। রূপার শরীরের প্রতিটি ভাজ আমাকে ইশারায় ডাকে। আমি সাড়া না দিয়ে পারি না।

হয়তো আমার প্রথম গাল টিপে দেয়া, আলতো জড়িয়ে ধরা, হালকা চুমো ওকে পদ্মার রূপালি ইলিশে পরিণত করে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা জাগে ইলিশের স্বাদ নেয়ার। এভাবে আমার চাহনি, কথা বলা, কাছে ডাকা ওকে দুর্বল করে দেয়। আর ও এক অদ্ভুত আকর্ষণে নিজেকে সমর্পণ করে আমার কাছে।

একদিন রাত ১১টায় ও আমার দরজায় নক করে। খুলে দেখি পরীর মতো দাড়িয়ে আছে। ওর চোখে আমি এক অদ্ভুত ভাষা দেখতে পাই। আমি বিবেক বর্জিত হয়ে জড়িয়ে ধরি। হঠাৎ ও নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং স্তম্ভিত হয়ে যায়। একি হলো আমাদের মাঝে।

আমি পরক্ষণেই ক্ষমা চেয়ে ওকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করি ও ফিরে যায় বাসায়। আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। অনুতপ্ত আমি অনুশোচনায়। তারপর ফিরে আসি বাস্তব জীবনে, এসব কামনা আর নয়। সিদ্ধান্ত নিলাম ও ডাকলেও যাব না।

কিন্তু পরদিন দুপুরে ও বাসায় আসে, আমি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি, বারবার মামা ডেকে আমাকে অস্থির করে তোলে। এক পর্যায়ে আমি ব্যর্থ হই আমার মনের কাছে। এবার ওকে টান দিয়ে দাড় করিয়ে জড়িয়ে ধরি, অদ্ভুতভাবে ও আমাকেও জড়িয়ে ধরে ফণা ধরা সাপের মতো।

গ্রামের বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগের রাতে ও স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, মামা আমাকে শেষবারের মতো হাতে চুমো দিয়ে দিন।

ওই চুমোটিই ছিল ওর প্রতি আমার শেষ ভালোবাসার নিদর্শন। তবে যাওয়ার দিন সকালে ও বলেছিল, মামা আপনাকে ছাড়া আমার বাচতে খুব কষ্ট হবে।

রূপার চোখ তখন ছলছল করছিল। আমি তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসি রূপা। যতদিন বেচে থাকবো তোমার স্মৃতি কখনো ভুলব না। দুঃসম্পর্কের মামা হয়েও আমি আর রূপা এক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, সামঞ্জস্যহীন প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যাই।

মিরপুর ঢাকা থেকে

হারজিত

হাসান তারিক

১.

গল্পের শুরু অনেকটা ‘এক দেশে এক রাজা ছিল’ গল্পের মতো হঠাৎ করেই শুরু। হঠাৎ করেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। বাংলা সিনেমার মতো দুজনে ধাক্কা খেয়ে নয়, নয় নাটকের হঠাৎ দেখা এমন কোনো দৃশ্যের মাধ্যমে কিংবা এক গোছা রক্ত লাল গোলাপ হাতে দুরু দুরু হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশেও নয়।

সত্যি হলো, তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কখনোই। কেবল দুজনে দুই প্রান্তে থেকে সমান্তরালে অবিরাম স্বপ্ন বুনে গেছি, ভালোবাসার চাষ করে গেছি দক্ষ কৃষাণ-কৃষাণীর মতো। তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ই-মেইলে। মেয়েটি সে, ছেলেটি এই আমি।

২.

একটি জাতীয় সাপ্তাহিকে একটি ছোট গল্প ছাপা হয়েছিল, লেখার নিচে ছোট্ট করে ই-মেইল আইডি। অতঃপর, সপ্তাহ না পেরুতেই কিছু ই-মেইল। গতানুগতিক প্রশংসা, শুভেচ্ছা, শুভ কামনার শুকনো বন্যায় আমার মন তেতো-বিরক্ত।

তারপর এলো আরো একটি ছোট ই-মেইল। কিন্তু আমি অভিভূত হলাম, ইংরেজি অক্ষরে বাংলা মেইলের অপূর্ব চমৎকার শব্দের গাথুনি আর পরিমিত সৌজন্যবোধে। তাই কোনো দ্বিধা না করেই বাটন টিপে পাঠিয়ে দিলাম শুভেচ্ছার ফিরতি ই-পত্রটি।

৩.

কয়েক দিন পর। আরো কয়েকটি নতুন ই-মেইল এসেছে এবং আমাকে আরো একটু অবাক করে দিয়ে তার আরেকটি ফিরতি ই-মেইল। তাতে লেখা–

স্বপ্নহারা, আমি কি আপনার বন্ধু হতে পারি না? –স্বপ্নবতী

স্বপ্নবতী মেয়েটিকে স্বপ্নহারা আমি শুনিয়ে দেই রূঢ় বাস্তবতার কথা।

তবু সে নাছোড়বান্দা।

তার মিষ্টি শাসনে পরাজিত হয়ে আমি স্বপ্ন দেখতে শিখি একটু একটু করে। দুই হাত তুলে তাই স্বপ্নের জল পান করি। অতঃপর স্বপ্নকে সঙ্গী করে ভালোবাসার নৌকা ভাসাই।

৪.

ভালোবাসা কি বয়স মানে কিংবা দূরত্ব হিসাব করে চলে? স্বপ্ন কি বাধা হয়ে থাকতে পারে কোনো বাস্তবতা আর দুঃস্বপ্নের কাছে? উত্তরটা আমার জানা নেই। শুধু জানি, ভালোবাসার স্পর্শে দুঃস্বপ্নেরা পালিয়ে যায়। ঢাকা-চট্টগ্রামের আড়াইশ কিলোমিটার দূরত্ব কমে একীভূত

হয়ে যায় একটি বিন্দুতে আর বাইশ বছরের তরুণ এবং ছাব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ নারীও অবুঝ হয়ে মেতে উঠতে পারে অর্থহীন ভালোবাসায়।

অথচ কখনো দেখা হয়নি, চোখের তারায় চোখ রাখা হয়নি, রেস্টুরেন্টে বসে গরম চা চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে ভালোবাসার উষ্ণতা ঠোট দিয়ে প্রকাশও করা হয়নি– গভীর ভালোবাসায়।

কেবল ই-মেইলের ইলেকট্রনিক ভাষায় রচিত হয় ভালোবাসার নতুন পঙ্‌ক্তি কিংবা দুজনার স্বপ্নবাসর।

তবুও ভালোবাসার লাইন চলে গেছে হৃদয় দিয়ে, ট্রেনের মতো গগনবিদারী চিৎকার করে নয়, জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর বাজিয়ে।

৫.

প্রতিদিন ই-মেইল করি। কোনো কারণে তার মেইল না এলে বুকের ভেতর কেমন

অস্থির হয়ে ওঠে, অনেকটা নেশাগ্রস্ত যুবকের মতো।

এক দিন হঠাৎ করেই তার ই-মেইল বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক দিন পার হলো, এরপর সপ্তাহ, তারপর মাস। আমি ততোদিনে ভালোবাসার দহনে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছি, প্রতিনিয়ত।

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবসের আনন্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত। কেবল আমার বুকের ভেতর গুমোট অভিমান, থোকা থোকা কষ্টের সারি।

মোবাইল বেজে ওঠে মিষ্টি আওয়াজ তুলে। অপরিচিত নাম্বার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভ করি। বিরক্তিমাখা কণ্ঠে আমার সম্ভাষণ। হ্যালো ...।

ওপাশ থেকে অচেনা মানবীর মায়াবী কণ্ঠ– সুমু বলছেন...?

জ্বি। আমার ছোট্ট জবাব।

খনিকক্ষণ নীরবতা। অতঃপর,

আমি অর্পিতা। খনিকটা দ্বিধান্বিত জবাব তার।

নামটি শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। কেমন যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসে আমার। অতঃপর গভীর উচ্ছ্বাস আর আবেগে জিজ্ঞাসা করি– তুমি, এতোদিন পর, মেইল করনি কেন?

সে আমার প্রশ্নের জবাব দেয় না। কেবল অস্ফুট কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, আমাকে ভুলে যেও সুমু... ।

ভুলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে যাই। আমি ঘটনার আকস্মিকতায়। সে-ই জানিয়ে দেয় কারণের জবাব।

আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করো সুমু।

শেষের কথায় কণ্ঠটি ধরে আসে তার। ফোনের ওপাশ থেকে আমি অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শুনতে পাই। আমি চুপচাপ, নীরবে ফোনের লাইনটি কেটে দিই। কারণ আমার চোখের কোণেও ততোক্ষণে বৃষ্টি জমেছে।

আমি পরক্ষণেই উপলব্ধি করি, বিজয়ের এ আনন্দময় দিনে আমার নতুন দেখা স্বপ্নগুলো যেন পরাজিত হয়েছে একাত্তরের পরাজিত বাহিনীর মতো, পরাজিত হয়েছে সমাজের গতানুগতিক নিয়মের কাছে।

কেবল ভালোবাসারই পরাজয় হয়নি, জয় হয়েছে সত্যিকারভাবেই। চোখের জলের সাক্ষ্য তো আর মিথ্যা হতে পারে না... ।

আমি তাই আজো চোখের জল দিয়ে হৃদয়ের ভালোবাসাগুলোর যত্ন নিয়ে চলছি।

ক্যান্টনমেন্ট, চট্টগ্রাম থেকে

hasantarique20@yahoo.com

আজি বসন্তের নীলে

আমি তাকে বলেছিলাম, 'মিআ কেমাতো সিবালোভা'। আনাড়ি হাতে তোলা তার কিছু ছবি দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমার একটি মাত্র ছবি চাওয়ায় তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। কারণ আমরা ভালোভাবেই জানতাম, আমাদের মধ্যে কখনোই মিল হবে না। আমাদের সম্পর্কটা সমান্তরাল রেল লাইনের মতো। যাদের কোনো মিলন নেই, বিরহ নেই। শুধু পথচলা। তবে কেন হারালো? কেন আজো তার কান্নার ঝংকার শোনা যায়।

seventeen.seven@yahoo.com

৫৩ মিনিটের ফল ০

দি...

এই ভালোবাসা দিবসে তোমাকে আমার মনের গভীর থেকে অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিলাম। ভালো থেকো, সুখে থেকো অনাবিল আনন্দে। তোমার সুখী জীবন কামনায় শেষ করছি।

এ বি সি

হাকির মোড়, বগুড়া

প্রাণপ্রিয়

আজ ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে হৃদয়ে সুপ্ত থাকা সহস্র ভালোবাসার অভিনন্দন। জানাই আমার প্রত্যক্ষ প্রহর গণ্য প্রাণপ্রিয় বন্ধু রেজাউল করিমকে।

বন্ধু, ভালো থেকো, যে ভালোর কোনো শেষ নেই। সুখে থেকো, যে সুখের কোনো সীমানা নেই।

মোজাম্মেল হক

বেলকুচি সিরাজগঞ্জ

অনু

আমাদের সামনে সোনালি সময়

কাছাকাছি থেকো। মনে রেখো

রংধনু পেতে হলে বৃষ্টিতে ভেজার

কষ্টকে পেছনে ফেলে আসতে হয়।

তোমার জন্য ভালোবাসা।

জানি না কবে তোমায় ভালোবাসায়

ভরিয়ে তুলতে পারবো!

ওয়ালিদ

বানরগাতি, খুলনা

নীলাকে

তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছা হয়।

মাহমুদ

মিরপুর, ঢাকা

সায়েন্স

নিশাত নূর

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস। বাশেদ তখন ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষের ছাত্র। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পরিবার মোটামুটি সচ্ছল হলেও কৃষিনির্ভর বিধায় কৃষক বাবাকে ছেলের পড়ালেখার খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হয়। তাই ইউনিভার্সিটির অন্য অনেক ছাত্রের মতো বাশেদকেও দু-একটা টিউশনি করতে হয়।

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে জনা নামে তার অষ্টম শ্রেণীপড়ুয়া এক ছাত্রী ছিল। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। আগামী বছর নবম শ্রেণীতে জনা সায়েন্স গ্রুপ নিয়ে পড়বে। সুতরাং বাশেদকে এ টিউশনিটা হারাতে হচ্ছে, কারণ তার ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টস। বাশেদের এ টিউশনিটার বয়স মাত্র ছয় মাস। টিউশনির বয়স মাত্র ছয় মাস হলেও এ অল্প সময়ের মধ্যেই তার মনের অ্যালবামে জমা পড়েছে অসংখ্য সুখ-স্মৃতি। জনা পড়াশোনায় ভালো হলেও প্রাইভেট পড়ার সময় তার একটা অন্য রকম বাতিক ছিল আর তা হলো টিচারের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানো। প্রথম দিকে বাশেদের কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও কিছুদিন পর কান-সওয়া হয়ে যায়। আর তাছাড়া গল্পে সায় না দিলে কোনো কোনো সময় টিউশনি হারানোর রিস্কও থাকে বৈকি।

বয়সের তুলনায় জনা বোধ হয় একটু বেশিই পাকা ছিল। তার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বলিউড হলেও বাকি জগতের কোনো কিছুই বাদ পড়তো না। আর বাশেদের চৌদ্দ গোষ্ঠীর খবর তো সে প্রথম তিন দিনের মধ্যেই জেনে নিয়েছিল। জনা বাশেদের সঙ্গে এমন অধিকার নিয়ে কথা বলতো, যেন সে বাশেদের আপনেরও আপন কেউ!

বাশেদের নিয়মিত দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস ছিল। সে জনাকে পড়াতো সন্ধ্যায়। কোনো দিন দুপুরে কোনো কারণে বাশেদের ঘুম না হলে জনা কিভাবে যেন তা টের পেয়ে যেত।

স্যার, নিশ্চয় আজকে দুপুরে আপনি ঘুমোননি। বাশেদ দুপুরে কেন ঘুমোয়নি, সে জন্য জনার কাছে তাকে

কৈফিয়ৎ দিতে হতো। একদিন বাশেদকে সে জিজ্ঞাসা করে বসে, স্যার আপনি নিজেই তো ছাত্র মানুষ, তো আবার প্রাইভেট পড়ান কেন?

জবাবে বাশেদ অনেক কথা বলে। এই যেমন, প্রাকটিসটা ধরে রাখা যাতে ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষায় অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথাটি মুখে না বললেও সুচতুর জনার বুঝে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, ইনকামের ব্যাপারটাই মুখ্য।

জনার চার ভাই-বোন। বোনের মধ্যে সে একাই। পরিবারের সবার কাছেই জনা অত্যন্ত আদুরে। বাবা ব্যবসায়ী। সংসারও সচ্ছল। তাই অভাব তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। আর সে কারণে বাশেদের সংসারের খুটিনাটি জেনে জনা ভীষণভাবে ব্যথিত হয়। জনা এও জানে যে, মাসের শেষের দিকে বাশেদের হাতে একদম টাকা থাকে না, ধার করে চলতে হয়।

অথচ তার মা প্রাইভেট টিউটরদের বেতন দেন ছয়/সাত তারিখে। বাশেদের হাতের অবস্থা জানার পর থেকে জনা মা'য়ের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে মাসের এক/দুই তারিখের মধ্যেই বাশেদের পকেটে পৌছে দেয় বেতনটা। আজ জনার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার দিন বাশেদের। অনেক কথা মনে পড়ে তার। মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কী? নিজের ওপর খুব রাগ হয় তার, 'কেন যে তখন সায়েন্সটা পড়লাম না!'

জনার মনটা আজ বড় চঞ্চল। টিচার এসে বসে আছে প্রায় পনের মিনিট। এখনো সে পড়ার টেবিলে যায়নি। আজ টিচারের বিদায়ের পালা। শেষ দিনে টিচারের সঙ্গে কী কী গল্প করা যায় সে হোমওয়ার্কটা সেরে নিতেই একটু দেরি হচ্ছে বোধ হয়। নিজের হাতেই ট্রেতে করে নাশতা নিয়ে হাজির হলো জনা। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। জনাই শুরু করলো প্রথম।

নাশতাটা খেয়ে নিন স্যার। ইসলাম শিক্ষার আর কী পড়ব স্যার!

তাই...

স্যার আপনার কি মন খারাপ?

কই না তো!

আমি জানি স্যার।

কি জানো?

স্যার, মেয়েরা সাবালক হয় কতো বছর বয়সে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন করছো যে!

আহা বলেন না স্যার।

এ দেশের আইনে ছেলেমেয়ে সবারই সাবালক হওয়ার বয়স আঠার বছর। কিন্তু তুমি তো চৌদ্দ বছর বয়সেই পুরোপুরি সাবালিকা হয়ে গেছো বলে আমার মনে হয়।

ঠাট্টা করছেন স্যার?

কেন তোমার নিজের বিশ্বাস হয় না?

হয় স্যার। কিন্তু আইনের চোখে তো এখনো চার বছর বাকি।

তা হঠাৎ আজকে তোমার এ রকম সাবালিকা হওয়ার ইচ্ছা হলো কেন বলো তো!

আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি স্যার, ব্যাংকে আমার নামে অনেক টাকা আছে। আমি সাবালিকা হলে তখন সব টাকা তো আমার নিজের হয়ে যাবে। আমি ইচ্ছামতো যা খুশি করতে পারবো।

ও বুঝেছি! ইচ্ছামতো টাকা ওড়ানোর জন্যই বুঝি তাড়াতাড়ি সাবালিকা হতে চাইছো।

আপনি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝছেন স্যার। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার যখন আঠারো বছর বয়স হবে তখন আমার সব টাকা আপনাকে দিয়ে দেব।

সব টাকাই দিয়ে দেবে!

হ্যা স্যার। কারণ আমাদের তো আরো অনেক টাকা আছে।

কিন্তু তোমার টাকা আমি নিতে যাব কেন?

কেন স্যার? আপনার সঙ্গে তো আমার সেরকম কথাই ছিল। আপনি কি ভুলে গেছেন স্যার? বাশেদ মনে মনে বলে, 'এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লামরে ভাই!'

কিছু বলছেন না যে স্যার।

ওহ সরি! এক্সট্রিমলি সরি!! আমি আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম।

স্যার, ২০০৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আমার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হবে। আর সেদিন থেকেই আমি পুরোপুরি সাবালিকা হবো। সেদিন সারাদিন আপনার সঙ্গে আমি ঘুরবো। চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খাব, সিনেমাও দেখবো হলে।

অ্যা...

আপনি কোনো চিন্তা করবেন না স্যার, খরচ সব আমার।

আচ্ছা ঠিক আছে। এবার তাহলে আসি। ভালো থেকো।

আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি না স্যার। আপনার তো আবার সবকিছু ভুলে যাওয়ার অভ্যাস। তবে এটা ভুললে কিন্তু চলবে না স্যার। আগেই বলে রাখছি ২০০৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল ঠিক ১০টার সময় মৌচাক মার্কেটের ওভারব্রিজের ওপরে আমি দাড়িয়ে থাকব। আবারো বলছি, মনে থাকে যেন...

আজ ২০০৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। নির্দিষ্ট ক্ষণে ও স্থানে বাশেদ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দুপুর

গড়িয়ে বিকেল হয়। জনা আসে না। ওভারব্রিজ থেকে নামার সময় জনার ছোট ভাই তপুর সঙ্গে দেখা হয় বাশেদের। জনা এখন বরের সঙ্গে সউদি আরবে। বর ইঞ্জিনিয়ার। বাশেদ শেষবারের মতো আক্ষেপ করে বলে, ‘কেন যে সায়েন্সটা পড়লাম না!’

রাজা বাহাদুর সড়ক, বরিশাল থেকে

মেঘলা পরী

আকাশ ছুতে পারবো না জানি, পারবো না মেঘের কাছাকাছি যেতে, তবু প্রতি রাতে ঘোরলাগা স্বপ্নের কাছে নিজেকে সপে দিতে দিতে একজন মেঘলা পরীর স্পর্শ আমাকে জাগিয়ে রাখে– অনন্ত থেকে অনন্তকাল।

স্বপ্ন নয় বাস্তবে এসো, এই অনন্য চৈতালি ভালোবাসায়। ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য পাঠিয়ে দিলাম থোকায় থোকায় ‘ঘাসফুল’।

কাছের মানুষ

jolojz2007@yahoo.com

খুলনা

উচিত

মানুষকে তার বর্তমান নিয়ে বাচা উচিত

সুখে থাকা উচিত

আর সুখ মানে সবকিছু পাওয়া নয়।

ইকবাল

পতেঙ্গা

অসম ভুল

স. অ. নীলোৎপল অপু

শুক্লাদি বিদেশ চলে যাচ্ছে শুনেই যেন আমার মাথায় হঠাৎ বাজ পড়লো। কথাটার সত্যতা যাচাই করতে প্রাণপণে ছুটলাম। যখন শুক্লাদির শ্বশুর বাড়িতে পৌছলাম তখন অস্থির সন্ধ্যা। অথচ শুক্লাদি তখন অত্যন্ত ঠা-া মস্তিষ্কে হাস-মুরগি ঘরে তুলছেন। বৃদ্ধা শূচিবায়ুগ্রস্তা শ্বাশুড়ির গা ধোয়ার জন্য স্নান ঘরে তুলে দিচ্ছেন বালতি ভর্তি কুসুম-কুসুম গরম জল। একথা-সেকথার পরই মওকা বুঝে আসল প্রসঙ্গে ফিরলাম। হুট করেই বলে বসলাম, তুমি নাকি একেবারে বিদেশ চলে যাচ্ছো?

শুক্লাদি মন কেমন করা ভাব গলায় এনে বললো, যাচ্ছিই তো, দেশে আমার আপন কেইবা আছে? বিদেশ থেকে তোর দাদা আমাকে তার কাছে চলে যাওয়ার জন্য খবর পাঠিয়েছে। সেখানে ওর খাওয়া-দাওয়ায় খুব সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া তুই তো ভালোই জানিস... সে কোনো দিন হাতের কাছের কলসি থেকে এক গ্লাস জলও ঢেলে খায়নি।

বললাম, না শুক্লাদি, এ দেশ ছেড়ে তুমি কক্ষণো যেও না। আমার মাথার শপথ লাগে, তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে... সত্যি-সত্যিই কষ্ট হবে। তুমি কি চাও, তোমার জন্য আমি সারা জীবন কষ্ট পাই? আমি তোমাকে পছন্দ করি, বলো সেটাও কি আমার অপরাধ? যদি আমার পছন্দ-অপছন্দের কোনো মূল্যই তোমার কাছে না থাকে... তাহলে দেখে নিও, তোমার বিদেশ যাওয়ার আগেই আমি চারপাশের সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে একদিন দূরে পালিয়ে যাবো। কোথায়, কোন দিকে যাবো, কারো কাছেই ঘুণাক্ষরেও বলে যাবো না। এ কথা বলেই মুখ কালো করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। শুক্লাদি আমাকে তার বুকের দিকে জোর করে টেনে নিয়ে বললো, কেন আমাকে কষ্ট দিতে চাস? তুই এমন করলে যে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাবো না। তার চেয়ে আমি কি বলতে চাই তা তুই মনোযোগ দিয়ে শোন... আমি চলে যাই কারণ আমাকে যেতেই হবে। পাসপোর্ট থেকে শুরু করে মেডিকাল চেকআপ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ভাবেই শেষ হয়ে গেছে। এখন ভিসা পেলেই কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্লাইট কনফার্ম করবো। তোর শুক্লাদি তো আর এ লোক দেখানো সমাজ-সংসারের উর্ধ্বে নয়। তাই এ পৃথিবীতে বেচে থাকতে হলে অনেক কিছুই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও মুখ বুজে মেনে নিতে হয়... সহ্য করতে হয়।

বড্ড কষ্ট সেই সব যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করা । বড় হলে তুই সব কিছুই ভালো করে বুঝতে পারবি । তুই এখানে থেকে ভালো করে পড়াশোনা করে বড় হওয়ার চেষ্টা কর । আমি চলে যাওয়ার পর তোর সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বড়-বড় চিঠিতে লিখে জানাস । আমি রাত জেগে-জেগে সেসব চিঠির সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হবো । বিপরীতে তোকেও আমার তৎকালীন অনুভূতির কথা জানাবো । তারপর তুই বড় হওয়ার পর ইচ্ছা হলে আমার কাছে চলে আসবি, নয়তো আমার চেয়েও সুন্দর লাল টুকটুকে একটি মেয়ে দেখে আমাকে জানাবি । আমি দেশে এসে মহা ধুমধামে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করবো ।

শুক্লাদির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, আমি সুন্দর-অসুন্দর বুঝি না... শুধু তোমাকে বুঝি । তাছাড়া আমি নিশ্চিত জানি, তোমার চেয়ে বেশি সুন্দর মানুষ আমার চোখে আর কোনো দিন দেখা হবে না । শুক্লাদি, তোমাকে হারিয়ে কক্ষণো কোনো দিন আমি বড় কিছু হতে চাই না কিংবা তোমার চেয়ে বেশি সুন্দর কাউকে বিয়ে করতেও চাই না । তুমি তোমার জায়গাতেই থাকো... প্লিজ! শুক্লাদি, এখান থেকে তুমি যেও না আমাকে এভাবে একা ফেলে ।

তবুও শুক্লাদির মুখাবয়বে দূর যাত্রার নিশ্চিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তার পায়ে আমার মাথা ঠেকিয়ে কাদতে থাকি । কিন্তু এ কান্নায় কি শুক্লাদির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে?

শঙ্খনীল, কুমিল্লা থেকে

এ ব্রিফ হিস্ট্রি

নাজমুল হক

জীবনে প্রথম যাকে প্রেমপত্র লিখেছিলাম সে আজ আমার বউ । ভাবছেন মিথ্যা বললাম অথবা প্রথম প্রেমপত্র লিখেছিলাম বিয়ের পর । না প্রেম পত্র লিখেছিলাম যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি । টেক্সট বইয়ের মাঝে প্রেমপত্র লুকিয়ে তাকে বলেছিলাম আমি চলে যাওয়ার পর পড়বে । সেই থেকে শুরু হলো শেষ হয়েও হলো না শেষ প্রেমকাহিনী ।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চলেছে মানসিক প্রেম । এর বৈশিষ্ট্য হলো প্রেমিক-প্রেমিকা শুধু মনে মনে একে অপরকে ভালোবাসবে, সামনাসামনি সাক্ষাৎ হবে না । মন বলবে কবে হবে দেখা কিন্তু দেখা আর হবে না । এ সময় প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার আকুল আবেদন জানিয়ে তিনটি প্রেমপত্র লিখেছিলাম, যা ফাস হয়ে যাওয়ার ভয়ে পোস্ট করা হয়নি এবং আজো আমার ড্রয়ারে সংরক্ষিত আছে ।

চোখে চোখ আর হাতে হাত রেখে সারাদিন কাটিয়ে দেয়ার প্রেম শুরু হয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, বা.কৃ.বি থেকে। ক্লাস ফাকি দিয়ে প্রেম করা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সময় বাধ্য হয়েই মিথ্যা বলতে হয়। বাড়ি থেকে কেউ ফোন করলো– কি রে তুই কোথায়? বলতাম রুমে বসে বসে ক্লাসের পড়া মুখস্থ করছি। আসলে তখন আমি প্রেমিকার বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে যুগল জীবনের স্বপ্ননামা পড়তাম।

রোমান্টিক প্রেম পর্যায়ে যেহেতু প্রেমের স্বাদ চেখে দেখা হয়, তার গন্ধ এতই মধুর যে অতি শিগগিরই গার্জিয়ানদের নাকে পৌছে যায়, তাই অচিরেই শুরু হয় বিচার কার্য। প্রথমত ঘরোয়া বিচার। বাদী পক্ষে অসংখ্য লোক কিন্তু আসামি একা। বিধিবাম। কানে ধরে ওঠ-বস করে বললাম আর ঘুরব না। কিন্তু পরদিনই আবার ঘুরেছি। এভাবে কয়েক দফায় বিচার চলার পর বাস্তব ফল না পেয়ে বিচারক আদালত মুলতবি ঘোষণা করে দিলেন। শুরু হলো অন্য আদালতের বিচার, আসামি একজন নয়, দুজন, বিচারক বাবা নন কাজী। এক লাখ এক টাকা দেনমোহরানায় বিয়ে সম্পন্ন হয়। শুরু হয় আরেক নতুন জীবন, নতুন পথচলা।

এই পর্যায়ের আরেক নাম টক-ঝাল-মিষ্টি প্রেম পর্যায়। আদর-ভালোবাসা, রাগ-অভিমান, ঝগড়া-ঝাটি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে পোস্ট ম্যারেজ লাভ খুব সুখময় হয়নি। বিয়ে হওয়ার এক সপ্তাহ পর চলে যেতে হয়েছে আমেরিকায়। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল লাভ হাউস-এর তালা। তাকে বিমুক্ত করতেই ৮ মাস পর দেশে ফিরে আসি। লাভ হাউস ঠিকই ছিল কিন্তু রাজকন্যা ঠিক নেই। আগে কানে কানে বলতো আমি তোমায় ভালোবাসি এখন মাইক বাজিয়ে উচ্চস্বরে বলে আমি ডায়ামন্ডের রিং ভালোবাসি, সোনার নেকলেস ভালোবাসি। আগে মাঝে মধ্যে কিস খেতো এখন শুধু ফিসফিস করে। তার ফিসফিসানি শুনতে শুনতে ফুসফুসের বাতাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না মন ভরবে না– আমেরিকানরা তাই ভালোবাসায় উদার। তারা এক সঙ্গে কয়েকজনকে ভালোবাসে। মনে মন না মিললেও সমস্যা নেই। পুরাতনকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ কর নীতিতে চলে তারা। একদিন নয় সারা জীবন ধরে চলতে থাকে খোজাখুজির ধারা। শেষ জীবনে তারা বড় একা।

টাইটানিকের প্রেম কাহিনী বা শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েটের প্রেমকাহিনী কিন্তু আমেরিকারই সৃষ্টি। সুতরাং প্রেম নেই বলা যাবে না। বিভিন্ন উৎসব। যখন ভ্যালেন্টাইনস ডে, থ্যাংকসগিভিং ডে, ক্রিসমাস ডে-র মতো অনেক দিবস আছে যেগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিশেষ কিছু উপহার দেয়া হয়। আমেরিকান স্টোরগুলো গিফট সামগ্রীতে ভরা। বেশির ভাগই ভালোবাসার উপহার। ভালোবাসার জন্য নির্জন স্থান দরকার নেই, ভালোবাসা করতে পারো যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে। রাস্তার দুই পাশে চুম্বনরত যুগলদের দেখলে মনে হয় ভালোবাসার শুরু এখানেই যার বিস্তার ঘটেছে গোটা বিশ্বে।

গাবতলী, বগুড়া থেকে

nazmul_haque123@yahoo.com

পরিচিতা

পারভেজ

তুমি কি জানো আমরা প্রকৃতির কাছে খুবই অসহায় । প্রকৃতি আমাদের মাঝে অনেক ভালোবাসা দেয় । কিন্তু এই ভালোবাসা প্রকৃত মানব-মানবী সহজভাবে দেয় না । এর জন্য আমাদের সাধনা করতে হয় । সাধনার যদি যথাযথ ধ্যান করতে পারি তবেই প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ।

আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হই । এর কারণ কি বলতে পারবে? যৌবনের ধর্মই-প্রেম, এই প্রেমের জন্য প্রেয়সী খোজা কিন্তু অন্যায় নয় । তারপরও আমরা তথা আমি কেন বিভ্রান্ত বলতে পারবে?

ইন্টারনেট বা মোবাইলে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব নামে সস্তা মজা এবং পরস্পরকে ধোকা দিয়ে আনন্দ পেতে চাই আমরা সবাই, কিন্তু বন্ধুত্বের চিরন্তন মহান আদর্শে বিশ্বাসী আমি । যারা মনে করে স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত হওয়া উচিত বিশ্বাস, সত্যবাদিতা ও পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা । আমি সেই বান্ধবীর প্রতিক্ষায় প্রতীক্ষিত । নিজের প্রয়োজন ও চাহিদামতো একজন বান্ধবী পাওয়ার তৃষ্ণা আমার কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে আসার পর প্রবল হয়েছিল ।

আমার আশপাশে বা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে তেমন বান্ধবী পাইনি তাই তো মোবাইলকে ব্যবহার করলাম কাঙ্ক্ষিত মানসী খোজার । যদিও এটি অনেক দুঃসাধ্য ব্যাপার । অবশেষে আমাকে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতে হলো, এসব করে নবীন যৌবনে যে শিহরণ জাগতো, যে ধরনের কল্পনা মনকে চাঙ্গা করতো তা অবসান ঘটার পথেই তুমি এলে, আমি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম ।

আমি কেন শিহরিত হয়েছি জানো? সম্পর্কের শুরুতে আমরা শপথ করেছি প্রশ্নের জবাবে সত্যি কথা বলবো । মিথ্যার আশ্বাস নিয়ে যা নয় তা-ই সেজে একে অন্যের কৌতূহল মেটাবো না । পরস্পরকে প্রভাবিত করবো না মিথ্যা ইমেজ দিয়ে । কারণ আমি বিশ্বাস করি বন্ধুত্ব এমন স্বর্গীয় সম্পর্ক স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে যাকে রক্ষা করতে পারলেই মিলবে প্রকৃত সুখ । এ খাটি সম্পর্কের মাঝে মিথ্যাচার আনা মানেই খাটি দুধে প্রতারণার চনা মেশানো । অবিশ্বাস ও সন্দেহ মধুর সম্পর্কটি ক্রমে নষ্ট করে দেবেই । মিথ্যা যতো মধুর হোক শেষে তা ধোকা দেবেই । ধোকা কিংবা ধাক্কা খাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার শূন্যতাও অনেক ভালো ।

আচ্ছা পরিচিতা, একজন আরেকজনকে যখন মিথ্যা দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, সে কি তখন জানে না,

এ মিথ্যা একদিন অবশ্যই তাকে মিথ্যুকে প্রমাণিত করবে?

প্রেম আর বন্ধুত্ব যাই বলো, ভালোবাসা একটি আবেগ থেকে জন্মায়-আর এ আবেগকে যত্ন করতে হয়- দেখবে আমাদের চারপাশে অনেক জটিল বন্ধুত্ব বা প্রেম করে বিয়ে করার পর অধিকাংশ সম্পর্কের ফাটল ধরে তা কেন জানো? কারণ তারা যখন দুজনের দুজনকে জানা, মন এবং শরীর কাছে আসে তখন তাদের মানসিক প্রস্তুতি শেষ হয়ে যায়। আর শেষ হয় বলেই ভালোবাসার মৃত্যু হয়। কারণ একত্রিত হওয়ার পর তারা আবেগটাকে যত্ন করে না। ফলে ধুলো জমে তাতে। এ যত্নটাই হলো প্রাণ। এর জন্যই ভালোবাসা জন্ম নেয়।

তুমি কি জানো, আমরা কখনো কখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাই? তখন আমাদের ভেতরের মানুষটা খুব দুদর্মনীয় হয়ে ওঠে। বন্দিত্বের গরাদ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়- সে তখন তার সুখ-দুখ, আশা-নিরাশা আর ব্যর্থতার যন্ত্রণাগুলো প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে তখন পবিত্র-আর বিশ্বস্ত সঙ্গী খুজে বেড়ায় আর এ বিশ্বস্ত সঙ্গীর খোজেই আমি বিভ্রান্ত।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

ওয়াদা

ভালোবাসা নামের এ জিনিস কখন কেমন করে যে মানুষের জীবনে আসে তা বলা কঠিন, কিন্তু কখনো কেউ বলতে পারবে না আমার জীবনে এসব আসেনি এবং আসতে পারে না। যার প্রমাণ আমি নিজেই। কখনো ভাবিনি কাউকে এতো গভীরভাবে ভালোবাসবো। কারো কথা ভেবে রাত কাটাবো। কখনো সেই প্রিয় মানুষটিকে স্বপ্নের রাজ্যে ঠাই দেবো এবং হৃদয়ের আঙিনায় তাকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখবো।

আমি খুব লাজুক মেয়েট। চুপচাপ থাকতে পছন্দ করতাম। যেখানে দেখতাম খুব গ্যাঞ্জাম বা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে সেখানে আমি থাকতাম না। সব সময় একা থাকতে পছন্দ করতাম। আর ছেলেদের দেখলে কথা বলা তো দূরের কথা তাদের সামনে যেতে পারতাম না, আর কখনো যদি যেতে হতো তাহলে আমার হাত-পা কাপতো।

জীবনে অনেক ছেলেই অফার করেছে, কিন্তু আমি এতো বোকা যে, বাড়িতে আম্মুকে বলে দিতাম তাই ভয়ে কোনো ছেলে অফার করতে পারতো না। আমি পড়ালেখায় মোটামুটি ভালো ছিলাম তাই আমার স্কুলের

স্যাররা আমাকে ভীষণ আদর করতেন। মাত্র ক্লাস সেভেনের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দিয়েছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রায় এক মাস স্কুল বন্ধ। একদিন হঠাৎ আমার এক আত্মীয় আমাদের বাড়িতে এলো। আমার দূর সম্পর্কের ফুপাতো ভাই। ওর নাম সুমন। প্রথম দেখাতেই কেন জানি ওকে আমার ভালো লাগলো। মনে হলো সে আমার হাজার বছরের চেনা। প্রায়ই দেখি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও তাকাই। এভাবে একজন অপরজনকে দেখতে দেখতে কবে যে ভালোবেসে ফেলেছি টের পাইনি। শুধু বারবার ওকে দেখতে ইচ্ছা করে। একটু না দেখলে কাদতে ইচ্ছা করে। মনে হয় ওকে না দেখলে আমার মৃত্যু হবে। যে আমি পড়ালেখা ছাড়া কিছু বুঝতাম না সে কি না পড়তে বসি না। ওইসব ভালো লাগে না আর পড়তে বসলে লাভ কি, তার কথা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

তারপরে আবার যে আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা ওদের সামনে দিয়ে যেতে পারতাম না সে কি না তার সঙ্গে কথা বলছি, হাটছি। সুমন আমাকে বললো, তুমি খুব সুন্দর আর তুমি হাসলে গালে যে একটা টোল পড়ে সেটা আরো আকর্ষণীয়। তুমি এতো সুন্দর একটা মেয়ে কেন চুপ করে থাকো। কেন ভয় পাও। দেখো তোমার সমবয়সী মেয়েরা কতো সুন্দর সব জিনিস উপভোগ করছে, তুমি কেন পারবে না। এক কথায় বললাম আমার এসব ভালো লাগে না। আমাকে ও চুপ করে বললো তোমার কি কিছুই ভালো লাগে না।

বললাম না।

আমার চোখের দিকে তাকাও।

বললাম পারবো না।

আহ! তাকাও তো।

যখন তাকালাম তখন মনে হলো ওর চোখ দুটো আমাকে বলে দিচ্ছে তোমাকে ভালোবাসি। ওর উষ্ণ ঠোঁট দুটো কেমন জানি শুকিয়ে গেছে শুধু আমার ভেজা ঠোঁটের স্পর্শ না পাওয়ায়। দৌড়ে গিয়ে ওর বুকের মধ্যে মাথা রাখলাম। বারবার বললাম, আই লাভ ইউ। তারপর ওই ঠোঁট দিয়ে আমার লাজুক রাঙা ঠোঁটগুলো চেপে ধরলো এবং চুষতে শুরু করলো, আমাকে অস্থির করে তুললো। কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। তারপরে ওর দিকে তাকাতে পারিনি। ও বলছে কি তুমি এ রকম লাল হয়ে যাচ্ছো কেন? ভয় নাকি লজ্জা।

বললাম দুটোই।

বলে আসো আরেকবার হয়ে যাক ।

বললাম না বাবা আমি পাগল হয়ে যাবো । তুমি পারবে সারা জীবনের জন্য আমার হতে? ওয়াদা করো ।

বললাম, পারবো ওয়াদা করলাম ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

দিনাজপুর থেকে

মিসকল

পাশের বাড়ির মেয়ে

আমায় ছ্যাকা দিয়ে

করছে নতুন বিয়ে

ঘোমটা মাথায় দিয়ে ।

বরের আছে টাকা-পয়সা

আরো অনেক কিছু

মিছে মিছে ঘুরলাম শুধু

আমি তাহার পিছু ।

আমার কথা ভেবে প্রিয়া

ফেলো না চোখের জল

নিশি রাতে মনে হলে

দিও মিসকল ।

মোহাম্মদ সাদেক হোসেন

সাফাত, কুয়েত

সাত বছর পর

মা আ

আমি আজ যাকে নিয়ে পুরো লেখাটা সাজাবো সে আমার ভালোবাসার মানুষ । যাকে আমি আমার হৃদয়ে লালন করে আসছি তার জন্মের পূর্ব থেকে । আমার ভালোবাসা বাস্তব, যেখানে আবেগ কোনোদিনও ঠাঁয় পায়নি । আশা করি যারা বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, তারা লেখাটা নিয়ে কিছুমাত্রও ভাববেন আর আমার সার্বিক সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন ।

বাবা-মাকে না জানিয়ে পছন্দের পাত্রী বিয়ে করেছিলেন মামা । সে কারণে নানা মামাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন । অবশ্য কিছুদিন পরে নানা ব্যাপারটা মিচুয়াল করে নিয়েছিলেন । সেই মামীটা ছিল অসম্ভব সুন্দরী! পরে সবাই মামার পছন্দের তারিফ করেছিলেন ।

আমার বয়স তখন সাত বছর । ভাইদের মধ্যে আমি নাকি সবচাইতে শান্ত ছিলাম, তাই মামী আমাকে খুব ভালোবাসতেন । একদিন সবার সামনে মামী আমাকে বলেছিলেন, আমার মেয়ে হলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব ।

কথাটা হয়তো কারো মনে নেই, কিন্তু আমার কানে আজও কথাগুলো বাজে।

কাকতালীয়ভাবে ঘটনাগুলো সাত বছর অন্তর ঘটেছে। হঠাৎ একদিন ফোন এলো নানী মারা গেছেন। বলা বাহুল্য পারিবারিক কিছু কারণে সাত বছর আমাদের নানার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। তো আব্বাকে জামাই হিসাবে যেতে হলো, সঙ্গে শুধু আমি গেলাম। নানাবাড়িতে সবার আগে মামার সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু সঙ্গের মেয়েটাকে আমি চিনতে পারলাম না। পরে জানা গেলো ওটাই মামার একমাত্র মেয়ে। বুকের মধ্যে মৃদুকম্পন অনুভব করলাম। রিকশাতে আমি, মামা ও 'সা' কবরস্থানে গেলাম। যাওয়া আসার পথে মামা আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রতিজ্ঞা করলাম। বাসায় এসে 'সা'কে কোলে নিয়ে চুমু দিলাম। সে চুমুতে কোনো অশ্লীলতা ছিল না, ছিল নিখাদ ভালোবাসার ছোয়া। সেদিন থেকে 'সা'কে আমি আবিষ্কার করলাম আমার হৃদয়ের গভীরে। ওর চাহনি আমার চোখে পৃথিবীর সব সুন্দরের চাইতে সুন্দর মনে হতো। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর মুখ ওর মুখের কাছে ম্লান মনে হতো। কৈশরের ভালোবাসা সত্যিই অন্যরকম।

আবার সাত বছর পরে হঠাৎ মামা-মামীসহ 'সা' এলো আমাদের বাসায়। ওর মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন দেখলাম, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু মানসিক কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লো না। উচ্চতা বেড়েছে অকল্পনীয়ভাবে। যৌবনের পূর্ণ জোয়ার বইতে শুরু করেছে তার সারা অঙ্গে। পূর্ণ যৌবনবতী বলতে যা বোঝায় তেমনটা, কিন্তু ও আগের মতোই স্বল্পভাষী। এক কথায়, যৌবনভীতু শহরবালা, তেমন একটা কথা হলো না। পড়াশোনা কেমন চলছে, কোন ক্লাসে এবার ইত্যাদি ইত্যাদি।

মামা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি বললাম সামনের সপ্তাহে আমার সামার ভ্যাকেশন হবে, আমি তখন যাচ্ছি আপনার ওখানে। বিদায় বেলা 'সা' আমাকে বললো 'ভাইয়া তুমি কিন্তু সামনের সপ্তাহে অবশ্যই আসবে।'

যথারীতি এক সপ্তাহ পরে মামার বাসায় গেলাম। রিকশাতে পাশাপাশি অনেকক্ষণ বসলেও একটা কথাও ও বললো না। বাসাতেও একদিন বিনাবাক্যে কাটলো। ওর আব্বু আম্মু সারাদিন অফিসে থাকতেন বলে বাসায় আমরা দুজনই মাত্র। একসঙ্গে টিভি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটছে ও কোনো কথা বলছে না। আমি ভাবলাম, এভাবে চলতে পারে না, আমাকেই ফ্রি হতে হবে।

প্রথম ডেলিভারিটা দিলাম, সমীহ করেই ও খেললো। ওর পক্ষ থেকে কোনো ডেলিভারি এলো না বিধায় ওভার বাউন্ডারি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ম্যাচটা ড্র হলো। ওর আচরণ আমাকে হযরত আলীর মূর্খের হৃদয় থাকে মুখে আর জ্ঞানীর মুখ থাকে হৃদয়ে বাণীটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হায় কপাল! মাত্র একঘণ্টার ব্যবধানে ও যা শুরু করেছিল, তাতে আমি টিভি রুম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।

যা হোক একদিন পরেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে প্রমোশন হলো! তারপর বৈচিত্র্যময় ভেংচি, চিমটি,

কিল সে আমাকে উপহার দিতে লাগলো। ওদিকে আমি জবাব দিতে গেলে বলে, অ্যাই আমার গায়ে হাত দেবে না।

আমি বলতাম, ও তোমার গায়েতো আবার আগুন বইছে।

পরীক্ষামূলকভাবে আগুনে হাত দিলাম, কিন্তু না, সে আগুনে কোনো তাপ নেই!

আমাদের স্টার্টিং ছিল অ্যাটাকিং, বাট উই শুড প্লে এ লং ইনিংস, সো বি কেয়ারফুল অ্যান্ড লিভ আউট সুইংপিং ডেলিভারিস।

ওর আম্মু অনেকটা আচ করতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু তিনি চাইতেন আমরা যেন না বুঝি যে তিনি বুঝেছেন! অবশ্য 'সা'র একটু কমনসেন্স'র অভাব ছিল বলেই এমনটা হয়েছিল। যেমন, ওর আম্মুর সামনেই আমার দিকে ম্যারাথন তাকানো তাকিয়ে আছে, অথবা পাশে বসে ওর পা দিয়ে আমার পায়ে চিমটি কাটছে আরো কতো কি?

একদিন বিকেলে ছাদে আমি, মামা (ওর আব্বু) আর ও কথা বলছিলাম। নিচে পার্কে ছেলেমেয়েরা গল্প করছিল। তখন ও বলছে 'এই সুন্দর মেয়ে দেখলে তাকানো তাই না? খবরদার অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবে না! আমি সুন্দর নই? আমাকে দেখতে ভালো লাগে না?'

আসলে আমি কোথাও কোনো মেয়ের দিকে তাকাইনি। ও যদি বুঝতো, আমি ওকে কেমন ভালোবাসি। তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো বলতো না। সে জন্য বলে, নারী জাতির বিশ্বাস করার ক্ষমতা কম।

মেয়ে যদি কোনো ছেলেকে নিজের সামনে এমন কথা বলে, তাহলে সেই বাবা কি ভাববেন? আমি যতোই তার ভাগ্নে হই না কেন! ওর সঙ্গে বিশদিন এমনভাবে কাটিয়েছি, অথচ কোনদিনও খারাপভাবে গায়ে হাত দিইনি। ভালোবাসাতে নোংরামী থাকলে তাকে ভালোবাসা নয় বরং মন্দবাসা বলাই উচিত।

'সা'র সঙ্গে প্রায় তিন বছর দেখা নেই। ফোনে দু'বার কথা হয়েছে যৎসামান্য। হয়তো অবারো কাকতালীয়ভাবে সাত বছর পর দেখা হবে।

যমুনা তীরবর্তী কোন শহর থেকে

সুদতী

আরিফ

তোমাকে পেয়ে বুঝেছি জীবনে আছে কতো সুখ, কতো ভালোবাসা ।

ঢাকা থেকে

ফিরে এসো মিথিলা

রাতের আকাশে হাজার তারার ভিড়ে আমি একাকী হারিয়ে যেতে চাই, পারি না । আনমনে অবাক হই, হারিয়ে যেতেও কি তবে সঙ্গী লাগে? দুপুরের রোদে আমি পথে পথে একলা হাটি, হাতের আইসক্রিমটা আধ খাওয়াই রয়ে যায় । ভরা সন্ধ্যায় উতলা হাওয়ায় চুল এলিয়ে বারান্দার গ্রিল ধরে আমার জন্য আর কেউ অপেক্ষা করে না । মাঝরাতে মুঠো ফোনে কেউ আমায় মনে করিয়ে দেয় না, আজ কোজাগরী পূর্ণিমা । জোছনা তাই অধরাই থেকে যায় । শীতের ভোরে আগুন গরম কফির মগ হাতে যখন দাড়িয়ে থাকি ছোট্ট বারান্দায়, তখন কোনো চঞ্চল চোখ কোনো জোড়া শালিক খুজে দেয় না । আমার চোখে পড়ে শুধু ডানা ভাঙা সেই বিষণ্ন শালিকটা । যখন আমার ভাবনাগুলো ক্লান্ত হয়ে আমার মধ্যেই মিশে যায়, যখন অচেনা সুরে আমি গাই আমার কষ্টগুলো, নিয়ন আলোর বর্ণমালায় লেখা কবিতাটা যখন অপরিচিত মনে হয় তখন কেউ গভীর মমতায় ছুয়ে দেয় না আমাকে । তবে আমি স্বপ্নে বাচি, স্বপ্ন দেখি সেই মিথিলার । যে আমাকে এ দহকালে বৃষ্টির গল্প শোনাবে । রাতের আকাশ থেকে এনে দেবে তারার মেলার ছবি । মিলিয়ে নেবো আমার স্বপ্নগুলো । পাশাপাশি হাটবো অনন্তকাল । চৈত্রের শেষ প্রহর রাঙা আলোয় চোখে চোখে চেয়ে রবো । প্রথম বাসরে তোমার হাতে তুলে দেবো ১৮টা লাল গোলাপ । বলবো, ‘ভালোবাসি তোমায়’ । অপেক্ষায় থাকি আমি, অপেক্ষায় থাকে ১৮টা লাল গোলাপ । মিথিলা তুমি আসবে না? ফিরে এসো মিথিলা... ।

ত্বানজ্বিম আহমেদ

ডুয়েট, গাজীপুর

আটলান্টিক

মুনিয়া

সেতু বিরক্ত মুখে রিকশায় বসে আছে। সকাল দশটায় ওর ক্লাস। এখন সাড়ে নয়টা বাজে। ডিপার্টমেন্টের সামনে যেতেই দেখলো ওখানে সাকিব দাড়িয়ে আছে।

একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। আজকে সন্ধ্যায় তোমাদের বাসায় আসবো। তুমি কিন্তু থেকো। সাকিব বললো।

আমি থাকবো, বলেই সেতু জোরে হেটে ক্লাসের দিকে গেল।

সন্ধ্যায় সাকিব একটা কেক নিয়ে হাজির। এসেই জানালো যে আজকে ওর জন্মদিন। সবাইকে ও আজকে বাইরে খাওয়াবে। ছোট ভাই তো খুশিতে এক লাফ। তৈরি হয়ে সেতু সিড়ি দিয়ে নামছে, সবার পেছনে ও। সেতু নিচে নামতেই দেখলো ওর বড় বোন ও ছোট ভাই গাড়ির পেছনের সিটে বসে গেছে। ও পেছনের দিকে যেতেই বড় বোন বললো– সামনে বোস তুই। খুব অস্বস্তি লাগছে ওর সাকিবের পাশে বসতে। সাকিব গাড়ি চালাচ্ছে আর গল্প করছে তার ছোট বেলার কথা। গিয়ার চেঞ্জ করতে গিয়ে কয়েকবার সাকিবের হাতের সঙ্গে ওর হাত লেগে গেল। কিন্তু আরেকবার যখন লাগলো, তখন সেতুর মনে একটু সন্দেহ হলো যে সাকিব কি ইচ্ছা করেই করছে এটা!

খাওয়ার টেবিলে সেতুর উল্টো দিকে সাকিব বসেছে। খেতে খেতে সেতুর হঠাৎ মনে হলো তার পায়ের ওপর একটা পায়ের চাপ, সে চমকে সাকিবের দিকে তাকাতেই দেখলো ওর চোখে দুষ্টামীর হাসি। সেতু পা সরিয়ে নিল, ভাগ্যিস ওরা কেউ দেখেনি। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে সেতু প্রায় দৌড়ে গাড়ির পেছনের সিট দখল করলো।

সেতুর মন খারাপ হয়ে আছে, মনে হচ্ছে আজকাল সাকিবকে মাথা থেকে তাড়াতেই পারছে না। ওর মনে হচ্ছে সাকিব ওকে কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না। সেতুর মনে হচ্ছে সাকিব ওকে প্রোপোজ করতে চায় কিন্তু সেতু যেহেতু সহজ হচ্ছে না এজন্য বলতে পারছে না।

সেতুর একবার মনে হলো– সাকিব কি তাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসে? যদি না বাসে, তাহলে এতো ফোন করে কেন? ওর দিকে এতো গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কেন?

সাকিব একদিন সেতুকে তার অফিসে যেতে বললো। সাকিব ওর ভাইয়ের অফিসে কাজ করে। অফিসটা বনানীতে। একটা বায়িং হাউজ। সেতু এসে দেখে সম্পূর্ণ ফাকা অফিস। সাকিব টেবিলে পা তুলে কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে। ইশারায় ওকে বসতে বললো। ফোন রেখে জিজ্ঞাসা করলো– চা খাবে কি না।

সেতু বললো– খাবে না।

সাকিব পিয়নকে ডাক দিয়ে ওকে আজকের মতো ছুটি দিয়ে দিল। তারপর সেতুর দিকে তাকিয়ে বললো– আজকে সারাদিন আমার সঙ্গে থাকবে।

সেতু বললো– সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। পড়া আছে। সাকিব এবার টেবিল থেকে পা নামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। সেতুর তো বুক ধক ধক করছে।

এই নাও তোমার খাতা, যেগুলো চেয়েছিলে। সেতু বললো।

আরে দূর, ওটা তো একটা বাহানা তোমাকে অফিসে নিয়ে আসার। তোমার সঙ্গে একা একা কথা বলতে ইচ্ছ করছিল।

সেতুর তো বুক ভয়ে কাপছে। ওকি এখন ওকে প্রোপোজ করবে? নানা রকম ভাবনা ওর মাথায় ঘুরছে।

পিয়নটা চলে যেতেই সাকিব দরজা লাগিয়ে পেছন দিক থেকে এসে সেতুর দু কাধে হাত রাখলো। সেতু চমকে উঠে দাড়ালো। সে ভয়ে ভয়ে বললো, কি করছো তুমি?

আরে দূর, কিছু না, খামোখাই ভয় পাচ্ছে, বলেই ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার কাছের দেয়ালে প্রায় ঠেসে ধরে বললো, তুমি এতো শক্ত হয়ে আছ কেন? রিলাক্স করো– বলেই ওর ঠোটে খুবই চেপে একটা চুমু খেল। সেতুর মনে হচ্ছে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেতুর ঠোটটা মনে হচ্ছে জ্বলে যাচ্ছে। আর সাকিব ওর জিভটা সেতুর মুখে ঢুকিয়ে দিতেই সেতু মুখ সরিয়ে নিল। ওর মনে হচ্ছে বমি আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই একটা ভয়ঙ্কর কা- ঘটে গেল। সেতুর ওড়না মাটিতে আর ওর কামিজের সামনের দিকটা পাঞ্জাবীর মতো ফাটা– টিপ বোতাম দিয়ে আটকানো। সাকিব এক টান দিয়ে কামিজের সামনের দিকটা খুলে ফেললো। সাকিবের শরীরের চাপে সেতু একটুও নড়তে পারছে না– প্লিজ ছাড়ো, ছাড়ো বলছে, কিন্তু সাকিব কান দিচ্ছে না। সাকিব সেতুর বুকে দাত বসিয়ে দিল আর ওর এক হাত সেতুর সেলোয়ারের ফিতার দিকে যেতেই সেতুর না জানি কি হলো। কষে দিল এক লাথি সাকিবের পায়ে। ভীষণ জোরে। সাকিব উফ! বলেই সেতুকে ছেড়ে দিল। বললো, তুমি একটা ভীষণ খাটাশ মেয়ে।

ওই দিনের ঘটনার পরেও সে সাকিবকে ঘৃণা করতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করেছে ওকে ভুলে যেতে কিন্তু

পারছে না। না, নিজেকে ও আর এতো কষ্ট দেবে না, সাকিবের সঙ্গে ও সরাসরি কথা বলবে।

সাকিব ফোন ধরলো। হ্যালো বলতেই বেশ শক্ত গলায় সেতু বললো– তোমার সঙ্গে কথা আছে।

চলে এসো শুক্রবারে, অফিসে। সাকিব বললো।

শুক্রবার সকাল ১০টার মধ্যেই সেতু পৌছে গেল সাকিবের অফিসে। ওর মনে হচ্ছে তার আর কোনো ভয় নেই। সোজা গিয়ে সাকিবের সামনের চেয়ারে বসলো। সাকিবকে দেখে মনে হচ্ছে ও খুব খোশ মেজাজে আছে, খুব নরম দৃষ্টিতে সেতুর দিকে তাকিয়ে আছে।

তুমি কি আমাকে ভালোবাস? সেতু জিজ্ঞাসা করলো।

অবশ্যই, অবশ্যই ভালোবাসি।

আমি তো বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করবে আমাকে? সেতু বললো মুখ নামিয়ে, তাকাতে পারছে না সে এখন ওর চোখের দিকে।

বোঝার চেষ্টা করো, বিয়ে আর ভালোবাসা এক জিনিস নয়– তোমাকে আমি ভালোবাসি।

তুমি সরাসরি বলো, ইয়েস অর নো! এর বেশি আমি জানতে চাচ্ছি না। সেতু বললো।

আমি আবারো বলছি তোমাকে ভালোবাসি, তবে বিয়ে– নো। তবে তোমাকে অনুরোধ করবো আমাদের বন্ধুত্বটা নষ্ট করো না।

সেতু টেবিল থেকে ওর ব্যাগটা নিয়েই অফিস থেকে বের হয়ে এলো। সাকিবের দিকে একবারও দেখলো না। মনটা সম্পূর্ণরূপে ফাকা ফাকা লাগছে।

সেতু তার মনের কষ্টটা সম্পূর্ণরূপে মনের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপরেও যখনই সাকিবকে দেখে তখনই ওর মনের ভেতরে একটু যেন ক্ষীণ আশার আলো নীভু নীভু করে জ্বলে। সাকিব মুখের ওপর না বলার

পরেও ওকে ঘৃণা করতে পারছে না। ইস, আলাউদ্দিনের চেরাগ যদি সে পেত, তাহলে এক্ষুণি সে সাকিবকেই তার কাছে টেনে নিত। সে মনে মনে বলে, সাকিব, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তুমি অন্য কারো হয়ো না, প্লিজ।

সাকিবের বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে সেতুরও বিয়ে হয়ে গেল ওর বড় ভাইয়ের আনা পাত্রের সঙ্গে।

সেতুর যন্ত্রণার অবসান মনে হয় হলো। জামী বিদেশে ট্রান্সফার হয়ে গেল। সাকিব মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। বার বার সেতুর অফিসে ফোন করছে। আর একটাই কথা বিদেশে যাওয়ার আগে সেতু যেন ওকে একা তিন ঘণ্টা সময় দেয়।

একদিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেতু সাকিবের অফিসে হাজির হলো। সাকিবের চেহারা মলিন, খোচা খোচা দাড়ি। সে কিছু বলছে না। চুপ করে আছে।

সেতু বললো– তোমার জন্য একটা গিফট আছে– তবে ওটা অনেক পুরনো।

তুমি যাই দেবে, তাই আমি নেব।

সেতু ছোট একটা বাক্স ব্যাগ থেকে বের করে দিল ওর হাতে। সাকিব খুলে দেখলো– একটা আংটি, ছোট হীরার, পাথরটা ঝকঝক করছে।

সেতু বললো– ছয় বছর আগে একটা শ্যামলা মেয়ে আটলান্টিক পরিমাণ ভালোবাসা বুকে নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিল ভালোবাসার কথা শুনতে– তুমি যা দিয়েছ তাকে সেদিন, তার প্রতিদানে ও তোমাকে এই আঙটিটা দিতে পারেনি, যেটা সে কিনেছিল তার ভালোবাসার মানুষটার জন্য।

সাকিবের চোখে পানি। সেতু আর পেছনে ফিরে দেখতে চায় না। ভীষণ হালকা লাগছে নিজেকে ওর। অফিস থেকে বের হয়ে ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে উঠেই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললো– 'বাবা সোনা, আজকে আমি ভীষণ খুশি। আমরা আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছি।'

ফ্লোরিডা, আমেরিকা থেকে

munia08@yahoo.com

বন্ধন

শামীমা ইকবাল রুনা

বলো শারমিন।

তুমি যতো সহজে হু, শারমিন বলছো, ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। সমস্যা হলো আজ আমাকে ছেলে পক্ষ দেখতে আসবে আদিম প্রথা অনুযায়ী।

সমস্যা কোথায়, প্রতি মাসেই তো এ ধরনের সমস্যা তৈরি হয়।

হয় বলেই তো আমি অবাক, এরপরও তোমার কোনো চিন্তা নেই। তুমি বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বলো না।

কুল, বেবি। অস্থিরমতি কন্যা। শোনো, চাকরি তো মাত্র এক বছর হলো। তুমি আমার অ্যামবিশন জানো না, আমি জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই।

আমাকে বিয়ে করাটা কি তোমার সেই অনেক কিছু পাওয়ার মধ্যে পড়ে না? ওকে, বিয়ে হোক, বাচ্চার জন্মদিনে দাওয়াত করবো। তুমি আমাকে ফোনও করবে না। ফাজিল।

মেয়ে আমাদের পছন্দ, শুধু আপনাদের মতের অপেক্ষা।

অবশেষে রাত ৯টার দিকে শুভ কাজ সম্পন্ন হলো। ছেলে পক্ষের অধির পীড়াপীড়িতে সবাই সম্মত হলো, আজই নতুন বউ তুলে দেয়া হবে। আগামী শুক্রবার আত্মীয়-স্বজন দাওয়াত করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

আসতে পারি?

অবশ্যই, আপনার ঘরে আপনি আসবেন, এতে আবার অনুমতির কি আছে?

এই প্রথম শারমিন দেখলো আরমানকে। খুব বেশি আহামরি কিছু নয়, এমন একটা ব্যাপার ঘটলো শারমিনের মনে।

আসলে হঠাৎ করেই মানে আমি এতোটা প্রস্তুত ছিলাম না। তুমিও হয়তো অপ্রস্তুত। তাই সব কিছু মিলে আমাদের জীবনের পথে চলতে হয়তো কিছু সময় লাগবে, আবার না-ও লাগতে পারে। তবে সবার আগে আমাদের দুজনের দুজনকে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

এই দেখ আমি একাই বকবক করছি, তুমি কিছু বলো। আসলে এতোদিন একাই জীবন কাটিয়েছি, এখন প্রাণ খুলে কথা বলার মানুষ পেয়েছি তাই। কি হলো, বলো?

কি বলবো?

বুঝেছি, আসলে হঠাৎ এভাবে বিয়ে হওয়াতে, ওকে টেক ইওর টাইম।

না, বিয়েটা আমার মতেই হয়েছে। তবে আজ দুপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে একজনের সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে বিয়ে– না থাক। তবে আমি আপনার কাছে কিছু সময় চাই। জানি না সেই সময়ের মধ্যে নিজেকে... তবে...।

ওকে, তুমি অস্থির হয়ো না, সব বন্ধন বেধে দিলেই তো হলো না, তা সত্যিকার অর্থে তৈরি হতে কিছু সময় তো লাগে।

সারাটা রাত নির্ঘুম কাটলো। আরমান ইজি চেয়ারে বই পড়ে কাটালো, তাকে বেশ স্বাভাবিক দেখা গেল।

বেডরুমের গেইট পার হতেই আমার আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। প্রচ- এক ভালো লাগা কিন্তু প্রকাশ করা বা অনুভব করার অনুভূতি মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি। সব সিড়ি, নিচতলা ফুল-বেলুন দিয়ে সাজানো। আজ আমার জন্মদিন। এই প্রথম আমার জন্মদিনে এমনভাবে কেউ আমাকে শুভেচ্ছা

জানালো। ফুল বিছানো সিড়ি দিয়ে নামতে কেমন রানী রানী লাগছে।

আবু চাচা, কে করলো এসব?

খোকা বাবু, সারাটা রাত জেগে নিজ হাতে এসব করেছে।

একা?

আমাদের সাধ্য আছে তার কাজে হাত লাগাই।

সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালাম। সন্ধ্যার দিকে ফোন করে আরমান বললো, ব্যস্ত না থাকলে কিছু সময় আমাকে দেয়া যায়?

কেন?

একটু দরকার ছিল। সময় দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। গাড়ি পাঠাবো?

ঠিক আছে।

একবার ভাবলাম সকালের জন্য ধন্যবাদ জানাই। পারলাম না। আগের মতো চঞ্চলতা, অস্থিরভাবে বেশি কথা বলা কিছুই যেন আমার মধ্যে এখন আর নেই। বুঝতে পারছি না কি করবো? কি করা উচিত?

আলমিরাটা খুলতেই রুপালি কাগজে মোড়ানো একটা প্যাকেট। প্যাকেটের ওপর লেখা– এ সুন্দর দিনে যদি মনে উদাসীনতা কিছুটা দূর হয়, হঠাৎ মনের অগোচরে কারো ছবি নাড়া দেয় তবে তার কথা মনে করেই এ সামান্য উপহার গ্রহণ করো। শুভ জন্মদিন।

প্যাকেট খুলতেই দেখি লাল টকটকে একটা শাড়ি। আর ঠিক তখনই আরমানের চেহারাটা ভেসে উঠলো। শাড়িটা পরলাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি। ভাবছি কিছু একটা কিনে আরমানকে দেবো। সময় নষ্ট না করে মার্কেটে গেলাম। হঠাৎ রাতুলের সঙ্গে দেখা।

এই খুব বেশি রাগ করেছো? ফোন তো টোটাল বন্ধ, কেন? তিন মাস কোনো খবর নেই। তোমার জন্য গিফট কিনতে এসেছি। ভাবছি ১৪ ফেব্রুয়ারি তোমার বাসায় গিয়ে পুরো রাগ ভাঙিয়ে তোমাকে বউ করে আনবো।

রাতুল, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

কি?

হ্যা, ওই রাতেই।

কি বলো? আর তুমি? এই শারমিন তুমি সুখী?

জানি না, রাতুল এমনটা না হলেও পারতো।

কিছুই হয়নি। আমি জানি তুমি মোটেও সুখী না। আমি কাল সকালে চিটাগং যাচ্ছি। চলো ১৪ ফেব্রুয়ারি আমরা ওখানে বিয়ে করবো। তুমি এসো শারমিন, তোমার রাতুলের কাছে ফিরে এসো।

বাসায় ফিরতে মনের ভেতর অস্থিরতা। সত্যি তো এমন জীবন কি পার করা যায় রাতুলকে ছাড়া! আমি মনে হয় রাতুলের কাছেই বেশি সুখী হতাম। নিজেকে অসুখী রেখে আমি কাকে সুখ দিচ্ছি।

আরমান অফিসে যাওয়ার পর একটা চিরকুট টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। চিরকুটে লেখা– ‘চলে গেলাম রাতুলের কাছে। প্লিজ, আমাকে খুজবেন না।’

বাস স্ট্যান্ডে আসতেই দেখি রাতুল দাড়িয়ে।

চলো, দেরি করা যাবে না।

চলো, আমি সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি।

ভালো কথা, তুমি রান্নাবান্না পারো তো, আমি কিন্তু মেয়েদের চাকরির ক্যারিয়ার এসব খুব একটা পছন্দ করি না। স্বামী অফিসে গেলে পোলাপান পালবে আর বাড়ি এলে যত্ন করে খাওয়াবে। দেখাশোনা করবে, ব্যস, ঝামেলা শেষ।

মুহূর্তের মধ্যে রাতুলের প্রতি প্রচ- ঘৃণা এলো। তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করতে ইচ্ছা করছে নিজেকে। প্রচ-ভাবে আরমানকে কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। আরমানের কাছে ফিরে গেলে ও কি আমাকে মাফ করবে? সরি আরমান, পারলে মাফ করো।

রাতুল আমি এখানেই নামবো।

হাইওয়েতে কেন?

আমি বেকুব বলেই তাকে ছেড়ে তোমার মতো অমানুষের কাছে ছুটে এসেছি।

কাকে ছেড়ে?

আমার স্বামীকে, আরমানকে। মানুষটা প্রতি মুহূর্তে আমাকে অনুভব করে, আমার ভালো লাগাকে মর্যাদা দেয়। আর তুমি?

পাগল নাকি? আরমান তোমাকে মেনে নেবে?

মেনে নেয়া, না নেয়া তার ব্যাপার। তবে আমার উচিত তার কাছে ফিরে যাওয়া।

ওমেগা মিশনারি হসপিটাল। প্যারিসে এ হসপিটালের প্রধান শাখা। ওমেগা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এ হসপিটালটা চলে। প্রায়ই ফ্রান্স থেকে ডাক্তাররা আসেন। বিশেষ রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসা দেন

তারা। বর্তমানে একদল ডাক্তার এসেছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন রয়েছেন। আমান ইরানি বর্তমানে এ হসপিটালের ইনচার্জ। তিনিই ফ্রান্স থেকে আসা ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছেন।

স্যার, এ হসপিটালে তিনজন এমন রোগী আছেন যাদের কেইসটা খুবই উইক। আমার মনে হয় আলাদা একটা ট্রিটমেন্ট তাদের দরকার। তাদের মধ্যে এই যে এই রুমে আছেন একজন মধ্যবয়সী তরুণী। হাইওয়েতে পড়েছিল। সম্ভবত রানিং গাড়ি থেকে নামতে অথবা রাস্তা পার হতে গিয়ে এমন অ্যাক্সিডেন্ট।

তিন মাস ধরে তার জ্ঞান আসতো চার-পাচ ঘণ্টা থেকে আবার অচেতন হয়ে যেতো। প্রথমদিকে আবছা আবছা মুখে কিছু বলতে পারতো। আর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে জানতে পারলাম তার বাবা মারা গেছেন। মেয়েটির মা তার ভাইয়ের কাছে লন্ডনে থাকেন। এ খবর শোনার পর মেয়েটি মুখ দিয়ে একটা কথাও বলেনি। বেচারির চোখ দুটি দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মাথায় প্রচ- আঘাতের কারণে এমন হয়েছে।

বাইরে মুষলধারে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়াকম্যানে গান চলছে। চোখ বন্ধ করে খুব প্রিয় শ্রীকান্তের গানটা শুনছি– ‘আমার সারাটা দিন, মেঘলা আকাশ তোমাকে দিলাম, শুধু শ্রাবণ সন্ধ্যাটুকু তোমার কাছে চেয়ে নিলাম।’

চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভালো লাগছে। কেন জানি মেয়েটাকে খুব কাছের মনে হচ্ছে। মন বলছে, সত্যি আজকের শ্রাবণ সন্ধ্যাটা তার কাছ থেকে চেয়ে নিই।

স্যার, আসুন ব্যান্ডেজ খোলা হবে।

ওকে, অবশ্যই চলুন।

ধীরে ধীরে শাদা ব্যান্ডেজ খুলে চোখ তাকাতেই মেয়েটি চিৎকার দিয়ে উঠলো।

আরমান আপনি?

কে আপনি? শান্ত হোন।

বিয়ের প্রথম দেখায় আরমানকে যতোটা না ভালো লেগেছিল আজ এতো অপূর্ব লাগছে কেন?

আরমান, আমি শারমিন।

শারমিন, কোন শারমিন?

আপনি ভুল করছেন, আমি সাদমান, সাদমান হায়দার, আরমানের যমজ ভাই।

আপনার তো ফ্রান্সে থাকার কথা?

হ্যা, চার মাস আগে দেশে ফিরেছি, আরমানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে।

কি বলছেন?

সত্যিই স্লিপিং পিল অনেক খেয়েছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি মারা গেছে আরমান। এমনটা করার আগ মুহূর্তে আমার সঙ্গে ওর কথা হয়। ও আপনার চলে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারেনি। ভালোই উপহার দিলেন ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে। কেন এমন করলেন?

সাদমান, শুনুন, দাড়ান। এ বৃষ্টির মধ্যে সাদমান আর পেছনে তাকালো না, হসপিটালের করিডোর যেন অনেক বড় মনে হচ্ছে, পা যেন চলছে না। শুধু মনে মনে ভাবছে, যার কারণে আমার ভাইকে প্রাণ দিতে হলো সেই মেয়ের ভালোবাসাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াতে পারবে না। বাইরে বের হয়ে বৃষ্টির ভেতর খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে সাদমান বলছে–

আরমান, তোকে খুব মনে পড়ছে ভাই। মিস ইউ মাই ব্রাদার, মিস ইউ। একবার দূর থেকে আমাকে জড়িয়ে ধর, বুকের কষ্টগুলো হালকা হয়ে যাক। জীবনের এ পথে এসেও দুজনের পছন্দ কি তবে একই? কিন্তু তোকে ছাড়া এতো বড় জীবন কি পার করতে পারবো? এ কোন বন্ধনে বাধা পড়ছি।

শুধু তার কানে শ্রীকান্তের গানটা বাজছে।

‘চেয়েছি পেতে যাকে চাই না হারাতে তাকে/বৃষ্টি তোমাকে তাই ফিরিয়ে দিলাম/আমার সারাটা দিন... ।’

নিউ ইস্কাটন, রমনা থেকে

অন্য এক

শৌনক দত্ত তনু

চিঠিটা সুন্দরবন এলাকা থেকে লিখছি, জানি তুমি আমার কোনো খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠায় আছো । সিডর এলাকায় বিনা নোটিশে চলে এসেছি হৃদয়ের টানে, মানুষকে ভালোবেসে মানবতার তাগিদে । সময়ের ব্যস্ততায় আর অসহায় মানুষের আর্তনাদে তোমার আমার ক্ষুদ্র ভালোবাসা মহৎ ভালোবাসার কাছে ঠুনকো মনে হয়েছে আর তাই এতোদিন পর তোমায় লিখছি ।

অসহায়, গৃহহীন, সম্পদহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর একটু খাবার, একটু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য হাহাকার দেখে আনমনে চোখে জল আসে । আশ্রয় কেন্দ্রে যখন নবজাতকের কান্না শুনে সদ্য প্রসবা মা সবকিছু ভুলে যখন নির্মল পরিতৃপ্ত হাসি হাসেন তখন মনে হয় পৃথিবীর তাবৎ ভালোবাসা এখানে সমাহিত । সহায়-সম্বলহীন মা তখন যেন সব ভুলে যায় মাতৃত্বের মোহে । এমন ভালোবাসার দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারো ।

সিডর বিধ্বস্ত এ মানুষগুলোর জন্য সারা দেশ, বিশ্ব, ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে যখন এগিয়ে এসেছে এবং আসছে তখন মনে হয় এ ভালোবাসা ঐশ্বরিক, না হলে চেনা নেই, জানা নেই মানুষগুলোর জন্য এতো ভালোবাসা কেন? আসলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ভালোবাসার গহীনে সুপ্ত আছে বৃহৎ এক ভালোবাসার সাগর । সমাজ ব্যবস্থায় ভালোবাসার গণ্ডি প্রতিনিয়ত ছোট হয়ে আসছে । আমি তুমি ছাড়া এখন সংসার ভাবা যায় না বড়জোর একটা ছেলে কিংবা মেয়ে ।

জন্মদাতা মা-বাবার এখন নিরাপদ আশ্রয় সন্তানের হাত ধরে পৌছে দেয়া বৃদ্ধাশ্রম । অথচ বিধ্বস্ত অনাহারি, বাসস্থান, বস্ত্রহীন এখানের মানুষগুলো অসুস্থ কিংবা বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য নিজে না খেয়ে না চিকিৎসা করে মা-বাবাকে নিয়ে ভাবছে । নাগরিক অত্যাধুনিক মানুষগুলোকে এখানে এনে দেখাতে ইচ্ছা করে আধুনিকতার নামে কতো নিচে নেমে গেছি আমরা । ভালোবাসার নামে কতো বড় ভ্রান্ত মুখোশ আমাদের মুখে-প্রাণে ।

এ পরিস্থিতিতে বিলাসবহুল তোমার আমার ভালোবাসার পরিণতি দেয়া আমার জন্য সম্ভব নয় । পারলে ক্ষমা

করো আর যদি সম্ভব হয় চকচকে ক্লিনিকের অর্থকে ত্যাগ করে আর্তমানবের কল্যাণে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বিলাতে এখানে চলে এসো, দেখবে ভালোবাসার নাগরিক সংজ্ঞা ভেঙে চুরমার হয়ে তোমাকে গড়ে তুলবে নতুন এক ভালোবাসার মানুষ করে । যে ভালোবাসার মহিমা নিজেকে বড় করে, তৃপ্ত করে ।

তেরীবাজার, নেত্রকোনা থেকে

চাই

ওরিয়ান পাশা

ভালোবাসা এক অনন্ত নাম । আবার ভালোবাসা এক কণ্টকময় দীর্ঘ পথেরও নাম । যে পথে চলতে গেলে কাটার আঘাতে যেমন হৃদয় রক্তাক্ত হয়, তেমনি সুখী হতে কে না চায় ।

এ ভালোবাসা দিবসে অনেক অনেক ভালোবাসা চাই ।

সাউথ কোরিয়া

orianpasha@yahoo.com

ভালো থেকো

শাওন

তোমার জীবন হোক ফুলের সুবাসিত মনকাড়া, নজরকাড়া । তুমি ভালো থাকো সারাবেলা ।

ঢাকা

তোমার জন্য...

আকাশের চাদ, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি, দখিনা বাতাস, নদীর স্রোতধারা, শিশুর মুখ, ধুলোর গন্ধ, ফুলের রঙ,

ফসলের মাঠ এবং শ্যামল বৃক্ষ কতো সুন্দর। তবে তার চেয়ে তুমি আরো সুন্দর অন্তরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করো। ভালোবাসো মানুষকে, ভালোবাসা দিবসে তারুণ্য আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, শুদ্ধতম হোক ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, তারুণ্যের জয় হোক।

আকাশ

ঠিকানাবিহীন

না. সু. ঝ.

আজ ভালোবাসা দিবসে বিশ্ব সংসার তন্নতন্ন করে ১০৮টা নীল পদ্ম আনিনি, পাছে তুমি আবার বরুণা হয়ে যাও! তোমার জন্য এনেছি আমার ঠোটে করে লাল গোলাপের সৌরভ। নিয়ে যাও তুমি তা মন-প্রাণ উজাড় করে।

ম. ম আলম

সিলেট

তোমারই জন্য ভালোবাসা

কায়সার হামিদ (মানিক)

কারণ আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ সব কিছু তোমার জন্য প্রিয়া। শুধু তোমারই জন্য ভালোবাসা। তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে তোমার প্রতি রইলো এক বুক ভালোবাসা ও একগুচ্ছ রজনীগন্ধার শুভেচ্ছা।

কক্সবাজার

ন্যাড়া বৃক্ষ

রাশেদুল হাসান ফেনী থেকে

জয়িতা ওর আসল নাম নয়। একদিন ওই নামটা আমিই জুড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও কোনো প্রতি উত্তর করেনি। আমি তাকে জয়িতা বলেই ডাকি। আজ জীবনের কুয়াশাঢাকা ভোরে বুঝতে আর কষ্ট হয় না, জয়িতা নামটা সার্থক হয়েছে। না না আমার ভালোবাসার জয় নয়, শেষমেশ ওর প্রতারণার জয়ই হলো। আসলে ও তো জয়িতাই।

পহেলা বৈশাখ। সবে ফিজিক্স বইটি আস্তে আস্তে ওল্টাতে শুরু করলাম। অনেকেই এখনো ঘুমের সমুদ্রে সাতরাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে পিঠার মিষ্টি ঘ্রাণের সঙ্গে মায়ের বকুনির মৃদু শব্দও স্পন্দিত। হঠাৎ জয়িতা এসে বললো ভাইয়া, আজ কি দিন? মাথা তুলে তাকালাম ওর দিকে। লজ্জাবতী জয়িতার মুখে দুষ্টুমির খেলা। লজ্জা ও দুষ্টুমির সংমিশ্রণে হরিণীর মতো চঞ্চলা হয়ে উঠেছিল সে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর মুখে আবেগমিশ্রিত কুয়াশার আবরণ। আমি মাথা নাড়ালাম।

ও বললো, তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসছিলাম কিন্তু তুমি তো বলতে পারলে না আজ কি? তাই জিনিসটা না দিয়েই চলে যাচ্ছি।

না না যাসনে জয়িতা, আগ্রহ উক্তিতে প্রকাশ পেল আমার আওয়াজ। ও পেছন ফিরে বললো, তুমি যে বলতে পারলে না। আস্তে আস্তে কাছে এসে ও বললো, আজ পহেলা বৈশাখ। এই নাও, তোমার জন্য। জয়িতা পেছন থেকে হাতটি বের করলো। ওর হাত ভর্তি কড়ই ফুল।

অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি! এ যে কড়ই ফুল। ও হেয়ালি করে বলে উঠলো বারে, ফুলতো ফুলই, এতে আবার কড়ই পড়ই কি?

না মানে, এসব ফুল দিয়ে তো আর শুভেচ্ছা বিনিময় হয় না... আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো, জিনিস বড় কিছু নয়, বড় হচ্ছে কে দিল, বুঝেছেন সাহেব?

হ্যা, বুঝলাম।

সেই থেকে শুরু। শুরুই বলা চলে। এক দিন সন্ধ্যায় পড়ার সময় ও দুষ্টুমি জুড়ে দিল। কথার ফাকে ও বলে উঠলো, আপনার কোনো পছন্দ আছে কি না।

না বলে তাকেও একই প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম।

ও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

এক পর্যায়ে ও বলে উঠলো, আমাকে আপনার পছন্দ হয়?

আমি ওর মুখপানে তাকিয়ে থ হয়ে রইলাম। লজ্জায় ও চলে গেল। পড়ার টেবিলে ২/৩ দিন আর এলো না। পরে আস্তে আস্তে আসা শুরু করলেও হারিকেনের চিমনি ঢেকে দিত ওর মুখ বরাবর।

মূলত এ দিন থেকেই ভালোবাসার বীজ অন্তর ভেদ করে মুখে কথার পাতা গজালো। আরো কতো খুনসুটি, হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-উল্লাস। আমাদের এমন একটা পর্যায় এসে গেল, ওকে না দেখলে আমার কিছুতেই শান্তি লাগতো না। এক দিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ওর নানা বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এসেছিলাম। সেদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কতো যে কথা বলেছি। আমাদের কথার বর্ষণে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দিয়েছিল ওর নানা বাড়ির সামনে। আমাদের ভালোবাসা চলছিল অসীম গতিতে।

অবশেষে শুনতে পেলাম ও পিন্টু নামে

একটি ছেলেকে ভালোবাসে। আমার বিশ্বাস হলো না। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কথাটা সত্যি কি না। ও সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো। আমি পিন্টু সেজে কথা বললাম ওর সঙ্গে। ওকে আবারো জিজ্ঞাসা করলে কসম খেয়ে ও অস্বীকার করে। আমার ভালোবাসার গাছের পাতা আস্তে আস্তে ঝরে পড়তে লাগলো। ওর সঙ্গে আর আগের মতো কথা বলি না। অবশেষে ও এক দিন আমাকে সব খুলে বললো, স্কুলজীবন থেকে ছেলেটা ওকে পছন্দ করে এবং ও মাঝে মধ্যে কল করে কথা বলে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথা বলে শুধু। তাছাড়া ও আমাকে পছন্দ করলে কি হবে, আমি তো করি না। সেদিন সে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল, ওর কল এলেও সে রিসিভ করবে না। কিন্তু আমি জানতে পারলাম ও এর পরেও ছেলেটির কল রিসিভ করেছিল। আর এদিনই আমার ভালোবাসার বৃক্ষের শেষ পাতাটি ঝরে পড়লো। আর আমি ন্যাড়া বৃক্ষটি নিয়েই চলছি। নিয়ে চলছি জ্বলন্ত চিতায়। চলছি ক্রমাগত নিয়েই চলছি।
rashed_hasan@yahoo.com

উপলব্ধি

নাদিয়া ইসরাত প্রফুল্ল

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। একজনকে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু আজ সে আমার শত্রু অপেক্ষাও ঘৃণ্য। আরিফকে ভালোবেসে যখন ঘনিষ্ঠতা হলো তখন দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করলাম আসলে কাউকে

খুব বেশি ভালোবাসা বোকামি। যে ভালোবাসার মূল্য বোঝে না তাকে ভালোবাসা আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। তবু কিভাবে যে একটা স্টুপিডকে এতো ভালোবেসেছিলাম তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি।

তখন সবে পনেরোতে পা দিয়েছি। যদিও ভালো-মন্দ বোঝার মতো বয়স যথেষ্ট তবু বয়ঃসন্ধিকালের পাগলামির কারণেই আমার জীবনের সবচেয়ে বাজে ঘটনা তখন ঘটেছিল। আমি দেখতে মোটামুটি সুন্দরী এবং সাধারণ ছিলাম। বর্তমান যুগে মেয়েরা যে মাত্রাহীন ফ্যাশনের দিকে চলছে তা প্রচ-ভাবে ঘৃণা করি। আশ্চর্যভাবে সে রকম মেয়েদের পছন্দ করে এমন একটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক হলো। অবশ্য একই ক্লাসে পড়ার কারণে তা সম্ভব হয়েছিল।

আরিফ সব সময় খুব একরোখা, জেদি। আমি নিজেও খুব জেদি। তবুও যেহেতু ওকে খুব ভালোবাসতাম তাই নির্দ্বিধায় ওর সব জেদ মেটাতাম। সবাই বলতো, আমি নাকি ওকে যতোটা ভালোবাসি আর কেউ এতোটা করে না। এ রকম ছেলের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু আমি তবুও হাসিমুখে সব সময় ওর পাশে থাকতাম। হঠাৎ এক দিন লক্ষ্য করলাম, ও

আমার এতো কষ্ট, ভালোবাসার বিন্দুমাত্র মূল্য না দিয়ে ফ্যাশনেবল মেয়েদের দিকে মনোযোগী হচ্ছে।

তখন আমার সর্বসত্তা ওর প্রতি এতো প্রচ-ভাবে বিমুখ হতে লাগলো, আমি নিজেও টের পেলাম না যে ওকে আমি কতোটা ঘৃণা করতে শুরু করেছি। পরে যখন বুঝলাম তখন ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে সরে আসতে লাগলাম। হঠাৎ আমার এ বিমুখতা জেনে ও খুব ভেঙে পড়েছিল, না অভিনয় করেছিল তা এখনো জানি না। কিন্তু ওকে ভেঙে পড়তে দেখে আমার মন নরম হয়ে গেল এবং আমি আমার মত পাল্টে ওর সঙ্গে কথা বললাম। তারপরের দিন সে এক বন্ধুর বাসায় আমাকে দেখা করতে বললো।

আমি সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। ও আমার সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে বকা দিল এবং কিছুক্ষণ পর আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোটে কিস এবং আদর করতে লাগলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতবাক হয়ে পাথর হয়ে গেলাম। প্রেমিকের স্পর্শে শিহরণ তো জাগেইনি বরং সারা শরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠলো। বাসায় এসেও অস্বস্তি দূর হলো না। নিজেকে খুব অপবিত্র মনে হচ্ছিল। এর কিছুদিন পরই শুনলাম ওর আম্মু নাকি একথা জেনে গেছেন এবং স্বভাবত আর সব মায়ের মতো নিজ পুত্রকে কিছু না বলে সব দোষ আমাকে এবং আমার বন্ধুদের দিয়েছেন।

তিনি আমাকে দোষী করেছেন তাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ জানি আমি কেমন। কিন্তু আমার বন্ধুদের কাছে সারা জীবনের জন্য আমার আত্মসম্মান যে বিসর্জিত হলো তা আর কখনো পাবো না বলে খুব কষ্ট হয়। যদি সম্ভব হতো তবে হয়তো ওদের বলতাম আমাকে ক্ষমা করে দিতে।

প্রায় মাস চারেক হয়ে গেছে। ওর দেয়া সব স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছি। আমার কারো প্রতি কোনো রাগ নেই। কষ্ট নেই। কারণ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তবু এখনো যেহেতু আমার জীবনের খুব বেশি কাটেনি তাই মনে আশা আছে, হয়তো জীবনে এমন একজন আসবে যে আমার মনকে চিনবে। একটি সুন্দর মেয়ে বলে নয়, সুন্দর মনের অধিকারী বলে আমাকে ভালোবাসবে, যার বুকে মাথা রেখে আমি পাড়ি দেবো শত শতাব্দী।

টঙ্গী, গাজীপুর থেকে